ISSN 2229-7537

THE PRISM

A Peer-Reviewed Journal

Vol. 14 October, 2022

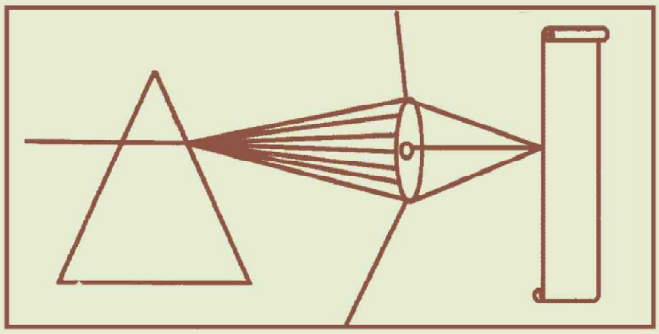

Annual Bilingual Journal

of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia, West Bengal

THE PRISM

A Peer-Reviewed Journal

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 14 October, 2022

Annual Bilingual (English & Bengali) Journal
of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia

THE PRISM

Vol. 14, October, 2022

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Editors

Sri Thakurdas Mahato Assistant Professor in Bengali
Smt. Soma Lohar Assistant Professor in English
Dr. Abhijit Ghosh Assistant Professor in Economics
Dr. Apurba Gorai Assistant Professor in Sanskrit
Dr. Kalyan Senapati Assistant Professor in Chemistry

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti

Date of Publication : 2nd October 2022

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

Editorial

On the eve of publication of the 14th volume of our 'The Prism' the editorial board seeks the opportunity to thank all concerned, especially our peer Reviewers for the onus they have born in reviewing the articles. We also thank all our contributors for the faith they have kept in us.

Like all previous volumes this one too is characterized by such heterogeneity as it could be regarded to have patronized wide variety of disciplines and approaches. Our editorial board is working on how the approaches, in spite of us encouraging the existance of many disciplines, could be considerablly homogenized. We think it will be a good idea if we could publish different volumes of 'The Prism' for different streams. But prior to undertaking such a venture the Editorial Board needs to procure permission from the National science library to avoid any legal complication that may crop up afterwards.

We are sincerely planning to start alongside an electronic version of 'The Prism' with a numbers of segment in order to reach a bigger audience. Now soft copy of 'The Prism' is available in our college website. As members of the Editorial Board of 'The Prism' we are looking out for suggestions from our readers. For any type of correspondence readers are requested to use our email id.

We find it to be the right occasion to thank the college authority for its persistent support towards the college Journal. We hope that we shall continue to have this patronage in future.

Thank you all
Members of Editorial Board

2nd October, 2022
Mahatma Gandhi College, Purulia

THE PRISM

Vol. 14, October, 2002

Our Contributors

Dr. Gopal Pal,	Assitant Professor, Dept. of Bengali, Deoghar College, Jharhand.
Dr. Patha Sarathi Hati	Assitant Professor, Dept. of Bengali, Khatra College, Bankura.
Dr. Sumanta Mondal	Assitant Professor, Dept. of Bengali, Mandhum Mahavidyalaya, Manbazar, Purulia.
Sri Ujjwal Halder	Assitant Professor, Dept. of Philosophy, R.C. College, Lalpur, Purulia.
Dr. Kailash Pati Saha	Assitant Professor, Dept. of Bengali, R.C. College, Lalpur, Purulia.
Sri Thakurdas Mahato	Assitant Professor, Dept. of Bengali, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sri Sushovan Dey	Assitant Professor, Dept. of Philosophy, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Dr. Kalyan Senapati	Assitant Professor, Dept. of Chemistry, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Dr. Apurba Gorai	Assitant Professor, Dept. of Sanskrit, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Dr. Sanghamitra Roy	Associate Professor, Eastern Dooars B.Ed. Traning College, Alipurduar.
Sri Chinmoy Rajak	Assitant Professor, Dept. of Physics, Nistarini College, Purulia.

Dr. Partha Sarathi Mandal	Assitant Professor, Dept. of English, Manbhum Mahavidyalaya, Manbazar, Purulia.
Sk Mustafa Md. N Eshasnul Haque	Assitant Professor, Dept. of English, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Smt. Basana Das	Librarian, J.K. College, Purulia.
Smt. Soma Lohar	Assitant Professor, Dept. of English, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sumana Patra	Ph.D. Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Upananda Dhabal	Assitant Professor, Dept. of Bengali, P.R.M.S. Mahavidyalaya, Bankura.
Ditipriya Dasgupta	Ph.D. Research Scholar, Viswabharati Viswavidyalaya, Sanatiniketan, Bolpur.
Smt. Purnima Mahata	SACT, Dept. of Political Science, Santaldih College, Purulia.
Sri Mrinmoy Kumar Pal	Research Scholar, Dept. of Economics, S.K.B. University, Purulia.
Sri Sandip Das	Research Scholar, Dept. of Physics, S.K.B. University, Purulia.
Sri Tapan Kumar Mahato	SACT, Dept. of Political Science, Vivekananda Satavarshiki Mahavidyala.
Anasuya Adhikari	Research Scholar, Dept. of Education, S.K.B. University, Purulia.
Dr. Birbal Saha	Professor, Dept. of Education, S.K.B. University, Purulia.

THE PRISM
ISSN 2229-7537
A Peer-Reviewed Journal
Volume 14 October, 2022

Contents

মানভূমী কবিতায় প্রতিবাদী স্বর : প্রসঙ্গ মাড়ভাতের লড়াই	ঠাকুরদাস মাহাতো	13
সৈকত রক্ষিতের ঝুমুরকলি: রাং-এর দামে খাঁটি সোনা	ড.পার্থসারথি হাটি	24
'ভাস্বর মহান পরাজিত বীর' কর্ণঃ প্রসঙ্গ 'প্রথম পার্থ'	দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত	33
বৈপরীত্য ভাবনার দ্যুতির আলোকে আধুনিক বাংলা কবিতা	উপানন্দ ধবল	45
রবীন্দ্র গল্পে নারীর স্বাধিকার চেতনা	ড. গোপাল পাল	56
সমাজ বাস্তবতার আলোকে শক্তিপদ রাজগুরুর ছয় উপন্যাস	ড. সুমন্ত মন্ডল	68
শহীদুল্লা কায়সার-এর 'সারেং বৌ': স্বতন্ত্র নারী নবিতুন	সুমনা পাত্র	76

সমরেশ বসুর শাম্ব : মিথে বিনির্মাণ	কৈলাশপতি সাহা	87
আধুনিক জীবনশৈলীতে যোগাঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা	ড. অপূর্ব গঁরাই	95
শব্দতত্ত্বে পরমার্থপ্রসঙ্গ : শব্দাদ্বৈতবাদ ও ওঁকারব্রহ্মবাদে প্রপঞ্চ অতিক্রান্তির ধারণা	সুশোভন দে	106
স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়ন	উজ্জ্বল হালদার	118
Covid-19 and migrant Worker Challenges in India	Tapan Kr. Mahata	127
Impact of covid19 on fundamental rights of Indian constitution (Special Reference of article 21)	Purnima Mahato	142
Formation of copper oxide film by thermal oxidation of copper film and their photoresponse	Chinmoy Rajak	160
Occupational Diversification in India a Theoretical Explanation	Mrinmoy Kumar Pal	172

TetMe-IBX: A Reactive Modified IBX	Kalyan Senapati	184
A couple of examples wherein computerprogramming leads to easy and betterunderstanding and visualization ofphysical-mathematical concepts	Chinmoy Rajak Sandip Das	190
Peace and Value Education: Need of the Hour	Dr. Sanghamitra Roy	197
Professional Skills and Competencies development among teachers: Issues and Challenges	Smt. Basana Das Soma Lohar	207
Voices of the Margin are Heard: A Study in the Concept of Nation in the Light of Swami Vivekananda	Parthasarathi Mandal	224
Secularism in the Indian Context	Sk Mustafa Md N Ehsanul Hoque	233
The Different Voices of A Feminist: A Cogitation on Mary Wollstonecraft	Anasuya Adhikari Dr. Birbal Saha	239

মানভূমী কবিতায় প্রতিবাদী স্বর : প্রসঙ্গ মাড়ভাতের লড়াই

ঠাকুরদাস মাহাতো

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কাব্য সাহিত্যে মানভূমী (ঝাড়খণ্ডী) বাংলা ভাষার কবিতা এক নতুন সংযোজন। আঞ্চলিক কবিতা অভিধায় ভূষিত হলেও 'মানভূমী কবিতা' আধুনিক কবিতার পাশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল। মানভূমী কবিতা বলতে কবি-সমালোচক বা পাঠক-শ্রোতারা মানভূমী বাংলায় রচিত কবিতা গুলিকেই বুঝিয়ে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই মানভূমের বাইরে এই ভাষা সম্যকরূপে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। ফলে এই ভাষায় রচিত কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় কষ্টকর হয়ে ওঠে। মানভূমী ভাষায় লেখা কবিতা পড়তে গিয়ে উচ্চারণ সমস্যা দেখা দেয়, কেন না উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে লেখা বেশ কঠিন। তাহলেও এই ভাষার নিজস্ব একটি ছন্দ ও সুর আছে যা এই ভাষায় রচিত কবিতাকে সুন্দর ও মনোরম করে তোলে। 'মানভূমী' কবিতার পাঠ শুনে মানুষ আকৃষ্ট হয়, মুগ্ধ হয়। ভাষার বাধা কাটিয়ে বাইরের শ্রোতাকেও বিস্মিত করে। কবিতার ভাব, কথা আত্মস্থ করতে তাদের অসুবিধা হয় না।

মানভূমী বাংলা কবিতা তার গঠনগত শৈলীর জন্যও বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে মানভূমী কবিতার বিশিষ্ট কবি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত— "কবিতায় কোন বিশেষ চরিত্র কথা বলছে, তার ড্রামাটিক মনোলগই কবিতা। আবার সেই কথনটির বিপরীতে রয়েছে একটি বাবু চরিত্র।...এই সব কবিতায় এই অঞ্চল তার দুঃখ, হতাশা, অভিযোগ, প্রতিরোধ এবং দাবী নিয়ে বৃহত্তর বঙ্গের মুখোমুখি হচ্ছে। আঞ্চলিক কবিতার এই প্যাটার্নটির আবেদন বেশ গভীর। এ কবিতাগুলি একটি ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক উপভাষিক অঞ্চলের সমন্বিত অভিপ্রায়ের রূপায়ন। একারণেই এগুলির কাব্যমূল্য তর্কাতীত।"[১] মানভূমী বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমতটিও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়— "মানভূমের জল হাওয়া মাটির স্পর্শে মানভূমী কবিতার ধর্ম আলাদা, চরিত্র আলাদা। এ কবিতা শুধু সজীব প্রাণবন্তই না, পরন্তু রীতিমত আলোড়ণ তুলতেও সক্ষম হয়েছে।...এই সব কবিতার শৈল্পিক রীতিনীতি সর্বোপরি নাট্য সংলাপের টেকনিক আকৃষ্ট করে। কবিতার জগতে শুধু চাহিদা বৃদ্ধি করে নি, পাশাপাশি তার প্রকরণ ব্যঞ্জনা ও সমাজ জীবনের সার্থক প্রতিফলন মানুষের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে।"[২] ফলে মানভূমী কবিতা এখন আর বিশেষ একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নেই। আঞ্চলিক ভাষায় কবিতাগুলির মধ্যেও রয়েছে আধুনিকতার ছাপ। এই অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে যেমন এখানকার মানুষের জীবনের মূল সুরগুলি ধরা পড়েছে তেমনই— 'মানভূমী কবিতার বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও প্রচেষ্টার সততায় এখানকার জীবনবোধটি উঠে আসে।' মানভূমী কবিতার প্রথম দুই দশকের (সাত ও আটের দশক) কবিতাগুলিতে দেখা যায়— সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের সার্থক প্রতিফলন। ক্ষোভ, প্রতিবাদের পাশাপাশি নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা প্রেম ভালবাসার কবিতা, নাটকীয় সংলাপ মানভূমী কবিতাকে যথেষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন করে তুলেছে।

মানভূমী ভাষায় কবিতা লেখার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিল 'ছত্রাক' পত্রিকা ও তার সম্পাদক সুবোধ বসু রায়। মানভূমী কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি বলেছেন— "লোক সাহিত্যের ভাবজগৎ, ভাষার সহজ সুন্দর অভিব্যক্তি সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধান ধারার সঙ্গে যুক্ত হলে নতুন সম্পদ এবং গতিময়তা আনবে মনে করেই মানভূমী কবিতার যাত্রা শুরু।"[৩] সুবোধ বসুরায় নিজে যেমন অনেক কবিতা লিখেছেন, তেমনই অন্যান্যদেরও উৎসাহিত করেছেন। মানভূমী কবিতার বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে রয়েছেন— অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দদুলাল আচার্য, গৌরী শংকর দাস, অরুণ প্রকাশ সিংহ, পশুপতি প্রসাদ মাহাত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথী মহাপাত্র, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম দত্ত, সুভাষ রায়, প্রদীপ কুমার ঘোষ প্রমুখ। অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সাঁঝ বিহান', মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাড়ভাতের লড়াই', দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এত বড় লদী', 'গাঁয়ের নাম পরব', সুভাষ রায়ের 'ফাগুন লহর', প্রদীপ কুমার ঘোষের 'রুখা মাটির কথা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ মানভূমী কবিতাকে মানভূমের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় মানভূমী কবিতা সংকলনের কথা। এক্ষেত্রেও পথিকৃৎ হলেন ছত্রাকের সম্পাদক সুবোধ বসুরায়। ছত্রাক প্রকাশনী থেকে প্রথম তিনিই প্রকাশ করেন 'মানভূমী কবিতা' (১৯৮২) নামে দশজন কবির দশটি কবিতা। পরবর্তীকালে মানভূমী কবিতার অনেকগুলি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট সংকলন গ্রন্থগুলি হল— সুদিন অধিকারী সম্পাদিত 'মানভূমী কবিতা সংকলন', আদিত্য

মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আঞ্চলিক ভাষার কবিতা', সুভাষ রায় সম্পাদিত 'ছৌ ঝুমুরে ভাদুর সুরে' ও 'মানভূমের কবিতা সংকলন', অমিয় সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'মানভূমের বিংশ শতাব্দীর কবিতা' ও 'পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতা', মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্বাচিত আঞ্চলিক কবিতা' এবং শ্রমিক সেন সম্পাদিত 'নির্বাচিত মানভূমী কবিতা'।

মানভূমী বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। 'লিটল ম্যাগাজিনের কবি', 'মেহনতী মানুষের কবি' বলে অভিহিত এই কবির জন্ম বাংলা ১৩৪৪ সালের ২৪ কার্তিক, বর্তমান পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের মণিহারার কাছে অবস্থিত শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে। ছাত্রাবস্থা থেকেই লেখালেখির শুরু। বামপন্থী মহাদর্শে বিশ্বাসী, পেশায় শিক্ষক এই কবি একই সঙ্গে গণআন্দোলনের শরিক এবং সাহিত্যের সাধক। পুরুলিয়ার লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসেও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বের করেন 'কেতকী' পত্রিকা, যা ৫০টি বছর পেরিয়ে আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। প্রথম দিকে কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা কবিতার মূল ধারাতেই লেখালেখি করেছেন। তাঁর কবিতা চর্চার মোড় ঘুরিয়ে দেন পুরুলিয়া জেলার প্রবাদ প্রতীম গণআন্দোলনের বামপন্থী নেতা নকুল মাহাত। এ প্রসঙ্গে মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— "এক সময় আমাকে পুরুলিয়ার মার্কসবাদী নেতা কমরেড নকুল মাহাত বলেছিলেন— 'আপনারা যে আধুনিক কবিতা লিখছেন তা বড়ো জটিল। আঞ্চলিক উপভাষায় অর্থাৎ ক্ষেত-মজুরের কথ্য ভাষায় তাদের জন্য কিছু লিখুন না, যা তারা উপলব্ধি করতে পারবেন'।" নকুলদার কথায় মানভূমের ভাষায় কবিতার পর কবিতা লিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম।"[৪] বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নেতার ইচ্ছাকে যেন নির্দেশ রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে তাঁর 'মাড় ভাতের লড়াই' কাব্য গ্রন্থটি। গ্রন্থটি কবি 'কমরেড নকুল মাহাত'কেই উৎসর্গ করেছিলেন।

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মানভূমী কবিতা লিখেছেন প্রচুর। দীর্ঘ কবি জীবনে তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ২৩টি। মানভূমী কবিতার বই তিনটি— 'মাড়ভাতের লড়াই' (১৯৮৬), 'চাঁদে এককাঠা জমি' (১৯৯৫) ও 'মাঠ খসড়া' (১৯৯৯)। কাব্যগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে তিনি মূলধারার কবিতার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে মানভূমী কবিতা লিখেছেন।

কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের গড়ে ওঠা মানভূমের ভাষা-আন্দোলন, তেভাগা, খাদ্য ও নকসাল বাড়ি আন্দোলনের সময়কালে। এ প্রসঙ্গে কবিপুত্র বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়ের

অভিমত— "পাঁচের দশকে একদিকে মানভূমের ভাষা আন্দোলন এবং অন্যদিকে ছয়ের দশকে খাদ্য আন্দোলনের অনিবার্য পটভূমি, মানুষের মুখে খাবার ও ভাষা তুলে দেবার দাবি নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজপথ। স্বাভাবিক কারণেই খিদের নগ্নরূপ তাঁর সেই সময়ের কবিতার ভেতর অন্য এক মাত্রা নিয়ে আসে।"[৫] ১৯৭২ সালে তিনি নিজেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ফলে বামপন্থী এই কবি সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁর মানভূমী কবিতাগুলি এই দায়বদ্ধতারই ফসল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এ জাতীয় কবিতাগুলিতে ভাষা পেয়েছে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মেহনতী মানুষের কথা। উচ্চারিত হয়েছে সেই সমস্ত মানুষের প্রতিবাদী স্বর। 'তিনি পাঠককে প্রতিনিয়ত অস্থির করে তুলেছেন, ভাবিয়েছেন, পথে নামিয়েছেন। মিছিলে হাঁটিয়েছেন, শিখিয়েছেন বিপ্লবের ভাষা, হাতে তুলে দিয়েছেন পতাকা।'[৬]

আঞ্চলিক ভাষা মানভূমী বাংলায় মোহিনী মোহনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাড় ভাতের লড়াই'। প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩৯৩ সালে। চারটি সংস্করণের পর মানভূমী ভাষায় রচিত 'মাড় ভাতের লড়াই', 'চাঁদে এককাঠা জমি' ও 'মাঠ খসড়া'— এই তিনটি কাব্যকে একত্র করে মোট ১১৫টি কবিতা নিয়ে 'মাড় ভাতের লড়াই'-এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৪১৪ সালে; পুরুলিয়ার এ. কে. ডিসট্রিবিউটর্স থেকে। সর্বশেষ অষ্টম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ সালে 'কবিতা পাক্ষিক' থেকে। 'মাড় ভাতের লড়াই' কাব্যগ্রন্থটি শ্রেণি সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল। গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় ড. সুধীর কুমার করণ বলেছেন— "এখানে তিনি শুধু কবি নন, সংগ্রামের অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছেন পুরুলিয়া আর সারা সীমান্ত বাংলার বাইদ-বহাল-টাঁইড়-টিকরের বিস্তৃত পরিসরে খেটে খাওয়া কুঁকড়ে পড়া মানুষের একান্ত আত্মীয় রূপে। . . .এ কবিতার ভাষা পুরুলিয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরের মতই নিরাভরণ কিন্তু পাথরের মত ঋজু, নদীর স্রোতের মত বেগবান। এ কবিতা তাই জনগণের কবিতা, সর্বহারার কবিতা। বস্তুত গ্রন্থটি মোহিনীমোহনের নামে প্রকাশিত হলেও এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ। কখনো শোনা যায় সংগ্রামের শপথ কখনো দেখা যায় দৈনন্দিন দারিদ্র্য লাঞ্ছিত চালচিত্র এবং তারই মধ্যে অনায়াস প্রকৃতি চিত্রণ।'

'মাড় ভাতের লড়াই' মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, মানুষের রুটি রুজির সংগ্রাম। স্বাধীনোত্তর ভারতেও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের দাপট, তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষকে শোষণ, সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার ও জোর করে গরীবের সম্পত্তি আত্মসাৎ সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঘটে পালাবদল। প্রতিষ্ঠিত হয় বামপন্থী সরকার। কার্যকরী হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার আইন। শুরু হয় বর্গা রেকর্ড। অত্যাচার আর

শোষণে গুটিয়ে থাকা লালু বাউরি, লফরা মাহাত, দশরথ সিং সর্দার, ছিদাম বাগ্‌দি, শঙ্কর বাউরি, মদনা কাঁহার, মধু বাউরি, ডমরু বাগ্‌দি, সিরাজুল মিস্ত্রি, বুধনার মতো মেহনতী খেটে খাওয়া মানুষ বুকে সাহস পায়, মুখে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়। 'মাড় ভাতের লড়াই' কাব্যের কবিতাগুলি সেই প্রতিবাদেরই আলেখ্য।

'মাড় ভাতের লড়াই' কবিতাটি এই কাব্যের নাম কবিতা। প্রথম কবিতা দিয়েই কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যটির মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছেন। লালু বাউরির জবানীতে বলা আখ্যানে ফুটে উঠেছে গাঁয়ের মোড়লের অত্যাচার, শোষণ ও দাপটের কথা। কীভাবে পানু বাগ্‌দিদের সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছাড়া হতে হয় এবং একদিন মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হয় তার কাহিনিও সে শোনায়। তবে দিন বদলায়। ভূমি সংস্কারের ফলে জমিদারের অতিরিক্ত জমি বর্গা হয়ে আসে গরীব চাষির কাছে—

"আচকা মন্ত্রী বদলের সঙে সঙেই বাঙ্‌লাতে
শুরু হঁয়্যে গেলেক লইতুন আইন
লু'কাই রাখা বাড়তি জমির হিসাব।
বেনামী জমি কাড়াই লিয়ে গরীব লক গিলার হাতে দিয়ে দিলেক
জমি আর দলিল পাট্টা।"

জমিদারের হাতিয়ে নেওয়া পানু বাগদির জমিটা আসে লালু বাউরির হাতে। জমিদারেরা আক্রোশে ফুঁসছে, শাসানিও দিচ্ছে কিন্তু শোষিত, মেহনতী মানুষও আজ লড়াই করতে প্রস্তুত—

"খুন চুষা বাঘের পারা অভাবটো হুঁকারছ্যে তো হুঁকারছ্যেই।
উটোকে খেদাড়্যে মাইরতে শুরু হঁয়্যে গেইছে
গাঁয়ে গঞ্জে চারদিগের লে মাড়ভাতের লড়াই।"

প্রতিবাদের আরেকটি আলেখ্য আমরা পাই 'লফরা মাহাতর জবানবন্দী' কবিতায়। খেটে খাওয়া 'মাটি কাটা মজুর' লফরা মাহাত দিন বদলের স্বপ্নে 'মজুরী বাড়ার লাইগে' সামিল হয়েছিল একদিনের ধর্মঘটে। জমিদারের হুমকি সত্ত্বেও সে ধর্মঘট থেকে বিরত হয় নি। ফল হল তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে তার উপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার ও হাজতবাস। পাঁচ-পাঁচটা বছর জেল খেটে যখন সে বেরিয়ে আসে ততদিনে তার 'বউটো' 'ছেল্যাটো'—

"ভখে শুঁকাই শুঁকাই মইরে শেষ হয়্যেঁ গেইছে।
ঘরটো ধ্যস্‌কে গেইছে ঝ্যড়ায়।"

সব দেখে শুনে তার অন্তরাত্মায় জেগে ওঠে বিদ্রোহী জিজ্ঞাসা— "মাটি কাটা লফরা ইখন কুথাকে যাবেক কি কইরবেক/বইলে দেন আইজ্ঞা ?" প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিশোধের শপথ—

"যারা আমাকে মিছা মাম্‌লায় জেলে ঢুকাল্য
যারা আমার বউটোকে ছেল্যাটোকে ভখে মাইরল্য
যারা আমার ভিটামাটিতে বেনাহক ঘুঘু চরাল্য
তারাকে তামাম দুনিয়া থাইকে শিকড় বাকড় সুদ্ধা
উখড়াই ফেইলব্য— আছড়াই মারব চাট্টান পাথরে।
তাথে যদি আমাকে আর-অ একশ বার জেল যাত্যে হয়
তাও যাব
তভেই ন আমার নাম লফরা মাহাত।"

সবশেষে উচ্চারিত হয় এক সাম্যবাদী চেতনার মর্মবাণী—

"ই মাটি সবার ই আকাশ সবার
সবার লাইগে সব কিছু সমান না হল্যে
কাল্লায় কাল্লায় শোধ লিব আইজ্ঞা
ই কনহ অন্যায় লয়— কনহ অন্যায় লয়।"

শ্রমিক-মজুর ধর্মঘট করলে বাবুদের শাসানি, মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানো, ঝাড়খণ্ডীদের নামে 'রেকর্ড করা বর্গা চাষীর জমির ধান কেটে নেওয়া, অভাবের দিনে ঋণ দিয়ে বিনিময়ে বেগার খাটিয়ে নেওয়া— এরকম নানা শোষণের বিরুদ্ধে তারা আজ বদলা নিতে চাই। যাদের ঘরে চাল নেই, শীত নিবারণের সামান্য কাপড় নেই, তারাও আজ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ডাক দেয়।

বলে—

"আমরাও ন বাঘের বাচ্চা বটি থাইকব্য কি আর
ইঁদুর গাঢ়ায় সামাঁই ?"
(দমে জাড় লাগছে হে)

উচ্চারিত হয় বদলা নেওয়ার শপথ—

'এক পউষে জাড় যাবেক নাই হে
আইসছে পউষে ফসল লুইঠের বদলা চাই! বদলা চাই!!" (ঐ)

'স্ট্রাইক' কবিতায় আমরা পাই ডমরু বাগ্‌দিকে। 'মরদের বেটা মরদ' ডমরু তার হিম্মত দিয়ে নিজের নায্য অধিকার কায়েম করেছে— "বাবুদের পাঁজরা গিলান হিঁল্যাই দিলেক।" দশ দিনের স্ট্রাইকে 'বাবুরা চুপসে' গিয়ে 'দাবি দাওয়া মাইনে লিয়েছে'।

মহাজনী শোষণ আর সামন্ততান্ত্রিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জেহাদ ঘোষিত হয়েছে 'দখল' কবিতাতে—

"ই হাত গুলা আর হাত লয় আইজ্ঞা
মিশিন কাটা করাত বেটে।
কাজ না পা'ল্যে ভাত না পা'ল্যে
মিশিন গুলা বেকল কইরে দেশ দুনিয়া ফুঁট্যাই দিয়ে
দুনিয়া দারীর দখল লিবেক।
দখল লিবেক
দখল লিবেক।"

অত্যাচারিত, শোষিত মানুষ জোট বেঁধে অত্যাচারির বিচার চাইছে—

"গরীব মানুষ ভুখা মানুষ জোট বাঁইধেছ্যে গাঁ শহরে
চাবুক কেনে গুলি মার‍্যেও আজকে উদের যায় না তাড়া:
ঘুঘু চরা ভিটায় ফিরে আইসছে তারা দখল লিতে
মার খাওয়া সেই মু গুলাতে বদ্‌লা লিবার জইলছে চ্যুলা
মড়ল তুমার বিচার হবেক— উল্টা বাগে ঘুইরছে চাকা
বিরাই যাবেক সব ফুটানি দেইখছি তুমার কপাল ছুলা।"

(মড়ল তুমার বিচার হবেক)

প্রতিবাদের আরেক রূপ দেখা যায় 'মাড় ভাতের লড়াই' কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: মদনা কাহার', 'দু'বিঘা জমির উপেন', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা : শঙ্কর বাউরী' কবিতায়। গ্রামের রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার আবৃত্তি শুনে ঋণের দায়ে জমি হারানো গরীব মদনা কাঁহারের মনে হয়েছে— "আসলি কথাই তো বইল্যে গেইছ্যেন" কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন করেছেন— "ত হঁ বাবু আমার কথা গুল্যান কি উনি লেখেন নাই ?" 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় মিথ্যা দেনার দায়ে জমিদার কর্তৃক বাস্তুচ্যুত উপেনকে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী বানিয়ে নিখিলবিশ্বে মুক্তি দিয়েছিলেন। এর পরেও কবিতার শেষে উপেনকে জমিদার কর্তৃক লাঞ্ছিত হতে দেখি। বামপন্থী কবি মোহিনী মোহন

কবি রবীন্দ্রনাথের এই ভাববাদী দর্শন ও উপেনের লাঞ্ছনাকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই 'দু' বিঘা জমির উপেন'কে এনে হাজির করেছেন এক প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে। উপেন রূপী মোহিনীমোহন তাঁর আক্ষেপের কথা গোপন না করে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন—

"কারু জমি জমা কেও কাড়াই লিলে উ সাধু সন্ন্যাসী
হঁয়্যে যায় ন কি আইজ্ঞা ?
উ কি বলতে পারে "ভগমান আমাকে গটা পৃথিবীটো
ইজারা দিয়ে দিলেক ?"
ই কন্ অসটার কাম আইজ্ঞা বুইঝত্যে লারছি ?
মানতে লারছ্যি উ কথা গুলান।
তবে আমাকে লিয়ে উ ঠাকুর কবি কেনে ই সকল লেইখে দিলেন ?
... ...
ভিটা মাটি ছাড়া ক্ষেত মজুর কইরে আমাকে ভিখ্ মাঙাই
রাইখে দিলেন কেনে ? ''

(দুই বিঘা জমির উপেন)

প্রতিবিধানের পথও দেখিয়েছেন কবি—

"গরীব লকের লড়াই ছাড়া কনই পথ নাই।
তেই মাড় ভাতের লড়াই টো লিয়ে গেইছি
ই ধার থেকে উ ধার কে।"

(ঐ)

এখন আর উপেন একা নয়। উপেনের মতো 'ভিটা মাটি ছাড়া রূপাই মাঝি, রাবণ সিং সর্দার, লালু কালু দেবু বাউরীর দল' আজ একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত। তাদের ঘোষণা—

"হামদের রক্তে রাঙা বাবুদের হুই লাল টুকটুক্যা ফুলবাগান
ধসক্যাঁই দিব।
হামদের জমি হামদের ধান
বুকের ভাষা মুহের গান
কাড়াই লিলে কসুর ভত্তি ছাইড়ব্য নাই।
একতরফা হুকুম নামা হুরুতে থাক

বাঁচার পারা বাঁইচত্যে গেলে লড়াই কইরেই বাঁইচত্যে চাই।"

(দুই বিঘা জমির উপেন)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' নিয়ে কবি মোহিনীমোহন তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন শঙ্কর বাউরীর জবানীতে—

"ই কেমন ভিক্ষা কনই আমি বুইতে লারলি।
কবির কবি রবি ঠাকুরের উ কবিতাটি শুনে মন টো আমার বিগড়াই গেল।'

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা : শঙ্কর বাউরী)

প্রশ্ন করেছেন—

"কবি এমনটো লেইখল্যেন কেনে ?
... ...
কেনে উ ভিখারী টো ভিখ্ মাঙা হঁয়ে।
উহার পরার ট্যেনা টুকুন লিয়ে লিলেক ?
... ...
ই কি কনহ মগের মুলুক পাঁইয়ো গেইছে ন কি ?
যা কইরবেক তাই মাইনে লিতে হবেক ?
ধম্মের নাম কইরে ই যে দেইখছি গলায় ছুরি।
... ...
ইটো কি লেংটো কইরে ইজ্জত লিয়ে ছিনি মিনি খেলা লয় ?"

(ঐ)

সবশেষে প্রতিবাদ করে আহ্বান জানিয়েছেন—

"অমন পভু ভক্তির মু হে আগুন আইজ্ঞা।
... ...
বাঁচার পারা বাঁইচতে গেলে ভেকধারীদের চিনতে হবেক।
যোগী সাইজে রাবণ আইসে সীতা চুরি কইরে লিবেক
আর আপনারা সব হাত তালি দিবেন
উ রকমটো আর নাই চইলবেক।" (ঐ)

কায়েমী স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে, কখনো বা

উসকে দিয়ে সমাজে অস্থিরতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে। দৈনন্দিন জীবনের আসল সমস্যা থেকে তাদের নজর ঘুরিয়ে দেয়। 'রাম-মন্দির-বাবরি মসজিদ' বিতর্ককে সামনে রেখে রথযাত্রার বিরুদ্ধে তাই ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের ভাষা—

"উ রাম মন্দির ন বাবরি মসজিদ যাই হক কেন্নে
খাত্যে পইরতে দিতে পাইরবেক ভুখা গুলাকে ?
কাজ দিবেক সব বেকার গুলাকে ?
যদি তা লাইরবেক তবে উ রথ চালাই কি হবেক আইজ্ঞা ?
সবাই মেইলে উ রথের চাকাগুলান ভাইঙে দেন কেনে।"

(উ রথ খাত্যে পইরতে দিতে পাইরবেক)

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়েও গরীব মেহনতী সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন। শব্দ দুটির অর্থ ও তাৎপর্যের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা মেলে না। তাই তাদের মুখে উচ্চারিত হয় প্রতিবাদী প্রশ্ন—

"স্বাধীনতা কি না খাত্যে পাওয়া মানুষের পেটে বন্দুকের গুঁতা ?
স্বাধীনতা কি তিন র‍্যঙা পতাকার ফরফরানি ?
জোতদার জমিদার কালোবাজারীর মড়ল গুলার উদাম লাচ ?
ন কি দিল্লী থাইকে লেতাড়্যে আসা শিং তুলা কাড়ার পারা
ঢুঁসাই মারা আইন ?"

(কইলকাত্তার লে দিল্লী কদ্দুর)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও মিথ্যাচার, বৈষম্য, শোষণ এবং গা জোয়ারি পেশি শক্তির আস্ফালন দেখে প্রশ্ন করে—

"ই ক্যামন গণতন্ত্র আইজ্ঞা'
কুনু কিছুই ঠাওরাত্যে লাইরছি।
গণতন্ত্র মানে কি আয়েন কইরে গরীব গুলানকে রগড়াই মারা ?
বড় লক গুল্যানের পেট মটা ভুঁড়িতে তেল লেপাট্যে
টাকার বরাদ বাড়াই দিয়ার ফন্দি আঁটা ?
ন কি হাড় মাংস ছাল চামড়া ছাড়াঁয়্যে ভুখা মানুষের
শুখা পেটে ডুগডুগি বাজাই ভূতের লাচ ?"

(ইটো ক্যামন গণতন্ত্র আইজ্ঞা)

একদিকে প্রকৃতির প্রতিকূলতা, বৃষ্টি নির্ভর পাথুরে মাটির বুক চিরে ফসল ফলানো কিংবা মাটিকাটা অন্যদিকে মহাজন-মোড়ল, জমিদারদের শোষণ, হুমকি, অত্যাচার। এমতাবস্থায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষগুলির মনে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ। কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মাড় ভাতের লড়াই' কাব্যগ্রন্থের একের পর এক কবিতায় তাদের মুখে দিয়েছেন সেই প্রতিবাদী ভাষা। 'রানা'র পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বিজয় কুমার দাস তাই যথার্থই বলেছেন— "মোহিনী মোহনের আঞ্চলিক কবিতাগুলি কেবল আঞ্চলিক কবিতা নয়, জীবনের অবিকল ছবি। মদনা কাহার, ছিদাম বাগদী কিংবা শঙ্করা বাউরী চরিত্ররা আসলে কিছু সীমাহীন মানুষের প্রতিবাদী মুখ, এরা পুরুলিয়া বা মানভূমির বৃত্ত পেরিয়ে আসলে এই বিশ্বপৃথিবীরই ভেঙে পড়া নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রতি সন্দর্ভ।" তাই 'মাড় ভাতের লড়াই' শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে ভাতকাপড়ের লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই, পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ের এক জীবন্ত দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. 'অড়', সম্পাদক রমানাথ দাস, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ.-২৭
২. 'ছত্রাক', সম্পা, সুবোধ বসু রায়, ৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৬, পৃ.-১৬
৩. 'মানভূমী কবিতা', সম্পা. সুবোধ বসু রায়, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ.-৩
৪. ছত্রাক, তদেব, পৃ.-১৬
৫. 'কোরাস', মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়— বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. রাজদীপ সেন চৌধুরী, ২০২১, পৃ.-১৫
৬. তদেব, পৃ.-৪১
৭. তদেব, পৃ.-৫৩

আকর গ্রন্থ :

১. 'মাড় ভাতের লড়াই', মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৪, এ. কে. ডিসট্রিবিউটরস, পুরুলিয়া।

সৈকত রক্ষিতের ঝুমুরকলি: রাং-এর দামে খাঁটি সোনা

ড .পার্থসারথি হাটি

ঝুমুর, বিশেষত পুরুলিয়া জেলা তথা মানভূমের বিশেষ লোক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান। এই জেলাবাসীদের সংস্কৃতিতে হল প্রধান গীত। এমন গীতের প্রভাব যে পুরুলিয়ার পার্শ্ববর্তী ও সীমান্তবর্তী বাংলার অঞ্চলগুলোতেও পড়বে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ফলে, সন্নিহিত বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমেও ঝুমুরের যথেষ্ট কদর আছে। ভিন রাজ্যে, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা-র পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতে চা-বাগানে শ্রমিক চালানের ফলে, বিশেষত আসামের শিলচরে কর্মক্লান্ত শ্রমিকের কণ্ঠে আজও ঝুমুরের সুর ধ্বনিত হয়। রুখা-সুখা পাথুরে পাহাড়-টিলায় ঘেরা পুরুলিয়ার মালভূমি চরিত্রের একদিকে প্রকৃতির অকৃপণ ঔদার্য্য, অন্যদিকে অভিশপ্ত অহল্যার পাষাণীরুপ। এখনকার জঙ্গলকেন্দ্রিক মানুষের শোক-স্বস্তি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা— সব কিছুরই প্রকাশ আছে ঝুমুরে। তাই ঝুমুর-কে পুরুলিয়া জেলাবাসীর জীবন-বেদ বললে অত্যুক্তি হয় না।

এখানকার গ্রামীন মানুষ দারিদ্রের জ্বালা নিয়ে ঝুমুরের কাছেই আশ্রয় নেয়। জীবন-বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে প্রকৃতির বুকে কণ্ঠে ধরে মাদল-বাঁশির প্রেম-পিরীতি। ফাগুন-দুপুর আড়চোখে দেখিয়ে দেয় 'পিঁদাড়ে পলাশের বন'। পাথুরে বুকের খাঁজ বেয়ে নেমে আসে নরম সবুজ। শাল-মহূলের বনে চলে আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা। ধামসা-মাদলের তালে নাচে গ্রামীন জীবন। দূরান্তের হৃদয়ও ঝুমুরের সুরে মাতাল হয়। এটাই তো প্রেমের মাটি। হড়কা বানে পাথরে পিছল খায় পা— 'বতরে পিরিতের ফুল ফোটে'। পাথুরে মাটির বুকে শষ্য ফলানোর অদম্য চেষ্টায় লাঙলের ফালে যে ক্লান্তি লেগে থাকে, সেই ক্লান্তিমোচনে সন্ধ্যার বাতাসে বাজে যাদুকরী ঝুমুরের সুর। আজকের গ্লোবালাইজেসনের দিনে আয়ারাম-গয়ারামের ভেল্কিতে ঝুমুর তার মান হারালেও মাঠ

ছাড়েনি। এই ভাঙা হাটের রাঙা ধুলো গায়ে মেখে ঝুমুর গানের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে একালের কবি ও কথাকার সৈকত রক্ষিতকে হাতে তুলে নিতে হয়েছে কলম। ভূমিপুত্র হিসাবে পুরুল্যার সংস্কৃতি তাঁর হৃদস্পন্দনের সঙ্গে মিশে আছে। বর্তমানে কোলকাতার বাসিন্দা হলেও তাঁর নিজস্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে তিনি হৃদ্‌মাঝারেই রেখেছেন, তাকে ছেড়ে দেননি।

খোঁপায় পলাশ গোঁজা হিলহিলানো গতরের দুলুনিতেই ঝুমুরের সুর-তাল-লয়ের বাহার ফোটে। প্রেম-পিরিতির উদ্দাম আকর্ষণে বুকের ভিতরের আবেগঘন হৃদ্‌স্পন্দন মাদলের বোল তোলে। সাঁঝ থেকে বিহান— এই পটভূমিতেই ঝুমুরিয়া সৈকত রক্ষিতের সৃজনভূমির বিস্তার। তাঁর হৃদয়ের গভীরে ছলকে ওঠে চিরাচরিত ঝুমুরের সুর, এই প্রজন্মের যাবতীয় ভালবাসাবাসি, বেদনা -যন্ত্রণার ঋজু ও বলিষ্ঠ স্বর। ঐতিহ্য বিসর্জনের বাজনায় তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়। অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র স্বরায়ণে তাঁর হাতে ফোটে বিভিন্ন স্বাদের ঝুমুরের কলি, নিজস্ব উপভাষায়।

গ্লোবালাইজেসনের আগ্রাসন আজ আর ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। গ্রাম-জীবনের পরিবর্তন হলেও আঁদাড়ে-পিঁদারে ঝিঙাফুল আজও ফোটে, থকা থকা শিমও ধরে; কিন্তু ধমাধম ধামসা তালে ঝুমুর কলি গলায় নিয়ে এই প্রজন্ম আর নাচে না। যে ঝুমুর একদিন আবালবৃদ্ধ হৃদয়ে মরমী আবেদন নিয়ে সিঁদ কেটে ঢুকে যেত, লৌকিক রসাবেদনে গেঁথে দিত জীবনের আলো-অন্ধকার— সেই ঝুমুর আজ একটা রসালো সাংস্কৃতিক বাজার। বাজারে তাকে আরো লোভনীয় করে তুলতে কামনা-বাসনার বেজায় প্রাবল্য মাদলের বোলে। সিন্দেসাইজারে তার স্বর গেছে পাল্টে, আবেদনে এসেছে সম্ভোগের হাতছানি। হৃদয়ে প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটনের বাসনা-কোমল ঝুমুরের সাম্রাজ্য আজ কামপুষ্পে রঙিন। রঙের চটকে তার নাম-গোত্রহীন বিস্তার। যেখানে প্রেম আছে, কালক্রমে সেখানেই আছে প্রেমের বিকৃতি। এই বিকৃতির হাত থেকে ঐতিহ্যবাহী ঝুমুরকে রক্ষা করার জন্যই কথাকার ও কবি সৈকত রক্ষিতকে রচনা করতে হয় ঝুমুর। এ তাঁর জন্মস্থানের ঋণ শোধ নয়, মাটি-সংলগ্ন মানুষ ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রীতি-সংযুক্ত বিবেকের দায়। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতায় কেবলমাত্র সীমায়িত প্রেম-তারল্য নেই, স্থানিক মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ঝুমুরের স্বরে উঠে আসে কাল-পাত্রের অসীম ব্যাপ্তি। যেমন হাসি-কান্নায় বিতায় মানভূমি জীবন তথা মানবজীবন, তেমনি তাঁর ঝুমুরের কথাকলিতেও সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বিস্তার। বিশ্ব আগ্রাসনও তাঁর হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। মানবজীবনের উন্নয়নমুখী স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করেও সংস্কৃতির বকচ্ছপ ঘরাণাকে তিনি মনে প্রাণে মানতে পারেননি। চোখে চোখে রেখে সাহসী প্রেমের দিন শেষ। মানবজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্বাসহীনতা— তাই যেন

'সকলেই সকলকে আড়চোখে দ্যাখে'। ঝুমুরিয়া সৈকতও বন্ধুনীর আশা-আশ্বাস যোগানো চোখে দেখেছেন কটাক্ষপাত। ধামসা-মাদলের তালে তার আরণ্যক শরীরের হিল্লোল নাই। তার প্রতি অঙ্গে বিশ্বায়নের অকাল সর্বনাশ, ব্যান্ডেল সুরেলা চালাকি। নোলক কিম্বা ফুলেল নাকসজ্জা ছেড়ে বন্ধুনীর অলংকারে আজ সেলেবের অনুকরণ। বদলে যাওয়া বন্ধুনীর আহ্বানে সাড়া না দেওয়াও অসম্ভব। বিশ্বায়নের হাতছানিও হয়তো এমনই। এটাই হয়তো ঝুমুর তথা গ্রামীণ সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ! প্রতি অঙ্গে সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করেও গ্রামীণ বন্ধুনীর নাগরিক চতুরালিকে অবজ্ঞা করা অসম্ভব। হয়তো বা মৃত্যু জেনেও। বন্ধুনীর আচরণগত পরিবর্তন কী ঝুমুরেরও নগরীকরণের প্রতিই ইঙ্গিত করে, ইঙ্গিত করে ঝুমুরের প্রতি সৈকতের প্রেম ও ঝুমুরের নিয়তির প্রতি!

সৈকত রক্ষিতের কলমে রচিত হয়েছে হরেক স্বাদের ঝুমুরগীতি। চৈতি ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুরও তাঁর গীতি প্রকরণ থেকে বাদ যায়নি। এ সবই তাঁর গ্রাম-যাপনের নির্যাস। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি গ্রাম্য প্রেমের শৈশব ও বাল্যের গ্রাম্য প্রেমকে ভুলতে পারেন নি। গৌরবহীন নাগরিক প্রেমকাব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখেন, চৈতের হুল, বৈশাখের ঝড় বুক পেতে নেওয়া বন্ধুনীর সঙ্গে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শৈশবের প্রেমবেলা। যার অশ্রুফোঁটা থেকে নিষ্কাষিত ঝুমুরিয়ার প্রেমকাব্যের বর্ণমালা। শৈশবের প্রেম আড়াল জানে না। কেননা, প্রেমের জন্য কোনো পাপবোধ নেই তার। কিন্তু যৌবনের আবির্ভাবে সেই বন্ধুনীর খোঁজে গভীর আড়াল, কিম্বা চলে যায় সামাজিক নিষেধের এক কঠিন দেওয়ালের অন্তরালে। স্মৃতিপথে কেবল উজ্জ্বল হয়ে থাকে পুতুল খেলার রঙিন মুহূর্তগুলো। মেঘরোদ-হৃদয়ে থাকে হারিয়ে ফেলার বেদনা। যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় 'একলা দুপুর খাঁচি-মাথায় মহুলতলে', তাকেই ঝুমুরিয়া হারান যখন সে 'থামের আড়ালে রজস্বলা'। এখানেও কী গীতিকার ঝুমুরের সঙ্গে লালমাটি মাখা হৃদয়ের বিচ্ছেদ প্রবণতার কোনো ইঙ্গিত দিলেন? নয়তোবা শরীরী সংকেতে তার মানসিক রূপান্তরণে বন্ধুনীকে নিতে হবে অন্য জীবনের অন্য পাঠ। বিচ্ছেদের পরে বিরহের মাঝে প্রেম তবু বেঁচে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ শুকিয়ে যায়। সেই শুকনো গোলাপের স্মরণ-পথেই লেখা হয় বিরহগাথা, যা আসলে কবিরই এপিটাফ। একদিন হারায় সব বর্ণ-গন্ধ। কায়াহীন ছায়ার স্মরণে থাকে কেবল কান্না। আর জেগে থাকে হারানোর বেদনাবাহী কিছু মুহূর্ত। পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা নিয়েই ঝুমুরিয়ার হৃদয় জানতে চায়— 'মহুয়া, ও মহুয়া কেন তুই/এতোই নিঠুর হলি...'। প্রেমময় এই কাতর জিজ্ঞাসা পক্ষান্তরে প্রকৃতিরই প্রতিশোধ। জীবন-রস ও কাব্য-রসের এই দ্বিবেণী বন্ধনই সৈকত রক্ষিতের ঝুমুরগীতির প্রাণ-ভোমরা।

বিশ্বায়নের ছাদনাতলায় আজ গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে নাগরিক সংস্কৃতি গাঁটছড়া

বেঁধেছে। যে নাগরিক চাতুলারিকে উপেক্ষা করা প্রায় অসম্ভব, তারই প্রেমে আজ গ্রামীন সংস্কৃতির মরণদশা উপস্থিত। একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে পরিবর্তনশীল মানব সমাজ ও সভ্যতার সুতীব্র আকর্ষণ-এই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে সৈকতের সরল অথচ হৃদভেদী স্বীকারোক্তি— 'আপন ঘরে পরের রকম/দিন বিতাছি চোরের মতন . . .।' বর্তমান সাংসারিক তথা সামাজিক জীবনও এমনই পাকে-চক্রে জটিল। যুগধর্মে নারী-পুরুষের যৌথ জীবনের অবক্ষয় ঝুমুরিয়া সৈকতের প্রত্যক্ষ সামাজিক অভিজ্ঞতা। সাংসারিক বন্ধনের জটিলতায় আকাঙ্খিত মহানন্দময় মুক্তিতে উড়ে এসেছে ঘর পোড়া ছাই। তবু মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে ঠকে শেখাই জীবন। জীবনের সাধনা ভুলে, মরিচীকার পিছনে ছুটে মূল্যবান সময় অতিবাহিত করাই আমাদের স্বভাব-দোষ। এই স্বভাব-দোষেই আমরা সর্বহারা। জীবন-সাধনা ছেড়ে মায়ার পিছনে ছুটলে সময়ের অপচয় বৈ সুফল কিছু পাওয়া যায় না। প্রেমের জন্য তত্ত্বজ্ঞানে সাধনার প্রয়োজন। প্রেমসাধনা না করে জলের চাঁদকে বা প্রেমের ছায়াকে প্রেম বলে জড়িয়ে ধরতে চাইলে তাকে সোনার দামে রাং-ই কিনতে হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান না নিয়ে অধরা চাঁদ (অধরচাঁদ) ধরতে চাইলে সর্বস্ব খোয়ানো ছাড়া উপায় নেই। হৃদয়ে যার বাস তাকে হৃদয় দিয়েই উপলব্ধি করতে হয়। মন যদি সঠিক কৃষিকাজ না জানে তবে ঝুমুরিয়া সৈকতের সত্য অনুভব, 'বেড় বাগানে ফুল ধরে না/ভাবনা-জমিন চষে মরি . . .।' রামপ্রসাদ তাঁর শাক্তপদে বলেছিলেন 'মন রে কৃষিকাজ জানো না'। ঝুমুরেও পাই এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি। তত্ত্বের আলিম্পনে শাক্তপদ ও ঝুমুর যেন সমভাব-ভাবনায় সমৃদ্ধ। আবার বাউল আঙ্গিকে সৈকতের এই ঝুমুরগীতি (তত্ত্ব ঝুমুর)-র মধ্যে জীবনসাধনের তত্ত্বকথা আলো-আঁধারি ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

নিত্যদিনের সাংসারিকতার বাইরে বৃহৎ যে ভাব-জগৎটা আছে, অবস্তুপ্রেমের সাধনা ছাড়া তাকে উপলব্ধি করা যায় না। বস্তুপ্রেমে মত্ত একজন সাধারণ মানুষের মতো ঝুমুরিয়া সৈকতের খেদোক্তি, 'প্রেমবাজারে মগ্ন আমি/ভাবের হাটে দিনকানা'। পরিবারের অসংখ্য বন্ধনীতে যে জীবন বাঁচে, সে তো ছকপরিধির বাসিন্দা— নানান 'আমি'-র জীবন। এই 'আমি' যখন চোখের আলোয় চোখের বাইরেটা উপলব্ধি করতে পারে, তখনই তার সামনে 'ভাবের হাট'-এর দরজাটা খুলে যায়। চিত্ত আয়ত্ত করে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। চিত্তকে সংযমে রেখে সমস্ত বস্তুগত চাহিদার উপরে সুচেতনার প্রতিষ্ঠাতেই পরমের সন্ধান মেলে। নয়তো আপন ঘরে হতে হয় পরবাসী, অসংস্কৃত চিত্ত অসংযমিতায় পরিচালিত হয়। তখন সংকীর্ণ চাওয়া-পাওয়ার কাছে চিত্ত বন্ধক রেখে বস্তুলাভের অঙ্কে ব্যক্তিস্বার্থে জীবন অতিবাহিত হয়। গীতিকারের একটি তিনকলি ঝুমুর রচনা আসলে 'কৃপাসিন্ধুর মিছরিদানা'। জীবনের এই সত্যদর্শনের তেতো, মিষ্টলোভী মানুষকে তিনি মিছরি বলেই

গেলাতে চেয়েছেন। তাই সৈকত রক্ষিতের ঝুমুর কেবল প্রেমে মন মজায়নি, আটপৌরে জীবন-দর্শনের প্রকাশে সুপাঠ্য ও শ্রুতিরম্য। তাঁর ঝুমুরগীতিগুলো আসলে তাঁরই বোধের জগৎ থেকে উৎসারিত জাগ্রত চেতনার ধ্বনি।

মানুষ সাংসারিক বৈষয়িকতায় ডুব দিয়ে বস্তুজীবনের প্রতি অন্ধমোহে মজে থাকে। জীবন-মাটি কর্ষণ করে যে সব ফুল-ফল ফলে, তাও-বারভূতে লুটে খায়। বস্তু-জীবনের ঠ্যালায় ভাব-জমিনের কর্ষণ আর হয়ে ওঠে না। সাংসারিক ভোগের যোগান দিতে গিয়েই সংক্ষিপ্ত জীবন-ভূমিতে বেলা পড়ে আসে। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতর বৃত্তিগুলোর সংস্কারসাধনের আর সময় থাকে না। এই গূঢ় গভীর জীবনতত্ত্বকথার প্রকাশ ঘটেছে কিছু কিছু ঝুমুরে। সৈকতের বেশ কিছু ঝুমুরগীতি এমনই সাধনতত্ত্বের ধারক। ভোগবাদী দর্শনে প্রেমের অপচয়ের কথা বলে ভনিতায় বন্ধনের মহানন্দময় মুক্তিলাভের সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন একটি ঝুমুরে— 'সৈকত জুড়ে ঝুমৈর কলি/রঙ্গে মাতো বেলাবেলি/সময় গেলে সাধন হবেক নাই।' ঐতিহ্যবাহী ঝুমুরের মধ্যে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে জীবনসাধনার গণতন্ত্রীকরণের যে রীতিটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একালের ঝুমুরেও তা স্পষ্ট। প্রেমময় এই লৌকিক চেতনাই ঝুমুরগীতের অন্তর্গত আধ্যাত্মিকতা।

রাজপৃষ্ঠপোষকতা হারানোর পর থেকেই সম্ভবত জীবনধারণের অর্থের প্রয়োজনে এবং স্থূল শৃঙ্গার রসে দর্শকের উন্মাদনা সৃষ্টিতে ঝুমুরে যথেচ্ছভাবে নাচনীদের ব্যবহার করা হয়। নাচনী শালিয়া-য় ঝুমুর ছিল একই সঙ্গে দৃশ্যকলা ও শ্রাব্যকলা। পালাবদ্ধ ঝুমুরে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হত নাচ। পরবর্তীকালে স্থূল চটুল নৃত্য পরিবেশনে ঝুমুরে লোকপ্রিয় হয়ে উঠলো 'লাচ'। কখনো দুর্বল সঙ্গীতকলাকে নৃত্যকলায় ঢেকে শ্রোতাকে দর্শক বানিয়েছে নাচনী, কখনো নৃত্যপটিয়সী নাচনীর দক্ষতা সঙ্গীতকলাকে অতিক্রম করে নৃত্যকালকেই মুখ্য করে তুলেছে। তবে রাজরাজড়াদের আমল থেকেই ঝুমুরে নাচনীদের আবির্ভাব রসিকের হাত ধরে। সমাজ-বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে প্রেমে-অপ্রেমে রসিকের পদতলাশ্রয়েই তাদের থাকতে হয়েছে। তারা না পেয়েছে ঘর, না পেয়েছে বর। শিল্পীর যথাযথ সম্মানও তারা পায়নি। নাচনীদের নাচ লোকসমাজকে যত আনন্দ দিয়েছে, লোকসমাজ ততই নাচনীদের জীবন বেদনা ও কলঙ্কে ভরে দিয়েছে। ঝুমুরকে ভালবেসে সমাজের দেওয়া কলঙ্ক তারা শরীর ভরে নিয়েছে। আর দর্শক-শ্রোতাদের ছদ্মপ্রেমে আখড়ায় আখড়ায় তারা যেন জীবনানন্দের 'ছিন্ন খঞ্জনা', যারা সমাজের তীব্র ঘৃণার মার হৃদয়ে নিয়ে যন্ত্রণাকাতর শিল্পসত্তায় ঝুমুরকে চরম জনমনোরঞ্জনী করে তুলেছিল। সেই নাচনীদের জীবন-জ্বালার শরিক একালের ঝুমুরিয়া সৈকত রক্ষিত। তাঁর উপলব্ধি, বাঁশিয়ালের এমন কোনো সুর নেই, যে সুর নাচনীর অন্তর্বেদনার প্রকাশ ঘটাতে

পারে। তাদের জীবন না ঘর কা, না ঘাট কা। তাদের জীবন-যন্ত্রণা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর কলঙ্কিনী রাধার হৃদয়-বেদনাকেও হার মানায়। ঝুমুরিয়া সৈকত নাচনীর বয়ানে বলেন, 'লোকে বলে রাধা রাধা/রাধার বেদন হামার আধা . . . ।' সুতরাং নাচনীদের জীবন-যন্ত্রণার কোনো তুলনা নেই। তাদের মৃত্যুতেও সেই যন্ত্রণার শেষ নেই। কানু প্রেমের কদর ততদিন, যতদিন দেহহিল্লোল দর্শক শ্রোতাদের নেশা ধরাতে পারে। সিন্ধুবালা দেবীর একটি ঝুমুরে অপগত যৌবনের ট্র্যাজিক বিলাপ শোনা যায়— 'ফুলটি যখন কলি ছিল কত ভ্রমর এলো গেল/হায়রে সুখের দিন চলে গেল এখন ভ্রমর আইসবে ক্যানে।' বোঝাই যাচ্ছে, অপগত যৌবনা নাচনীরা যখনই যৌবনবতী নাচনীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনমনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই তাদের নির্ভর করতে হয়েছে রসিকের করুণার উপর। কিম্বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাকুল প্রচেষ্টায় কাঁধে তুলে নিয়েছে ভিক্ষার ঝুলি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়কে স্বীকার করে নিয়েই সৈকত যে ঝুমুরগীতি রচনা করেছেন, 'নাচনী' ঝুমুরগীতটাই তার প্রমাণ।

যে ঝুমুরের প্রেমে পড়ে নাচনীরা সমাজ-সংসার থেকে বিড়াতিড়, সেই ঝুমুরের মূল সাধনাই হল প্রেম। কুল হারিয়েও ভুল না ভাঙা মানব-মানবীর প্রেম তো সামাজিক বাস্তবতা। কলঙ্কিনীর প্রেমে প্রেমিকের বুকে জ্বলে চিতার আগুন। তার উপরে বন্‌ধুনীর চোখে যেন 'বিজুরি চমকায়'। জীবন-যন্ত্রণায় অস্থির বন্ধু মৃত্যুর কাছ থেকে পালিয়ে পরম বিশ্বাসে ধরতে চেয়েছে বন্‌ধুনীর হাত। বন্‌ধুনী তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। কুল ভেঙে বরং কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলেছে। আমরণ প্রেমের দুঃসহ জ্বলন-সুখে বন্ধুকে মেটাতে হয়েছে বন্‌ধুনীর কলঙ্কের মাশুল। শাল-মহুলের আড়ে এই প্রেম ও জীবনের টানাপোড়েন ঝুমুরিয়া সৈকতের মৃত্তিকালগ্ন জীবনাভিজ্ঞতারই সরল প্রকাশ। কথাকার সৈকত এখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন তাঁর গল্পের চরিত্র ও চরিত্রময় জীবনের গল্প। ঝুমুরগীতিগুলোর মধ্যে দিয়েই তাঁর অনায়াস যাতায়াত অতীত বর্তমান-ভবিষ্যতের অখণ্ড সময় প্রবাহে। হাঁকা ঝুমুরের আদিম আবহেই অসামাজিক যৌন-রসিকতায় ঝুমুরের মধ্যে কামপুষ্প ভেসে এসেছে। একটি ঝুমুরে (দিদি লো, কুল গাছে বাঁকা কাঁটা) বৌদির শরীরের উপর দেওরের যৌন-রাহাজানির ছবি সমাজের অনেকমাত্রিক ক্ষতকেই তুলে ধরে। নিম্নবর্গীয় সমাজে অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রীতি বা প্রবণতা আজও অটুট। যে বয়সে একটা মেয়ে নিজের যৌন-সম্ভ্রম রক্ষায় যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না, সেই বয়সে শ্বশুরবাড়ি এসে তাকে দেওরের যৌন লালসার শিকার হতে হয়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতি ও নানান ভালো-মন্দর বিচারে, সংসার সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ এইসব মেয়েদের তা মেনেও নিতে হয়। পারিবারিক এই যৌন অত্যাচারের বেদনার্তি ও সাংসারিক ভীতি সে তার দিদির

কাছে প্রকাশ করেছে— "কদম ফুইলা আঁচল হামার/প্রেম ডুরিয়া শাড়ি/শাড়ি ধরে আড়ে দেওর/হেঁচকা টান দিল।/হামি আর যাব নাই কুলতলে/দিদি লো, কুলগাছে বাঁকা কাঁটা আঁচলে বিঁধিল...।" যেন সে 'অপণামাসেঁ হরিণা বৈরি'। সংসার থেকে পালিয়ে সেই মেয়ে তার দেওরের লালসা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। ঝুমুরের মধ্যে প্রতিস্বরিত এই সমস্যা শুধু আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বোধ হয় বিশ্বব্যাপ্ত। এই সমস্যা জর্জরিত জীবনের বিপরীতে এই ছবিও আছে, যেখানে প্রেমিকের তাঁতে প্রেমের ফুলতোলা প্রেমডুরিয়া শাড়ির জন্যে অপেক্ষা করে আছে তার প্রেমিকা। প্রেমিকার আশা-'তাঁতির সুতায় জুড়ব হামার মন/পিরিতি হবেক তাঁতে বুনা আঁচলের কদম।।' তার প্রেমিক-তাঁতি সওদাগর। প্রেমিকের হাতে বোনা চাদর গায়ে দিয়ে সে যাপন করে মাঘের শীত ও বিরহের কাল। সওদাগর-তাঁতির প্রেমে যদি কোনো কলঙ্কও থাকে, তার জন্য প্রেমিক তাকে প্রেম দিতে কোনো কার্পণ্য করবে না 'মাকুচরা কাপড়ের না দিব দাম কম।' কৃষ্ণর বাঁশিতে ব্যাকুলা রাধার মতোই মর্ত্যমানবী তার প্রেমিকের তাঁতের শব্দে ব্যাকুল। সমাজ-সংসারের এই রঙ্গে সৈকতের ভনিতা— 'কহে সৈকত হে অনঙ্গ/বুঝাও তোমার পিরিতি-রঙ্গ/তাঁতের 'চাদর বিকে দু-কুড়ি দর'। জীবনের সংকটে অর্থ ছাড়া প্রেম যে অর্থহীন, সৈকতের ঝুমুরে সেই বাস্তবতারও ইঙ্গিত আছে। প্রেম, বস্তুগত বা অবস্তুগত যাই হোক না কেন, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে 'টঙ্কা' বা টাকা অপরিহার্য। যেমন সংসারে 'লাভের গুড়ে পিঁপড়া মজে/দিনে দিনে দেনার দায়', তেমন ভাবজগতেও 'রাধে বল কৃষ্ণ বল/টঙ্কা বিনি প্রেম মিছাই।' অস্তিত্বের সংকট নিয়ে রূপসাগরে ডুব দেওয়ার বিলাসিতা সম্ভব নয়। তাই অর্থ হীন জীবনের প্রেম, শুকনো বাগান ফুটে ওঠা ফুলের মতো। শুকনো বাগানে ফোটা ফুল যেমন রসদের অভাবে দিনে দিনে শুকিয়ে যায়, নিদারুন জীবন-সংকটে প্রেমও দিনে দিনে অবসিত হয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যৌবনও একদিন ফুরিয়ে যায়। আর বোঝা হয় না, 'রূপের যে কী মানে!' সুতরাং অভাবী জীবনে প্রেম এলেও তাকে নীরব অভিমানেই যাপন করতে হয়।

কৃষি-প্রধান অর্থনীতির ভারতবর্ষে জঙ্গলমহলের কৃষি একেবারেই বেহাল। ফলে কৃষিতে কাজের সুযোগও নেই সারাবছর। দারিদ্র্যও তাই বছরভর। খাদ্যের সংস্থানেই এখানকার মানুষ নাজেহাল। কাশীরাম দাস লিখেছেন 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'। আজ একবিংশ শতাব্দীতে ঝুমুরিয়া সৈকত রক্ষিতের নিজের জন্মস্থান সম্পর্কে উপলব্ধি— 'জঙ্গলমহলের জীবন মরণ সমান।' মানুষের ন্যূনতম চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের যোগানও অপ্রতুল। এটা কেবল একটা অঞ্চলের ট্র্যাজেডি নয়, হয়তোবা দেশের অনেক মানুষের কাছেই এই ন্যূনতম জীবন-রসদ অধরা। সরকারী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের যে অংশ

জঙ্গলমহল হিসাবে চিহ্নিত, সেখানকার দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক বিপন্নতা এবং বেঁচে থাকার জন্য এই বিপন্নতার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই, ঝুমুরিয়া সৈকতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। একদিকে প্রকৃতিনির্ভর অনিশ্চিত কৃষি, অন্যদিকে ভৌগোলিক নানান প্রতিকূলতা— এই নিয়েই জঙ্গলমহলের বিপর্যস্ত কৃষিব্যবস্থা। কাঁসাই-কুমারী-শিলাই-এর স্নেহাশীর্বাদ সব জঙ্গলমহলবাসীর ক্ষেতে সর্বদা ও সর্বত্র বর্ষিত হয়নি। ফলে জীবন-যন্ত্রণা নিয়েই চলে এখানকার মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। জমিতে যে ধান হয় তাতে সামান্য মাড়-ভাতের যোগাড় হলেও স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার পরিধান কেনা সম্ভব হয় না। আয় ও ব্যয়ের অসমতায় নাজেহাল জঙ্গলমহলবাসীর অসহনীয় আক্ষেপ শুনি সৈকতের ঝুমুরে 'এক ছটাক জমিয়ে হামার এক ছটাক ধান/এক শাড়ি কিনতে গেলে দশকুড়ি দাম/হামি কী করে বউকে বসন পরাব/বল বঁধু বল, কী করে রাখি পরিবারের মান...।' সামান্য কৃষি-মজুরির বাইরে জঙ্গলের বাবুই ঘাস কেটে দড়ি পাকিয়ে বিক্রি করে যা হয়, তাতে সংসার প্রতিপালন তো দূরের কথা সন্তানের ক্ষুধানিবৃত্তিও সম্ভব হয় না। জঙ্গলমহলবাসীর এই ট্র্যাজিক জীবনের অসহায়তা ফুটে উঠেছে সৈকত রচিত ঝুমুরের কলিতে— 'দড়ি বিকে গামছা কানি/হাট মশলা ঘরকে আনি/ছিড়া খাইটে ছ্যেলা ঘুমায় ভোকে আনচান...।' জঙ্গলমহলবাসীর জীবন থেকে দুঃখের রাত্রির অবসান হয় না। তাদের দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণার কথা লিখতে গিয়ে সহমর্মী ও এই জীবন যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অংশীদার সৈকতের চোখে জল আসে। নারী ও শিশুদের যাপনযোগ্য পরিবেশ দিতে না পারার অক্ষম ক্রোধ শেষ পর্যন্ত 'এক বোতল মদে জুড়ায়'। বাসস্থানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, 'এক খোঁয়াড়ে শুয়োরের সঙ্গে ঘুমায় সন্তান।' এই দুর্নিবার জীবনজ্বালা নিয়েই জঙ্গলমহলের মানুষ মরণাধিক জীবনকে জাগিয়ে রাখে। সংশয়ের সঙ্গে ভাবতে হয়— এটা কী জীবন! যেখানে ভুখা পেটে শুয়োরের সঙ্গে কাটে শিশুর শৈশব! জঙ্গলমহলের সন্তান সৈকতের উপলব্ধিতে সেই 'জঙ্গলমহলের জীবন মরণ সমান।' অমৃতের পুত্রদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার এই ভয়ঙ্কর সংকট কেবল একটা আঞ্চলিক বৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকে না, একটা জাতীয় মহাকাব্যিক ব্যপ্তি পেয়ে যায়।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ঝুমুরিয়া রক্ষিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন না। অতি সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ মানসিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যময় সহাবস্থানে সীমান্ত সমস্যার সমাধানের পক্ষপাতী তিনি। এক্ষেত্রে কবিতাই তাঁর অস্ত্র। তাঁর বিশ্বাস কবিতা তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই মানুষকে শুভচেতনার পাঠ দেওয়া যায়। শিশুদের জন্য গড়ে দেওয়া যায় একটা সুন্দর বাসভূমি। এই দায়িত্ব নিজের

কাঁধে তুলে নিয়ে আসলে তিনি সাধারণ মানুষকেই আহ্বান জানান— 'আমি দশ হাজার মানুষকে কবিতা পড়াবো/দু-হাজার ধুলোমাখা শিশু নেবো কোলে/আয় আয় যুদ্ধ তুই আয় আয় চলে।' যুদ্ধকে ছেলেমির পর্যায়ে নামিয়ে এনে মানুষকে বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, সীমান্তে যে সব রক্ষী এবং সাধারণ মানুষ যুদ্ধের ফলে শহীদ হয়, তারা আমাদেরই প্রতিবেশী, আমাদেরই আত্মীয় পরিজন। রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে চলে সৌভ্রাতৃত্ব হত্যার আয়োজন। অথচ যুদ্ধের হুঙ্কারের আড়ালে চাপা পড়ে যায় অসংখ্য মানুষের দারিদ্র, 'যাদের ঘরে নেই চাল তেল কেরোসিন।' যুদ্ধের আবহাওয়ায় রাষ্ট্রের কাছের মানুষ কিছু ছদ্ম-স্বদেশী, ডাকাতি করে নেয় কাঙালের সামান্য সম্পদ, তার জন্য 'যম' হয়ে প্রাণ নিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। কবি গীতিকার সৈকত জানেন যুদ্ধের পরিণতি। পাওয়া যাবে না কিছু, যা সামান্য কিছু আছে তা হারাবে দেশের অনাহারী মানুষ। জাত-ধর্মের বৈরীতাকে উস্কে দিয়ে সীমান্তপারে জারি রাখে ছায়াযুদ্ধ, রাষ্ট্রের ভাঁড়ার থেকে খরচ হয়ে যায় সাধারণ মানুষের জীবন-মানোন্নয়নের রসদ। এই যুদ্ধ-পরিস্থিতি মানুষকে শুধু ভাতে মারে না, মানুষকে সন্ত্রস্ত করে আঁতেও মারে। সুতরাং এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে রাষ্ট্র যদি দেশদ্রোহী বলে বলুক, ঝুমুরিয়া সৈকত তবু যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় অক্ষমতার বাস্তবতাকেই তুলে ধরেন— 'মজুরির বিনিময়ে দেশপ্রেম বেচি/কিসের গৌরব প্রতিবেশী ভাই মেরে/শাসক-শোষক দুধেভাতে খায়/যুদ্ধের আগুনে আমাকে ঠেলে/গরিবের কুঁড়েঘরে আদিম আঁধার জ্বলে/তবু ভেরি বাজে ভোট এলে/আয় আয় যুদ্ধ তুই আয় আয় চলে।' যুদ্ধ-আহ্বানের ভঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত তিনি এক বজ্রগর্ভ পরিহাসকে জিইয়ে রেখেছেন অদ্ভুত কৌশলে।

‘ভাস্বর মহান পরাজিত বীর’ কর্ণঃ প্রসঙ্গ ‘প্রথম পার্থ’

দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত

আধুনিক মানুষের জীবনচারণার অভিযোগ নিয়ে আবির্ভূত কবি বুদ্ধদেব বসুকে মনের জটিলতা, সংশয়, আর্তি, অস্থিরতা তাড়া করে বেড়িয়েছে জীবনের শেষ অধ্যায়েও। সেই যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ তাঁর কাব্যনাট্য ‘প্রথম পার্থ’। মহাভারতের চরিত্রগুলি বুদ্ধদেবের কলমে হয়ে উঠেছে জীবন্ত, আমাদের পরিচিত জগতের মানুষে। নিজের ভুল ঢাকার অভিপ্রায়ে কুন্তীর নাটকীয় সংলাপ, ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার আশায় দ্রৌপদীর নির্লজ্জ সমর্পণের ছলনা, ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণের শুভাকাঙ্খীর মুখোশ পরে প্রতিনিয়ত কর্ণকে মৃত্যুমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্ররোচনা এবং বৃদ্ধদের গণমানসের প্রতিনিধিত্ব-মহাভারতের কাহিনির আশ্রয়ে আধুনিক সময় ও মানসকে তুলে ধরেছেন সচেতন বুদ্ধদেব বসু। সর্বোপরি দ্বিধাগ্রস্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয়ের জন্য তৎপর কর্ণের মধ্যে আমরা খুঁজে পাব সমসাময়িক সেই যুবশক্তি, যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে লড়ছিল সমাজবদলের, পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ বদলের স্বপ্ন চোখে নিয়ে— সেই নকশালপন্থীদের ছায়া। যাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল সঠিক কিন্তু পন্থা ছিল ভ্রান্ত। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর “প্রথম পার্থ” কাব্যনাটক অবলম্বনে এই বিষয় গুলির ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে।

সূচক শব্দ: আধুনিক সময়, ছলনা,আত্মপ্রতিষ্ঠা, নকশালপন্থী।

আধুনিক মানুষের জীবনচারণার অভিযোগ নিয়ে আবির্ভূত কবি বুদ্ধদেব বসুকে মনের জটিলতা, সংশয়, আর্তি, অস্থিরতা তাড়া করে বেড়িয়েছে জীবনের শেষ অধ্যায়েও। কিন্তু প্রৌঢ় পরিণত বুদ্ধদেব ততদিন অনুভব করতে পেরেছেন—

“ভাবতে ভালো লাগে
বৈরাগ্য, নির্জনতা-দ্বন্দ্বহীন, ছন্দোবদ্ধ দিন,

অন্তরীন দিনের পরে দিন।
কিন্তু আমি জানি, আমার পথ ভিন্ন,
আমি অপ্রিয় দুসাধ্যের সাধক।" (প্রথম পার্থ)

ততদিন কবি পার করে এসেছেন দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাংলাতে পুঞ্জীভূত নকশাল আন্দোলনের আবহে। এক যান্ত্রিক অথচ উত্তাল, অস্থির অথচ স্থবির যুগসময় বিভ্রান্ত করেছে কবি তথা সমগ্র জনমানসকে। ইতিমধ্যে আবার কবি রাসবিহারী এভিনিউয়ের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন নাকতলার বাড়িতে। সেখানে আসার ফলে পরিচিত মহলের সাথে জনসংযোগ কমে আসতে লাগল, তা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো নকশাল আন্দোলনের সময়; প্রৌঢ় কবি নিঃসঙ্গতায় ডুবতে লাগলেন। এই সময়ে কবি জন্ম দিতে লাগলেন একের পর এক কাব্যনাট্য। এতদিনকার কবিজীবনের নেপথ্যে চলা আয়োজন-গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয় তৈরী করেছে পৌরাণিক বিষয়ভিত্তিক এই কাব্যনাট্যগুলির পটভূমি। " পুরানের কাহিনীকে তিনি নিজের মনের মতো নতুন ভাবে সাজিয়েছেন। তাতে সঞ্চার করেছেন আধুনিক মানুষের মানসিকতা ও দ্বন্দ্ব বেদনা।"[১] এমনই এক কাব্যনাট্য 'প্রথম পার্থ' (লেখা ১৯৬৯, প্রকাশ ১৯৭০)-তে ৬০ বছরের প্রাজ্ঞ বুদ্ধদেবের কলম সৃষ্টি করেছে পরাজিত বীর কর্ণের এক নতুনতম আখ্যান। আধুনিক যন্ত্রণাময় জীবনের গভীরতা, দ্বন্দ্ব, অসহায়তা, ব্যপ্তি এবং বহুপঠিত পুরাণপ্রসঙ্গ একই সুতোয় গাঁথা হয়ে আজ নাটকটি লেখার অর্ধশতাব্দী পরেও আমাদেরই হয়ে আমাদের মনের কথাকেই অকপটে তুলে ধরে।

মহাভারতের অনুসারী হয়েই সূচনা কাব্যনাটকটির -সূর্যের বিপরীতে ছায়ার নিশ্চিত আশ্রয় তৈরি করা কর্ণের স্থির মূর্তি দিয়ে। কিন্তু এরই সাথে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে রেখেছেন দুই বৃদ্ধকে, যাঁদের কাছে কর্ণের দর্শনপ্রার্থীরা নিজেদের মনোবাসনার আভাস দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁরা সাধারণ জ্ঞানী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন বাকি চরিত্রগুলিকে; গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো যাদের ক্রিয়াকলাপ। এই বৃদ্ধদের মানসিকতা যেন আধুনিক সমস্যা জর্জরিত জটিল জীবনে দাঁড়িয়ে অতীতবাসী শান্তি-নিশ্চিন্ততা-আরামকামী মানুষের অসহায়তা; যাঁদের কাছে কর্ণ অবিবেচক, কারণ তিনি পান্ডব বা কৌরবপক্ষের কেউ না-হয়েও আজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত—

"কে না বোঝে পরাজয়ের চেয়ে অর্ধেক রাজত্ব অনেক ভালো
সর্বনাশের চেয়ে অনেক ভালো সুবিচার।"

কিন্তু এই বৃদ্ধদের কুটিল রাজনৈতিক ভাষণ এবং সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র শোনা আর বিনা প্রশ্নে

মেনে নেওয়া ছাড়া কিছুই করনীয় নেই। এই বৃদ্ধরা প্রতিনিধিত্ব করেন আপামর গণমানসের, রাজনীতির হাতে যারা খেলার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুন্তী কর্ণের কাছে এসেছিলেন কর্ণের জন্মকথা শোনাতে, যাতে তাঁর 'মন আরো নির্ভার হবে', যা কর্ণের জন্য সৌভাগ্যময় হলেও কুন্তীর জন্য আনন্দের। কিন্তু কুন্তীর দ্বিধা ছিল 'অন্যের কথা মানতে অনভ্যস্ত' স্বপ্রতিষ্ঠিত, স্বনির্ভর কর্ণ তাঁর মাতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দেবে কিনা। আসলে মহাভারতের মতো বুদ্ধদেবের কুন্তীও এসেছিলেন অর্জুন তথা পান্ডবদের মৃত্যু ও পরাজয়ের আশঙ্কায়। কর্ণও এখানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন মহাভারতের অনুসারী হয়েইঃ

"আমি অধিরথের পুত্র, কর্ণ, রাধা আমার মাতা"

কুন্তীর হৃদয় সেইদিন আজ্ঞা দেয়নি সেদিন অনুভব করেননি, যেদিন কর্ণ অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল অস্ত্রপরীক্ষায় কিংবা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণের অপমানে-আসলে তখন কুন্তী জানতেন অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য তাদের সহায় ক্ষত্রিয় পুরুষেরা আছেন, যাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে অবশ্যই অর্জুনকে আড়াল করবেন তার সমকক্ষ কর্ণের থেকে, কিন্তু সম্মুখসমরে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তাই কুন্তীকে আজ আসতে হয়েছে কর্ণের সামনে। আর এরপরেই সরে যায় মহাভারতের ছায়া। কর্ণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে আগে থেকে জ্ঞাত নন এবং কুন্তী তাঁর কাছে অর্জুনজননী, যিনি পুত্র কর্ণের কাছে জননী নন রাজ্ঞী হিসেবেই উপস্থিত। প্রথম থেকেই কুন্তী অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন— তাঁর আবেগ, তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে সুপরিকল্পনার ছাপ— তাতে কোথাও নেই সহজাত মাতৃত্ব। কর্ণকে পুত্র বলে আলিঙ্গন করার আগে তাঁকে ভণিতার আশ্রয় নিতে হয়—

"তোমার সঙ্গে অচিরে তাঁর দেখা হবে, কর্ণ
দেখবে কেমন অবিকল যে প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার"

পুত্রের কাছে কিসের এত আড়াল! আজ কুন্তী এসেছেন কর্ণের কাছে, কারণ তিনি চাননা— "শান্তিরক্ষার জন্য পঞ্চপান্ডবকে ভিক্ষান্ন খেয়ে বাঁচতে হবে চিরকাল," আর তাই কর্ণের মাতৃত্বের প্রতিদান হিসেবে কুন্তী নিয়ে এসেছেন 'প্রথম পার্থ' অভিধা এবং ষষ্ঠাংশে দ্রৌপদীর ভাগ। কিন্তু, তবু ব্যর্থ হল কুন্তীর কামনা। তাঁর সুনিশ্চিত, সুঅভিনয়, দক্ষতা হেরে গেল কর্ণের ব্যক্তিত্বের কাছে। কুন্তী "বুঝলেন জীবনের ধারায় জননীর কর্তব্য-বন্ধন মুক্ত করে একবার পুত্রকে ভাসতে দিলে সে ভেসেই চলে, সারা জীবন আর তাকে ধরা যায়না, ধরতে চাইলেও না।" [৩] প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কুন্তীকে দেখাতে চেয়েছেন সুযোগসন্ধানী

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে, যাঁর মূল উদ্দেশ্য কর্ণকে কৌরবপক্ষ থেকে নিবৃত্ত করে সেই পুত্রদের জীবন ও জয় নিশ্চিত করা যাদের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে তাঁর কোনো লজ্জা বা কলঙ্কের ভয় নেই, যাদের তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন পান্ডুর ক্ষেত্রজ হিসেবে। তাই এতদিন যাবত অন্ধকারে রেখে আজ কর্ণের কাছে তখনই মাতৃঋণ পরিশোধের দাবী করা যায় যখন—

"এই সংকটকালে, আমাদের রাষ্ট্র যখন টলমল,
আর ভরতবংশের ভবিষ্যত সংশয়ময়"

ফলত কর্ণের তীব্র বাক্যবাণে মায়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে তাঁর স্বরূপ— "আমি, ব্যাসের পুত্রবধূ, কৃষ্ণের পিতৃস্বসা"। যে সময়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেবের এই রচনা সেইসময়ের স্বার্থান্বেষী আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি কুন্তী নিজের অপারগতাকে ঢাকতে খুব সহজেই কর্ণকে অভিযুক্ত করে প্রশ্ন করতে পারেন— "যদি স্বপ্নে তোমাকে ধরা দিয়েছিলো সত্য, তাহলে স্বগৃহে কেন/ ফিরে আসোনি ?" আর তখনই আমরা মহাভারতের কুন্তীকে মিলিয়ে নিতে পারি আমাদেরই আশেপাশে দেখা স্বার্থলোভী মুখোশধারী মানুষগুলির সাথে। এখানেই বুদ্ধদেব বসুর অভিনবত্ব।

এরপর রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত পঞ্চপান্ডব পত্নী দ্রৌপদী— যাঁর রূপের পরিচয় হিসেবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর বৃদ্ধদের মুখেও গেয়েছেন যৌবনের গান; যাঁর অনুষঙ্গে কবি ফিরে গেছেন তাঁর স্বভাবসুলভ দৈহিক ইন্দ্রিয়ঘনতায়। সেই দৈহিক আবেদন নিয়েই আজ কর্ণের কাছে নিবেদনমুখর যাজ্ঞসেনী, যাঁকে নিয়ে কর্ণের বক্তব্য—

"আমি চেয়েছিলাম জয় করতে দ্রৌপদীকে– নিজের জন্য—
একান্তভাবে"

অথচ সেই নারী আজ কর্ণের কাছে এসেছেন নিজেকে সঁপে দিতে, যার প্রতিদানস্বরূপ তিনি চান পঞ্চস্বামীর জয় নিশ্চিত করতে, কারণ দ্রৌপদীও জানেন অর্জুনের সমকক্ষ বীর কর্ণঃ

"...শুধু তিনি সম্ভবপর বাধা
আমাদের সিদ্ধির। তাঁকে আমার ভয়।"

আর তাই দ্যুতসভার অপমানে (দ্রৌপদীও কুন্তীরই মতো নিজের স্বয়ম্বর সভায় কর্ণকে করা অপমান এক লহমায় ভুলিয়ে দিতে চান কর্ণের অপরাধের প্রসঙ্গ টেনে) কর্ণকে দোষী করলেও আজ তিনি নিজেই হাজির নিজের বিনিময়ে স্বামীদের কল্যানকামনায়। কর্ণের প্রশংসায় দ্রৌপদীকে পঞ্চমুখ করার আগে নাট্যকার দিতে ভোলেননা স্বরভঙ্গির নির্দেশ—

'চাটুবাক্যের ধরনে, কিন্তু সতর্কভাবে'। অবশ্য প্রত্যাখ্যান করার মুহূর্তেও বুদ্ধদেবের কৃষ্ণা কর্ণকে দেখেছেন "শুধু এক ঝলক উজ্জ্বলতা/এক দীপ্ত পুরুষের আভাসমাত্র"; আর সেই একঝলক দেখাতেই অর্জুন পত্নী কর্ণ ও অর্জুনের কণ্ঠস্বর এমনকি 'ওষ্ঠরেখা'র সাদৃশ্য খুঁজে পান। পাঞ্চালী আজ প্রত্যাশা করেন— "কর্ণ, আমি তোমার বন্ধুতা চাই।" কর্ণকে ঘৃণ্য শত্রু বলে ঘোষণা করার পরেও পান্ডবপত্নীর এহেন নির্লজ্জ অকুন্ঠিত আবদার, আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক সময়োপযোগী কবিমানসেরই পরিচায়ক।

আধুনিক জটিল দ্বন্দ্বময় উদভ্রান্ত যুগে দাঁড়িয়ে সেই যুগের উপযোগী করে এবং তাঁর পরবর্তী সময়ের প্রতিটি সচেতন মানুষের আত্মার আত্মীয় করে কর্ণকে উপস্থাপিত করার মানসিকতা বুদ্ধদেবের কলমে জন্ম দিয়েছে মহাভারতের দুই অন্যতমা প্রধানা নারীর হীন কুটিল স্বার্থপর মানস, যাঁদের পরিচয় কর্ণের কাছেঃ

"একজনঃ আমার অ-দৃষ্টা, অপরিচিতা-আমার মা।
আর অন্যজনঃ আমার দূরাচারিনী কান্তা।
দুই নারীঃ আমি যাদের ভালবাসতে পারতাম।"

যে দুই চরিত্র সম্পর্কে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর কথা ধার করে বলা যায়— "বস্তুত কর্ণের মনস্তত্ত্ব গঠনে দুটি নারীর অবদান সাংঘাতিক। কর্ণের জীবনে যে বিকারগুলি ঘটেছে, যে আচরণগুলি তাঁর জীবনে পরস্পরবিরোধী— সেই বিকার এবং স্বতোবিরোধিতার মূলে আছে দুটি নারীর ভূমিকা— এবং সে দুটিই প্রত্যাখ্যানের কাহিনি। এই দুই নারীর প্রথমটি কুন্তী, দ্বিতীয়জন দ্রৌপদী।"[৪] জননী ও দয়িতা যাদের সামনে নিজেকে নিঃসংশয়ে উন্মোচিত করা যায় পরিস্থিতি তাদের কাছেও কর্ণকে আত্মসমর্পণ করতে দেয়না; অন্তর দীর্ণ হয়, প্রকাশিত হতে চায় আবেগ তবু কড়া হাতে তা দমন করতে হয় আধুনিক কর্ণদের; পুরাণের মহামানব কর্ণের মতো সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে নয়, সাধারণ যুবা কর্ণ তাদের স্বীকার করেও অতিক্রম করার সাহস রাখে।

বুদ্ধদেবের কর্ণ একমাত্র কৃষ্ণকেই সাদর অভ্যর্থনায় ডেকে নিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই নিজেকে উজাড় করেছেন, প্রকাশ করেছেন এতদিন যাবত চেপে রাখা মনোবেদনা। যদিও কর্ণের অজ্ঞাত নয় কৃষ্ণ সম্মুখ সমরের তুলনায় অন্যায় যুদ্ধেই অধিক পারদর্শী, তবু কর্ণের মতো অসহায় নির্বান্ধবেরা কৃষ্ণের মতো বন্ধুত্বের মুখোশ পরে থাকা চক্রীদের জালে জড়িয়ে পড়েন নিজেদেরই অজান্তে। অন্যদিকে কৃষ্ণ প্রতিমুহূর্তে কর্ণকে টোপ দিচ্ছেন যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর ;সমগ্র বিশ্বে শান্তির প্রচারক হয়ে উদাহরণ তৈরী করার জন্য; ভ্রাতৃহত্যার মতো কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য। যদিও তাঁর কাছে অজ্ঞেয়

নেই—

"...কর্ণকে
আমি যতদূর জানি, কেউ কখনো পারবে না
তাঁর স্বীয় সংকল্প থেকে একচুল টলাতে,
এক তিল হেলাতে,
বা হার্দ্য বচনে ভোলাতে,
বা ন্যায়, অন্যায়ের অতি সূক্ষ্ম তর্কের মধ্যে,
তাঁর চিত্তকে অবশ করে দিতে, অকস্মাৎ।"

আবার যুদ্ধের আগে কুন্তী ও দ্রৌপদীর আগনমে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়া কর্ণকে তিনি ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপিত করতেও ভোলেননা। কারণ তিনি অনুভব করেছেন—

"আমি দেখছি তোমার হৃদয় দ্বিখন্ডিত;
এক অংশ চায় ভালবাসতে, অন্য অংশ শত্রুতায় বদ্ধমূল।"

আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মুহূর্ত বিলম্ব হয়না তাঁর। প্ররোচিত করতে থাকেন কর্ণকে যুদ্ধের জন্য, নাহলে যে ছলনার আশ্রয়ে কর্ণবধের কাহিনি রচনা করে তাঁর শঠতার সঙ্গী অর্জুনকে বিশ্বের দরবারে অপরাজেয় প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা। বুদ্ধদেবের কৃষ্ণ আধুনিকমনস্ক, শঠ, কৌশলী, কূটনীতিবিদ, ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ; যাঁদের প্রতারণায় পরাজিত হতে বাধ্য আধুনিককালের বীর, মানবিক, প্রতিবাদমুখর, আত্মানুসন্ধানকারী কর্ণেরা। আর তাই অর্জুন এবং কর্ণের শক্তির পরীক্ষায় প্রশ্ন উঠলে বুদ্ধদেবের কৃষ্ণ কর্ণকে বলতে পারেন— "তুমি কি অর্জুনের সারথিকে বিস্মৃত হলে ?" জানিয়ে দিতে পারেন কিভাবে তিনি কর্ণের জন্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপহার 'মৃত্যু' কে পরিকল্পনা করে রেখেছেন; সাথে এও বলতে পারেনঃ

"আমি তোমাকে অগ্রিম সব জানিয়ে দিলাম
এর নাম মিথ্যাচার ?"

এখানেই বুদ্ধদেবের কৃষ্ণ একাত্ম হয়ে যান সর্বকালের সবদেশের সেই চাটুকার রাজনীতিবিদদের সাথে, যাদের কাছে মনুষ্যত্বের চেয়ে দামী দম্ভ; ভালোবাসার চেয়ে মূল্যবান ক্ষমতা আর যাদের ধর্ম 'স্বার্থতা'। যাঁদের কাজ ঘটকের ,যাঁদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়েই পৃথিবীজুড়ে চলতে থাকে ক্ষমতা বাঁচানোর জন্য পরিকল্পিত মৃত্যুমিছিল— "আমি কখনো মেলাই, কখনো ছড়াই, কিন্তু নিজে থাকি সর্বদা বাইরে।" তবু কর্ণেরা তাঁদের আলিঙ্গনে

আবদ্ধ করেন, কারণ চাতুর্যের সাথে তাঁদের বিভ্রান্তিকর মিথ্যা মেকি প্রশংসাবাক্য শুনিয়ে যায় কৃষ্ণরা—

"কৃষ্ণ, আমাকে একটি প্রিয় কথা শোনালে তুমি
সম্ভব নয় অর্জুনের হাতে আমার পরাভব।....
আমার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্ত
আমার সব বাসনার তৃপ্তি
আমার সব স্বপ্নের সফলতা—
তা আমাকে উপহার দেবে—
তুমি, কৃষ্ণ, যাকে কেউ-কেউ বলে নরশ্রেষ্ঠ-বিশ্বম্ভর!"

'প্রথম পার্থ' কাব্যনাটকটির সবকটি চরিত্রই বিকশিত হয়েছে 'বিরাট পুরুষ' কর্ণকে আবর্তন করে। বুদ্ধদেবের তৈরি কর্ণের ব্যক্তিত্ব ম্লান করে দিয়েছে মহাভারতের বিশাল উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তিকে। বুদ্ধদেবের কর্ণ আধুনিক পৃথিবীর সেই যুবশক্তি, যে নিজের জীবনকে বাজি রাখতে পারে আত্মদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির আশায়, স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মমর্যাদা অন্যতম নায়ক পুরুষ আমাদের কাছে হীন প্রতিপন্ন হন, অর্জিত নয় দানের প্রাপ্তি মনে হয় তাঁর অম্লান কীর্তি। আর কর্ণ উদ্ভাসিত হন সেই আলোকে যেখানে—

"শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সবশেষ সাফল্য,
এক অন্তিম ও অন্তহীন অভিনন্দন,
এক মৃত্যু, যাতে আহত হবে সর্বযুগ,
এক অমরতা, দিনে দিনে উজ্জ্বলতর।"

পরাজিত হয়েও তিনি জয় করলেন পাঠক হৃদয় তাঁর স্বকীয়তা দিয়ে।

সচেতন বুদ্ধদেব প্রথমাবধি কর্ণকে রচনা করেছেন মহাভারতের চিরাচরিত চরিত্রগুণের ব্যতিক্রমী করে। "...বুদ্ধদেবের চিত্রায়িত 'পৃথার প্রথম পুত্র' এবং 'পাঞ্চালীর প্রতিহত প্রচ্ছন্ন প্রেমিক'—এই কর্ণ বস্তুত একটি নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া চরিত্র, যা প্রতিষ্ঠিত মিথকে বহিরঙ্গে লঙ্ঘন না করেও অন্তরঙ্গে অনেক বেশি ভাবঋদ্ধ করেছে। যা একান্তই আধুনিক মননের ফসল।"[৫] তিনি অন্যদের মতো উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেননি কোনোকিছুই, যদিও সেই সুযোগ ছিল, তবু তিনি 'স্বপ্রতিষ্ঠিত' স্বনির্ভর। আধুনিক বিচলিত যুবক কর্ণ প্রশ্ন করার ও উত্তর শোনার সৎসাহস রাখেন মা ও পিতার সঙ্গম মুহূর্তের—

"একি সম্ভব যে সূর্যের তেজঃপুঞ্জকে

কখনো সহ্য করতে পেরেছিলেন কোনো মানবী—
এমনকি দীপ্তিময়ী কুন্তী ?"

যুগমানস বুদ্ধদেবের কর্ণকে বাধ্য করেছে নিজ জন্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হতে। মায়ের প্রতি পুত্রের শ্লেষবাক্য নিঃসৃত হয় এতদিন ধরে তাঁর পরিচয় গোপনে রেখে আজ আচমকা তা প্রকাশ্যে আনার জন্য—

"তুমি লজ্জা পেলে না, নতুন করে লজ্জা পেলে না
আজ আমার সামনে এসে দাঁড়াতে, আমাকে পুত্র বলে ডাকতে ?"

কি তীব্র এই আক্রমণ। পুরাণের ধার্মিক বীর কর্ণ নন, কুন্তীর বিপরীতে দাঁড়িয়ে যে কর্ণ তিনি তাঁর মানসচক্ষু দিয়ে আবলোকন করতে পারেন কুন্তীর আগমনের কারণ। উপলব্ধি করতে পারেন পান্ডবের শ্রীবৃদ্ধি ও অর্জুনের আয়ুভিক্ষার জন্য আজ কুন্তীর মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত হয়েছে। তাই কুন্তীর সামনে হওয়া তাঁর অপমানের প্রসঙ্গ টেনে এনে মাকে তিনি অভিযুক্ত করেন। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ের প্রতিদানে পাওয়া রাজসিংহাসন, এমনকি কাঙ্ক্ষিত নারীর অধিকার একলহমায় অস্বীকার করে দৃপ্ত কন্ঠে উচ্চারণ করতে পারেন—

"আমার কাম্য নয় কোনো নারী— কোনো রাজত্ব—
যা বিনা চেষ্টায় জন্মসূত্রে প্রাপনীয়
আমার গ্রাহ্য নয় অনর্জিত কোনো অধিকার।"

সমসাময়িক যুবসমাজের মতোই এই কর্ণও প্রাপ্তিতে বিশ্বাসী নন, বিশ্বাসী অর্জনে— নিজের সর্বশক্তি দিয়ে এমনকি প্রাণপণ করেও যা অর্জিত হবে। কর্ণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত যেসব কারণে তাঁর একটি প্রকাশিত কুন্তীর কাছে— অসময়ের আশ্রয়দাতা দুর্যোধনের বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারবেন না রাজত্ব ও জয়ের লোভে। কর্ণের মানসে পরিস্ফুট বুদ্ধদেব বসুর নৈরাশ্য হতাশাকে জয় করার সেই প্রত্যয়— যার নাম 'মূল্যবোধ'- আধুনিকযুগে যার অভাব প্রত্যহ পরিলক্ষিত। কর্ণকে আশ্রয় করে উত্তরণের আলোকে পৌঁছাতে চেয়েছেন নাট্যকার। তাঁর কর্ণ মহাভারতের কর্ণের মতো পরিবারের দোহাই দেননা কুন্তীকে অস্বীকার করতে, বলিষ্ঠভাবে তিনি বলতে পারেন আধুনিকমানসের সেই বৈশিষ্ট্য যা নিসঙ্গতা নির্জনতা প্রিয় তাই তাঁর আকাঙ্খিত; যা আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরক— যে বোধ আমাদের প্রশ্ন করতে শেখায়, আমাদের উদ্যমী করে তোলে নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে। তাই কর্ণ অনায়াসে বলতে পারেন—

"আমি কারোরই নই। কাউকে আমি আমার বলে ভাবি না।
আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর -কিছু নয়।"

অথচ যে নারীর রূপের রশ্মি আজও কর্ণের পক্ষে দুঃসহনীয়, যে নারীর কন্ঠস্বর আজও কর্ণকে উৎপীড়িত করে, যে নারীর সাথে কর্ণের সম্পর্ককে ব্যখ্যা করার জন্য আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে রবি কবির— "ঘরেতে এলো না তো সে/মনে তাঁর নিত্য আসা যাওয়া"—সেই নারী সেই প্রিয়ার কাছে স্বীকার করে গেছেন কর্ণ তাঁর যুদ্ধলিপ্সার প্রকৃত কারণঃ

"শুধু কিঞ্চিত খ্যাতি আছে-হয়তো ভিত্তিহীন।
আমি তাই চাই-পরীক্ষা...
যার মধ্য দিয়ে, অবশেষে,
আমি পাবো আমার আত্মপরিচয়,
হতে পারবো নিজের কাছে প্রকাশিত-ও প্রমাণিত।"

এই পরীক্ষা নিজের অস্তিত্বরক্ষার পরীক্ষা। কর্ণের মতোই যুবকসমাজ যারা আজ বৃন্তচ্যুত, দিশাহারা, অস্থির, বিভ্রান্ত তারা জানে—

"যাকে বলে উদ্যম, চেষ্টা, পৌরুষ— যুদ্ধ তারই নামান্তর,
যুদ্ধ হীন কোন কর্ম নেই জগতে"

এই তীরহীন অনবরত ভেসে যাওয়া আধুনিক মানুষের কাছে সব কিছুই সব যুদ্ধই জীবনযুদ্ধ, যেখানে অনবরত আচমকা আঘাত, অবাবনীয় জটিলতা, অপ্রতিরোধ্য সংকট অস্তিত্বকে করছে বিপন্ন— সেই জীবনযুদ্ধে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তির নিজের পারগতার পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে নিরন্তর— তবেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। সখা কৃষ্ণের কাছেও নিজেকে এভাবে উন্মোচিত করেছেন কর্ণ নিজেকে—

"সে অর্থ দেবে আমাকে, আমার অস্থিত্বকে। আর বিনিময়ে
নেবে আমার চরম চেষ্টা, অন্তিম উদ্যম, আমার সব অব্যবহৃত আবেগ।"

দ্রৌপদী, কাঙ্ক্ষিত নারীর আত্মসমর্পনের প্রস্তাবেও একইরক নিশ্চল, দৃঢ় কর্ণ। মনের ক্ষত এতটাই গভীর যে সমগ্র কথোপকথনে একবারমাত্র সক্ষম হলেন কৃষ্ণার অধুনা পরিচয় 'পান্ডবপত্নী' সম্বোধনে, তাও একেবারে শেষমুহূর্তে বিদায় সম্ভাষণে। পুরাণের শরীরসর্বস্ব প্রেম নয়; বুদ্ধদেব পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যেও প্রোথিত করলেন মননধর্মী প্রেম। আর তাই ষষ্ঠকালে দ্রৌপদীর 'পতি' হওয়ার লোভনীয় প্রস্তাবকে অবলীলায় ত্যাগ করলেন কর্ণ। এই কর্ণের দ্যুতসভায় অপমানিতা দ্রৌপদীকে দেখে ধাবিত হয়েছিল— 'বিশাল কামনা, সীমাহীন দুঃখ— একসঙ্গে", আর তাই উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন অজান্তেই। যার

সঠিক মূল্যয়ান করেছেন প্রথম বৃদ্ধ দ্রৌপদীর সম্মুখে—

"হয়তো আপনার সেই আর্তির মুহূর্তে
যখন পান্ডবেরা ছিলেন পুত্তলির মতো নিস্পন্দ,
আর প্রাচীনেরা বাকশক্তি রহিত,
তখন কর্ণই প্রথম
ধিক্কার উন্মুখর হয়েছিলেন।"

কিন্তু মনোবিকার একান্ত নির্জনে দ্রৌপদীকে পেয়ে কর্ণের মনে ভর করেনি। তাই পান্ডবপত্নীর চাহিদায় ঝরে পড়ে কর্ণের আর্তি— "আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা্ করি/ আমি দেখি তোমাকে আরো একবার" এইটুকুই; তারপর আর "সময় দেয়না হৃদয়কে কথা বলতে"। এই কর্ণ পুরাণের কর্ণ নন, তাই শরীরকে অধিকার নয়, মনকে জয় করতে চান তিনি। আর স্বভাবতই দ্রৌপদীর 'বন্ধুতা' গ্রহণে রাজি নন কর্ণ, কারণ কর্ণ কেবলমাত্র দ্রৌপদীর বন্ধুতা চাননি। বহু বঞ্চনা, অবমাননা, অপমানে দগ্ধ হৃদয় কর্ণ আজ দৃঢ় অনমনীয়। তাঁর প্রতিজ্ঞা "আমি ভালোবাসার কাঙাল নই দ্রৌপদী"।

তবু কুন্তী ও দ্রোপদীর আগমন, যা এতদিনকার কর্ণের অস্তিত্ব, তাঁর অটল, দৃঢ়চেতা মনকে মূল থেকে নাড়া দিয়ে গেছে, তাতে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত কর্ণ কৃষ্ণের কাছে অকপটে স্বীকার করেন দুই নারী তাঁকে একমুহূর্তের জন্য হলেও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল সেই কল্পনায়—

"তখন মনে হয় আমিও পারতাম
হয়তো আমিও সুখী হতে পারতাম—"

কিন্তু আমরা জানি তিনি পারতেন না। পারতেননা কারণ তাঁর স্রষ্টাও পারেননি সেই সাধারনের জীবন যাপন করতে। নাকতলায় বসবাসকালীন একাকীত্ব নিঃসঙ্গ নির্জনতায় ডুবে সমকালীন বাংলা তথা সমগ্র ভারতের যুব অভ্যুত্থান নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব বসু আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন কর্ণের জীবনযন্ত্রণাকে। কন্যা রুমিকে 'রাত ভোর বৃষ্টি'র বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে চিঠিতে লিখছেন— "ঘটনাকে একেবারে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না— বাংলাদেশ পাগল হয়ে যাচ্ছে...।"[৬] নকশাল আন্দোলন নিয়ে অদ্ভুতভাবে নীরব কবি। তবু তাঁর প্রথম পার্থ অবিকল সেই যুবকদেরই প্রতিবিম্ব, যারা কোনোরকম আপোষ না করে নিজেদের এতদিনের অবহেলার বঞ্চনার অপমানের ইতিহাসকে বদলে দিতে চায় জীবনকে বাজি রেখে। যাঁদের উভয়েরই

উদ্দেশ্য ছিল সঠিক কিন্তু পন্থা ছিল ভ্রান্ত। হয়তো সতর্ক কবির অবচেতন মন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যুবা কর্ণের এই ব্যতিক্রমী কাহিনি।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী যখন কর্ণকে বলেন— "কোনো মানুষ বুঝি মারা যাবার জন্যই জন্মায়"[৭]। তাঁকে আমরা যেমন সমর্থন করি, তেমনি আমরা কর্ণের আত্মবলিদানের সার্থকতা পাই কর্ণকে উদ্দেশ্য করে বলা কৃষ্ণের শেষ কথায়ঃ

"তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে— চিরকাল—
এক ভাস্বর, মহান, পরাজিত বীর।"

'প্রথম পার্থে'র কর্ণের মূল্যবোধহীন সামাজিক দায় নেই। তিনি দায়বদ্ধ নন ন্যায়ের প্রতি, যে ন্যায়ের মাত্রা নির্ধারণ করে দেয় কৃষ্ণের মতো কুটিল রাজনীতিজ্ঞরা; তিনি দায়বদ্ধ নন মায়ের প্রতি, যে মা আজ নিতান্ত প্রয়োজনবোধে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন; তিনি লব্ধ নন সেই নারীর প্রতি, যে নারী নিজ স্বামীপক্ষের জয় নিশ্চিত করতে ধরা দিতে চান তাঁর কাছে; তাঁর ইপ্সিত নয় সেই জয়, যে জয় পরীক্ষার আগেই নির্ধারিত; কাঙ্ক্ষিত নয় ছলনার আশ্রয়ে ন্যায়ের জয়, তাঁর চেয়ে শ্রেয় পরাজিত অন্যায়কারী স্বশক্তির পক্ষ। তাই মহাকাব্যের মতো আবহমানকালের আধুনিকতায় বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ' প্রতিনিধিত্ব করে যাবে জর্জরিত, বিভ্রান্ত,দ্বিধান্বিত, আত্মপরীক্ষক, স্বপ্রতিষ্ঠাকামী জনমানসের হয়ে।

তথ্যসূত্র:

নাটকের উদ্ধৃতিগুলি বসু, বুদ্ধদেব, অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৯১ থেকে গৃহীত।

১. সম্পাদক দে, অপূর্ব , তপস্বী ও তরঙ্গিনী : পুরাণের নবভাষ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৫।

২. বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এস.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩,১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৭।

৩. ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, কৃষ্ণা, কুন্তী এবং কৌন্তেয়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৬৭।

৪. ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারতের প্রতিনায়ক ,আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৩৫।

৫. সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোল লেন, কলকাতা ৯, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৩৮।

৬ . সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, বিকল্প, ১ বিধান সরণি, তিনতলা, কলকাতা ৭০০০০৩,২০০৮, পৃষ্ঠা ৩২৫।

৭ . ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, কৃষ্ণা, কুন্তী এবং কৌন্তেয়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোল লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৮৬।

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

বৈপরীত্য ভাবনার দ্যুতির আলোকে আধুনিক বাংলা কবিতা

উপানন্দ ধবল

কবিতা আর যাই হোক তা অবশ্যই মানব চিন্তনের শিল্পিত বাণীরূপ। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) লিখেছেন— কাব্যে "কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা"[১] থাকবে। এই অভিজ্ঞতার নানা ডাইমেনশন আছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অভিজ্ঞতার রকমফের হয়। আবার অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয় বৈপরীত্যের পরিবেশে। যেমন বাস্তব উদাহরণে বলা যায়, লোহা বা স্টিলের আসবাবপত্র চড়া রোদে রাখলে তা গরম হয়, কিন্তু আচ্ছাদিত ঠাণ্ডা ঘরে সেগুলোই শীতল। অতএব, ঠান্ডা ও গরম এই দুই বিপরীতধর্মী অনুভূতির জন্য আমাদের দুই বিপরীত পরিবেশে যাতায়াত করতে হল। দর্শনে এই পদ্ধতিটির নাম অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি। জীবনানন্দ দাশ এই অনুভূতির বা বোধের কথাকে সুন্দর কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর 'ধুসর পাণ্ডুলিপি' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের 'বোধ' (প্রগতি, ১৩৩৬) নামক কবিতায়—

"আলো অন্ধকারে যাই
মাথার ভেতর স্বপ্ন নয়
কোন এক বোধ কাজ করে।"[২]

অতএব স্বপ্ন (অলীক ভাবনা) নয়, যথার্থ জ্ঞান বা বোধের জন্য কবিকে একবার আলো আর একবার অন্ধকারের বিপরীতমুখী অবস্থানে গতায়াত করতে হল। কবিতার এই 'বৈপরীত্য ভাবনা'কে কেউ বলেছেন 'কূটাভাস' আবার ইংরেজিতে একেই বলা হয়েছে 'প্যারাডক্স' (paradox)।

কবিতায় 'প্যারাডক্স' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবিরা পরোক্ষে কবিতার অন্তর্নিহিত নির্জলা সত্যটিকে পাঠকের সমক্ষে উন্মোচন করে দিয়ে প্রচলিত ধারণা থেকে মুক্তি দেয়। অর্থাৎ 'প্যারাডক্স' পাঠককে কবিতায় বাচ্য বা উক্ত contradiction-এর ঊর্ধ্বে যে সত্য সেখানে তাকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। যা আপাতবিরোধী বলে প্রতিভাত, তা যে বাস্তবিক সত্য— এই বিষয়টি কবিরা কূটাভাসের মাধ্যমে তাদের কাব্যে পরিবেশন করেন। কবিরা সাধারণত, বিরোধমূলক অর্থালংকার; যেমন—অসঙ্গতি, বিষম, বিরোধাভাস ছাড়াও সন্দেহ, অপহ্নুতি ইত্যাদি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার প্রয়োগের মাধ্যমে এই 'বৈপরীত্য ভাবনা'র প্রকাশ ঘটান। চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্যতে তো বটেই আধুনিক বাংলা কাব্যে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

আধুনিক কবিতার আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে (১৮৬১-১৯৪১) বাদ দিয়ে হয় না। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়— "রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম আধুনিক তো রবীন্দ্রনাথই।"[৩] আধুনিকতার ঠেলায় রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন করে তার কাব্যভাবনা ঢেলে সাজালেন। অধ্যাত্মবাদী-ভাববাদী কবি মেনে নিলেন কঠিন-কঠোর বাস্তবতাকে। 'শেষ লেখা' (ভাদ্র ১৩৪৮) কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় বিশ্বকবি লিখলেন—

"রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।"[৪]

এই যে, কঠিন আঘাতকে ভালোবাসার মধ্যে একটা প্যারাডক্স বা আপাতবিরোধী ভাবনা; এখানেই কবিতাটি কালোত্তীর্ণ। কবি যেন একদিনের রূপ-আভরণে মোড়া স্বপ্নঘেরা মধুর পৃথিবীতে ভাসমান ছিলেন। 'রূপ-নারান' তথা রূপময় জগৎ এবং আপামর অতি

সাধারণ মানুষের ব্যথা বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবির অনুভব ঘটল— 'এ জগৎ স্বপ্ন নয়'। শঙ্করাচার্যের দর্শনটি ছিল— 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সত্য, রূপধারী নারায়ণের মধ্যেই তার সম্যক প্রকাশ, আর জগৎও সত্য, কেননা তা সংবেদক। স্বপ্ন-মায়া-প্রপঞ্চ কখনো সত্যি হতে পারে না, কেননা, স্বপ্ন বঞ্চনা করে। অন্যদিকে সত্য নিষ্ঠুরভাবে জ্ঞান বা বেদনা জাগায়; সেখানেই চিত্তের আনন্দ। উপনিষদীয় সেই আনন্দবাদ— "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই সনাতন বিশ্বাসে স্থিতু হলেন রবীন্দ্রনাথ। 'অন্ধকারে মোহে লাজে' এতদিন মাটির কাছাকাছি সংগ্রামরত মানুষের দিকে তাকাবার অবসর পাননি কবি। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে প্রান্তিক মানুষের দিকে তাকিয়ে কবি তাদের সঙ্গে যেন নতুন করে একাত্মতা অনুভব করলেন। পার্থিব এই দীর্ঘ জীবনের আঘাত ক্ষতি মৃত্যু অপমানগুলো বাস্তব হয়ে কবির অন্তরকে আরো নিরেট সুন্দর করে তুলল। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রূপ থেকে অরূপের দিকে; দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে যাত্রায় মনকে স্থিতধী করে তুলল। আমরা দেখলাম, কবিপ্রতিভার এক অনিবার্য উত্তরণ।

ভালো কবিতায়, বা বড় কবিদের রচনায় এই বৈপরীত্যকে চরম শিল্পের পর্যায়ে উপনীত হতে দেখি। আপাত-বিরোধীভাবের সন্নিবেশের মাধ্যমে কবিতার মাধুর্য সৃষ্টিতে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) অতুলনীয়। তাঁর 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' (কবিতা পত্রিকা, মার্চ, ১৯৩৮) কবিতায় আপাত বিরোধী ভাবনার চরমোৎকর্ষ সংলক্ষ্য। কবিতার নায়ক আত্মহত্যা করেছে; লাশকাটা ঘরে তার ময়না তদন্ত হবে। কবি আপাতদৃষ্টিতে তার আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পাননি, অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আত্মহত্যা ছিল অবধারিত। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের কিছু অংশ তুলে ধরলেই বিষয়টির অন্দরমহলে সহজে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া যায়। কবির ভাষায়—

"বধু শুয়েছিলো পাশে— শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো— জ্যোৎস্নায়— তবু সে দেখিল
কোন ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল— লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার!
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর!"[৫]

দেখা যাচ্ছে, বধু-শিশু-প্রেম যাবতীয় আশা থাকা সত্ত্বেও সে জ্যোৎস্নায় (অন্ধকারে নয়) ভূত দেখল। কিন্তু কেন ? মৃত্যুর বিপরীতে এখানে সাধারণের কাম্য জীবনের যাবতীয় উপাদান— প্রেম-বধু-শিশু-আশা থাকা সত্ত্বেও সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল। এই বৈপরীত্যের মধ্যে সাযুজ্য (concord) খুঁজতে গেলেই কবিতাটির মূল রহস্যের উন্মোচন ঘটে। contrast যে কখনও কখনও চরম শ্লেষের দ্যোতনা এনে কবিতার অন্তর্গূঢ় রহস্যতে আলো ফেলে; তার আভাস কবি এখানে দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তির পক্ষে প্রেম-বধু-শিশু-আশা-ভরসার আপাত উপকরণ তো ছিলই, সাংসারিক অভাব দৈন্যও তার ছিল না—

"হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।"[৬]

লক্ষ্য করুন 'তাই'—এই সিদ্ধান্তবাচক অব্যয়টি এখানে কেমন শ্লেষের ব্যঞ্জনা নিয়ে এল। সাধারণ মানুষ জীবনের পূর্ণতার উপাদানগুলো চোখে দেখতে পেলে আরো বেশিদিন বাঁচতে উৎসাহিত হয়; কিন্তু এখানে দেখা গেল তার বৈপরীত্য। কবি এই মৃত্যুর কারণ দেখিয়েছেন 'বিপন্ন বিস্ময়' জনিত ক্লান্তি। প্রেম-শিশু-গৃহ-অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতার বৈপরীত্যে এক শক্তিশালী বিরোধী ভাবনা কাজ করেছে; সে হল— 'বিপন্ন বিস্ময়'। এর দরুন তার কাছে বেঁচে থাকার আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে। তাই সে অবসন্ন ক্লান্ত। তাই সেই ক্লান্তিহীন আশ্রয় স্থল— 'লাশকাটা ঘরে' সে 'চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে'।

কিন্তু এই আশাহীনতায়, বলা ভালো আত্মহত্যাকামী প্রবণতাতে কবিতার ইতি ঘটেনি; এরই বিপরীতে জীবনের আস্বাদকে কবি দেখিছেন পেঁচা, গলিত স্থবির ব্যাঙ প্রভৃতি মনুষ্যেতর বিপন্ন প্রজাতির জীবনমুখীতার আবেদনকে তুলে ধরে। আত্মহত্যাকারী আপাত সুখী ব্যক্তিটি গলায় দড়ি নিলেও থুত্থুরে অন্ধ পেঁচা (জীবনীশক্তি লুপ্তপ্রায়) চোখ পাল্টিয়ে বলেছে—

"বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার"।[৭]

প্রতিকূল পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার অপেক্ষায় আরেক অন্ত্যজ প্রাণী অথর্ব ব্যাঙ—

"গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে

আরেকটি প্রভাতের ইশারায়— অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।"[৮]

এই বৈপরীত্য ভাবনার আলোকে কবিতাটি প্রোজ্জ্বল।

কবিরা কাব্যে জীবনের অনুভব আঁকেন। সেই জীবন-বেদ পাঠ করে 'পাঠকের imagination তৃপ্তি পায়'। আর জীবন একমুখী ভাবনায় আচ্ছন্ন নয়। তার মধ্যে আছে ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু, আলো-অন্ধকার, সুখ-অসুখ, আনন্দ-ভয় প্রভৃতি বিপরীতমুখী ভাবনার সহাবস্থানমূলক দ্বন্দ্ব। এই বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও প্রকৃত জীবনানুধ্যান-কবিরা এই সংগতি-সমন্বয়ের কথাই বলতে চান নানা ভাব ও রসের পরিবেশনার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)-র 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থের 'সংগতি' কবিতার কথা মনে আসে। আমাদের বিপরীতমুখী ভাবনাগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন সম্ভব। জাগ্রত বিবেক এবং সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম সাধনার মাধ্যমে সমাজের বিপরীতমুখী ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মোকাবিলা সম্ভব। কবির ভাষায়—

"জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গী হারানোর পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
— মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।"[৯]

জীবন আর জীবন-মোহ এক নয়। জীবনে আছে বাস্তব-রস, আর 'জীবন-মোহ'তে অলীক কল্পনা। আবার ভাষা-হারা বুক নিয়ে বিদ্রোহ হয় না। অনুরূপে 'সঙ্গী হারানোর পাখি'র ডানায় 'নানা রঙ' আঁকা থাকাটাও যেন বেমানান। প্রাণহীন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকাটা ও চরম বৈপরীত্যের লক্ষণ। তবু আশাবাদী কবি আস্থা রাখেন এক অপূর্ব আস্তিক্য-বোধে; একটি ক্রিয়াপদের মাধ্যমে তার প্রকাশ— 'মেলাবেন'। সত্যিই তো যে পাখি সঙ্গী হারিয়েছে, তার জীবন তো থেমে গেল না, তার পাখায় নানা রঙ, সেই রঙ তো আশার প্রতীক, ভবিষ্য-বাঁচার প্রতীক। সেই রঙের আকর্ষণ থেকেই তো নতুন সঙ্গী জোটার সম্ভাবনা— এই

আস্তিক্যবোধ-বিশ্বাসেরই ভাষারূপ হল— 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন।'

'কাস্তে কবি' দিনেশ দাস-এর (১৯১৩-১৯৮৫) 'কাস্তে' (১৯৩৭) কবিতাটি প্যারাডক্সের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কবি যখন লেখেন— "এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে।"[১০] তখন শ্রেণি-সংগ্রামের হাতিয়ার বা শ্রেণিসংগ্রামকে রোমান্টিক কবি কল্পনার বা সাম্যবাদী সমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান বলে ধরে নিতে হয়। অর্থাৎ 'চাঁদ' এবং 'কাস্তে'—দুই বিপরীত বস্তুর মধ্যে পাওয়া গেল সুষম সমন্বয় (concord)।

বৈপরীত্য ভাবনার উৎকর্ষ থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) বলতে পারেন—

"ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত"।[১১]

লোকায়ত মতে বিশ্বাসী 'পদাতিক কবি' তাঁর 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থের আলোচ্য 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতায় বলতে চান— সাফল্যের ফুল ফোটানোর চেয়ে বড় আনন্দ জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকা। নিজেকে অসুন্দর ভেবে, বয়স পেরিয়ে গেছে ভেবে 'কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে'টি বিবাহের সমূহ সম্ভাবনাগুলোর মুখে যখন দরজা এঁটে পিঠ ফেরে; তখন প্রতিকূল পরিবেশে জীবনসংগ্রামে রত 'শান-বাঁধানো ফুটপাতে'র সেই 'কাঠখোট্টা গাছ' তার পাঁজরে 'সবুজ পাতার হাসি' ফুটিয়ে জীবনের জয় ঘোষণা করে। একটি জীবনবিমুখ পলাতকা মেয়ের ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সুযোগ থাকলেও তার লড়াকু মানসিকতার অভাবে সে সমূহ সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিল; অন্যদিকে তার প্রতিবেশী 'কাঠখোট্টা গাছ' বসন্তে ফুল আসেনি বলে আফসোস করল নআ। বরং আবার-যে নতুন কচি পাতা গজিয়েছে; সেই ভেবে আরো এক বর্ষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বাদকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল। 'কাঠখোট্টা গাছ'ও কালো কুৎসিত মেয়ে দুজনেই প্রতিকূলতার মধ্যে থাকলেও বিপরীতমুখী ভাবনার কারণে একজন জীবন থেকে পলায়ন করল, অন্যজদন জীবনের আস্বাদ-আনন্দ অনুভব করল। কবি দেখালেন বৈপরীত্য ভাবনার জাদু-ফুল না ফুটলেও বসন্ত হয়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-র (১৯২৪-২০১৮) 'অন্ধকার বারান্দা' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অমলকান্তি' কবিতাটি আাগাগোড়া প্যারাডক্সে মোড়া। এই কারণে বুদ্ধিমান পাঠক কবিতাটি বোঝার ক্ষেত্রে প্রায়শই ভুল করেন। যদিও কবিতা 'বুদ্ধি' দিয়ে নয়— 'বোধি দিয়ে' অনুভব করার বিষয়। এই কবিতার কাব্যসৌন্দর্য ধরে রেখেছে কয়েকটি কুটাভাসের অনবদ্য ব্যবহার। 'অমলকান্তি' কবিতায় কবি মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের

মানসিকতাকে; তাদের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে তাচ্ছিল্য করেছেন। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় পুষ্ট সমাজ-পরিবার সেই শিশুবেলা থেকে আমাদের মনে ইঞ্জেক্ট করে দেয় যে, পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার না পেলে; মাস্টার ডাক্তার উকিল হওয়া যায় না। আর ওইসব মধ্যবিত্ত-পেশায় নাম লেখাতে না পারলে জীবনটা ব্যর্থ। কবিতার পাঁচটি স্তবকের প্রথম চার স্তবক জুড়ে কিন্তু অমলকান্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাতে দেখি; সে অন্যদের মতো পড়াশোনায় মনোযোগী নয়। অন্য সহপাঠীদের মতো সে ওইসব লাভজনক-পেশায় নিযুক্ত হতেও চায়নি। সে চেয়েছিল 'রোদ্দুর' হতে। কবি পঞ্চম স্তবকে এসে লিখলেন—

"অথচ সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হল, এক অমলকান্তি ছাড়া।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।"[১২]

মধ্যবিত্ত মানসিকতার পাঠক যাঁরা, তাঁরা ভাবলেন, অমলাকন্তির ব্যর্থতার গল্প কবি আমাদের শোনালেন; অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, অমলকান্তি কবির বন্ধু; বন্ধুর ব্যর্থতার কথা লিখে একজন বন্ধু আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন— সে তো এক হীনম্মন্যতা। আর প্রকৃতই যে মাস্টার-ডাক্তার-উকিল হতে চায়নি; তার ব্যর্থতা অনুভবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অমলকান্তি কোথাও নিজের ব্যর্থতার কথা বলেনি। তার মুখে কবি একটিমাত্র কথা বসিয়েছেন— 'উঠি তাহলে।'[১৩] অমলকান্তি রোদ্দুরের সাধক। তার সাধনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—নিখিল প্রাণের চিরন্তন বাণী। 'রোদ্দুর' তথা আলোর সাধক অমলকান্তি আসলে একজন কবি, মুক্তিকামী যোদ্ধা, বিপ্লবী। সে চেয়েছিল মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিবর্তন হোক, তাই সে মাঝে মাঝে আসে কবিবন্ধুর কাছে। চা খায়, এটা-ওটা গল্প করে আর সেই ছলে বুঝে নেয় বন্ধুদের মানসিক গতিবিধি। বুঝে নেয়, মধ্যবিত্ত মানসিকতার বন্ধুদের কোন পরিবর্তন হয়নি; তারা সেই তিমিরেই আছে। এই হতাশা থেকেই সে কবিবন্ধুকে বলে, 'উঠি তা হলে'। তাহলে, এই কবিতার 'প্যারাডক্স' কোথায় ? ওই যে পঞ্চম স্তবকের প্রথম ছত্রে কবি বললেন— 'অথচ, সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হল, এক অমলকান্তি ছাড়া।'— এই বাচনভঙ্গি মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গেই খাপ খায়। 'সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হল'! কেমন ইচ্ছে ? না—

"যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল,
উকিল হলে তার এমন কিছু ক্ষতি হত না।"[১৪]

আসলে, মধ্যবিত্ত মানসিকতার কোন এম্বিশন হয় না। একটা লাভজনক-পেশায় নিযুক্তি তাদের কাছে শেষ কথা। তারা সামাজিক স্ট্যাটাস— গাড়ি-বাড়ি-ধন-পেশা-পোশাক নিয়ে মানুষকে বিচার করে। মানুষের আলোকের সাধনাকে; অক্ষরের সাধনাকে তারা হেয়

দৃষ্টিতে দেখে। তাই অমলকান্তির 'রোমান্টিক দৃষ্টি'কে ব্যঙ্গ করে তারা বলে— 'সেই লাজুক রোদ্দুর'; আর তখনই 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' হয়ে ওঠে। অতএব, কবিতার বৈপরীত্য ভাবনার আলোকে দেখা গেল; অমলকান্তি "সমস্ত অসফল আর কথাকথিত ব্যর্থ মানুষদের"[১৫] প্রতিনিধি নয়। এখন মনে প্রশ্ন হতে পারে, অমলকান্তির রোদ্দুর সাধনা যদি ব্যর্থ না হবে, তবে কবিবন্ধুদের "তাকে দেখে ভারী কষ্ট হত।"[১৬] কেন ? এর মধ্যেও রয়েছে সেই কূটাভাস। স্কুলে পড়া শিশুর মধ্যে আমরা আমাদের উপার্জিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার ঝাঁপি মাথায় তুলে দিই; বলি— যারা স্কুলে পড়া পারে না; পরীক্ষায় ভালো ফল করে না; তারা ডাক্তার-মাস্টার-উকিল হতেও পারে না— তাদের জীবনটা ব্যর্থ। তাই অমলকান্তি 'শব্দরূপ' মুখস্ত বলতে না পারলে ওই অল্প-বয়সি বালকদের 'দেখে ভারী কষ্ট হত'। বিষয়টা মর্মান্তিক রকমের হাস্যকর। জীবন-সাধনা এত ছোট নয় যে, তা স্কুলের পড়ার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকবে অথবা উপার্জনই সাফল্যের মানক হবে। বরং আলোকের; রোদ্দুরের মহান সাধনার সঙ্গেই তার সম্পর্ক।

অমলকান্তিকে হেরো ব্যর্থ ভাবার আরও জোরালো মধ্যবিত্তসুলভ point রয়েছে, সেটি হল— "সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।"[১৭] কিন্তু ছাপাখানার কর্মী মানেই ব্যর্থ জীবন নয়। জীবিকার সাথে মননচর্চা বা সাধনার সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। আর ছাপাখানায় যে কাজ করে সে তো আলোকেরই সাধক। কত সাবধানতার সঙ্গে সে তার কাজ করে; সেখানে সে নির্ভুল পুস্তক তৈরিতে ব্যাপৃত। ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীকে নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করার মধ্যেও যে নিরন্তর সফলতার সাধনা আছে তা অক্ষর-সাধক মাত্রই জানেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর (১৯৩৩-১৯৯৫) 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের একটি প্রেমের কবিতা 'বৃষ্টি নামলো যখন'। এই কবিতায় কবি মেঘ-বাদলা দিনে প্রিয়জনের জন্য মন কেমন করা উৎকণ্ঠা; প্রেমের জন্য বুভুক্ষা প্রকাশ করেছেন। কবিতার ২য় স্তবকটা এখানে পুরোপুরি তুলে দিলাম—

"বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা
দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমায় পাবো দেখা
হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে— অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে!"[১৮]

মেঘ-বাদলা দিনে বাইরে মেঘ; বাইরেই বৃষ্টি হবার কথা। কিন্তু কবি বললেন, 'অন্তরে মেঘ করে' আর তারই পরিণতি 'বুকের মধ্যে ভারী ব্যাপক বৃষ্টি' ঝরা। অসঙ্গতি অলংকারের কারুকার্যে কবিতাটির অর্থালঙ্কার-সৌন্দর্য ফুটে উঠলেও এর ভাবসৌন্দর্য তথা অন্তর-সম্পদ কিন্তু বৈপরীত্য ভাবনার দ্যুতিতেই স্পষ্টমান। মেঘ দেখলে 'সুখিহপি অন্যথাবৃত্তি চেতঃ'— কালিদাসের এই উক্তিকে শিরোধার্য করলে বোঝা যায়; বুকের ভেতর যে ব্যাপক বৃষ্টি সে আসলে প্রিয়জনের জন্য রক্তক্ষরণ; নীরব অশ্রুবর্ষণ।

আত্মজৈবনিক কবি কৃত্তিবাস-সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর (১৯৩৪-২০১২) কবিতায় প্যারাডক্স সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। তাঁর 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় তিনি লেখেন—

" . . .আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি— তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে। আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি।"[১৯]

কবিতাংশটির কাব্যসৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছে 'আমি', 'মানুষ' এবং 'কুকুর'-এর একক 'আমি'র ত্রিস্তরীয় ভেদের উলম্বরেখায়। আসলে 'আমি', 'মানুষ' এবং 'কুকুর' অথবা 'ছারপোকা' একক মানুষেরই বহুধাসত্তা। লেখক আপন বেঁচে থাকার সারাৎসার বর্ণনা করতে গিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীদের সাথে একাত্ম হয়ে নিজের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। মানুষের ভেতরের কুকরটাকে— সে নিজের হোক বা অন্যের; উপলব্ধি করতে হলে কুকুরের মতো অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে। কুকুর হতে পারে সৎ, প্রভুভক্তি বা বিশ্বাসের প্রতীক। কুকুর হতে পারে বেহায়া, নির্লজ্জ-লোলুপ; অন্তত লোকদৃষ্টির প্রেক্ষিতে এ কথা মান্য করতেই হয়। আত্মজৈবনিক কবিতা হলেও আশ্চর্যরকমভাবে কবিতাটিতে বহুস্বরের বিচ্ছুরণ এক অসামান্য প্রাপ্তি। আবার 'আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি' বলাতে নিজের মধ্যে plead guilty -কে কবি আশ্চর্য বাক্-প্রতিমায় উদ্ভাসিত করে দেন। একক কবির কণ্ঠে সুর মেলায় বহু পাঠকের স্বর। বেঁচে থাকার রোজনামচায় আমার প্রতিবেশী; আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমারই দ্বিতীয়-সত্তা ভেবে কেমন ক্ষমা করে দিতে পারি। আর এই-দৃষ্টিতেই মানুষ হয়ে ওঠে মহৎ। কুকুর, ছারপোকার সাথে তুলনাকে ছাপিয়ে মানুষের বেদনা ও সমানুভূতির প্রোজ্জ্বল রূপটি আলোচ্য কবিতাংশে উন্মুক্ত হয়।

জীবিত আধুনিক কবিদের মধ্যে আশির দশকের কবি জহর সেনমজুমদার (জন্ম— ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০)-এর কবিতা সবচেয়ে দার্শনিক এবং বৌদ্ধিক এবং সুররিয়াল। যদিও প্রকৃত কবিকে কখনোই দশকের কালসীমা দিয়ে চিহ্নিত করাটা ঠিক নয়, কেননা, একদৃষ্টিতে

কবি নিজেই মহাকালের দোসর। মহাকাল থেকে উদ্ভূত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শকে আপন চেতনাতে আত্তীকরণ করে মহাকালের স্বরূপকেই উন্মোচন করা কবির কাজ। কিন্তু কবি এই 'অপূর্বনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা' পান কোথা থেকে ? বুদ্ধিমান পাঠক এতক্ষণ বুঝে গেছেন; উপরের বাক্যগুলির মধ্যেই রয়েছে উত্তর। মহাকালের দোসর বলেই 'অপারে কাব্য সংসারে কবিরেক প্রজাপতি'। 'নরকোল ও বধিরতা' (১৯৯১) কাব্যগ্রন্থের 'কবির দেশে কবিতার দেশে' কবিতায় জহর সেনমজুমদার যখন লেখেন—

"রোগা মৃতদেহগুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকো
তাহলেই দেখতে পাবে, আমাদের এই দেহগুলির ভেতর থেকে
বার হয়ে আসছে অজস্র শালিক অজস্র চড়ুই
তারাই এই বাংলার আসল কবি, ঘুরে ঘুরে তৃপ্ত
ঘুরে ঘুরে অতৃপ্ত, একদিন তারা আমাদের নিয়ে
লিখে রেখে যাবে পৃথিবীর আসল কবিতা।"[২০]

আমাদের এই দেহগুলির ভেতর থেকে অজস্র শালিক চড়ুইরা কীভাবে বেরিয়ে আসে ? আবার তারাই-বা 'এই বাংলার আসল কবি' কীভাবে ? এই আপাত বিরুদ্ধবাচনের গভীরে একটি সত্যদর্শন আছে; লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে এককোষী জীব শ্যাওলা-অ্যামিবা থেকে বিবর্তনের পথ ধরে আজকের এই মানুষের পৃথিবীর জন্ম। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বৌদ্ধদের প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন। 'রোগা মৃতদেহগুলোর' ভেতর সুপ্ত ছিল আমাদেরই বাসনার সেই জগৎ। বাউলের সাধনায় 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি'র যাওয়া-আসা অর্থাৎ আত্মার কথা এখানে বলা হয়নি, এই বাসনাই জড়দেহ থেকে উৎপন্ন হয়ে অজস্র (একোহহং বহুষ্যামি) রূপমূর্তিতে ফুটে উঠতে চাইছে— রঙে রসে-ভাষ্যে কবিতাময় হয়ে উঠতে চাইছে। চাইছে— সঠিক তৃপ্তি হচ্ছে না; তাই, পৃথিবীর আসল কবিতা লেখা এখনো রয়ে গেছে বাকি। এই অতৃপ্তি; এই আকাঙ্ক্ষাই কবিতার আপাতবিরোধী ভাবনাটিকে প্রোজ্জ্বল করে কবিতাটিকে অনবদ্য করে তুলল।

তথ্যসূত্র:

১. জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, ৩য় মুদ্রণ, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৪২৩, পৃ.৭
২. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১০ম মুদ্রণ, ভারবি, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১০, পৃ. ১৮।
৩. বুদ্ধদেব বসু (সম্পা), ভূমিকা; আধুনিক বাংলা কবিতা, ৪র্থ সং, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৯।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, ১ম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ৯০৭-৯০৮।

৫. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, (প্রাগুক্ত) পৃ. ৬৯।

৬. (প্রাগুক্ত) পৃ. ৭১

৭. (প্রাগুক্ত) পৃ. ৭১

৮. (প্রাগুক্ত) পৃ. ৬৯

৯. অমিয় চক্রবর্তী, অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ষষ্ঠ সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৭।

১০. বুদ্ধদেব বসু (সম্পা), আধুনিক বাংলা কবিতা, ৪র্থ, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ২২২।

১১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দ্বাদশ সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৭।

১২. অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৬, পৃ. ১৭৩।

১৩. প্রাগুক্ত— ১৭৩

১৪. প্রাগুক্ত— ১৭৩

১৫. শ্যামলকান্তি দাশ (সম্পা), কবিসম্মেলন (পত্রিকা), পঞ্চদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৭ (নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় ভঙ্গি নিয়ে এক ছাত্রের দু'চার কথা' প্রবন্ধে সমালোচক অংশুমান কর লিখেছেন— "কবি আসলে পক্ষ নিয়েছেন অমলকান্তির মতো সমস্ত অসফল আর তথাকথিত ব্যর্থ মানুষদের।")

১৬. অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

১৮. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ৯ম কবিতা, ৯ম সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩১-৩২।

১৯. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ৩১তম সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০২০, পৃ.৪৩।

২০. অজিত ত্রিবেদী, আধুনিক কবিতা : নির্মিত বহুরূপ, ধ্রুপদী, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৩৪

রবীন্দ্র গল্পে নারীর স্বাধিকার চেতনা

ড . গোপাল পাল

আজ পৃথিবীর ভয়াবহতার চেয়েও বড় বেশি শোচনীয় পরিণাম ঘনিয়ে আসছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দোলাচলতায়, এছাড়া আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও অনুকূল নয়। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ অলিতে গলিতে দেখা দিচ্ছে, নামমাত্র সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা উড়তে দেখা যাচ্ছে যত্রতত্র, বরং কেউ মার্কসবাদী, লেলিনবাদ, মাওবাদ, মুর্মুবাদ-এর নাম ভাঙিয়ে সংসার চালায় আবার কেউবা গান্ধীদের নাম ভাঙিয়ে পেট চালাচ্ছে। আজ ভারতের সর্বত্রই যেন একটা ভড়ং চলছে। সেখানে লাঞ্ছিত, অপমানিতা অধিকাংশ নারী যে নারী প্রতিবাদ করতে পারে না, যারা আর্থিক, শারীরিক অক্ষম, তাঁরাই সর্বশ্রান্ত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে একমাত্র পথ দেখাতে পারে রবীন্দ্র সৃষ্টি। রবীন্দ্রসৃষ্টি বলতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, সংগীত, উপন্যাস, ছোটগল্প, চিঠিপত্র, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে তিনি আলোর পথে যাত্রা করতে শিখিয়েছিলেন।

> "আলোয় আলোকময় কর হে
> এলে আলোর আলো।
> আমার নয়ন হতে আঁধার
> মিলালো মিলালো।"[১]

প্রথম পর্ব : রবীন্দ্রগল্পে নারীর মূল্যায়ণের মাধ্যমে আলোর পথ খোঁজার চেষ্টা করব। এই পর্বে 'কালান্তর'-এর 'নারী' ও 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের নরনারী প্রবন্ধে নারী মুক্তির কথা খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমান সমাজে আজকেও বহু নারী পণপ্রথার জন্য নির্যাতিতা, অবহেলিত হচ্ছে, অনেককে আগুনে পুড়ে মরতে হচ্ছে, অনেকেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্ম অবমাননাকে এই সমাজের কাছে গোপন করার চেষ্টা করতে হচ্ছে। বহু নারীকে বিধর্মীকে বিয়ে করার জন্য বা ভালোবাসার জন্য আজকেও সমাজের কাছে সংসারের কাছে বঞ্চনা শুনতে হচ্ছে

আজ দেড়শ বছর পরেও নারীর অপমানের শেষ হয়নি।

দুই নারীতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ উর্বশী ও কল্যাণীরূপে পরিচয় দিয়েছেন, আবার সেখানে রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রেম দেখিয়েছেন যা বাংলা সাহিত্যে কেন বিশ্বসাহিত্যে ব্যতিক্রমী। তাঁর সৃষ্ট নারীর প্রেমের প্রকাশ তখন যেন অকপটে ব্যক্ত করে—

"যতবার পরাজয়
ততবার কহে, আমি ভালোবাসি যারে
সেকি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।"[২]

তাঁর কাব্যে নারীর প্রেমের শক্তি যেমন অসীম, সেই শক্তির প্রভাবে যন্ত্রণাকাতর প্রাণ নতুন ভাষা পায়।

রবীন্দ্র গল্পে নারীর বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়, কখনো প্রেয়সী, কখনো দেবী, কখনো মানসী, কখনও মোহিনী। নারীর আর এক রূপ হল— বিদ্রোহিনী রূপ। এই বিদ্রোহিনী সত্তা দেখা যায় 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনীর মধ্যে, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনীর মধ্যে, 'গোরা' উপন্যাসে ললিতা ও আনন্দময়ী-র মধ্যে ও 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর মধ্যেও ঐ রূপ লক্ষ্য করা যায়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনী বলেছিল যে, এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না। সে স্বামী মধুসূদনের ঘরে সন্তান জন্ম দেবার জন্য ফিরে এলেও আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধকে খোয়াতে চায়নি। এমনকি 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী যখন চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়েছে তখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে গণবিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এই নাটকে নন্দিনী 'নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার' চেয়েছে। নন্দিনী আত্মস্বার্থে প্রতিবাদ করেনি বরং তার কাছে বিশ্বস্বার্থই মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয় পর্ব : রবীন্দ্রগল্পে নারী তার আত্মসম্মান ফিরে পেতে চায়, বাঁচতে চায়, নিজেকে নিঃশেষ না করে কেবল সারাজীবন বলিদান দিতে চায়নি। স্বার্থপর না হয়ে কেবল জীবনের শেষ অবলম্বনকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গল্পের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন নারী চরিত্র আলোচিত হবে। যেমন— 'দেনাপাওনা গল্পে নিরূপমা' কঙ্কাল গল্পের সেই কঙ্কাল রমনী, 'জীবিত ও মৃত গল্পের বিধবা কাদম্বিনী, 'মহামায়া' গল্পের মহামায়া, 'শান্তি' গল্পের চন্দরা, 'হৈমন্তী' গল্পের কুসুম, 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা, 'অপরিচিতা' গল্পের অনিলা, 'স্ত্রী-র পত্র' গল্পের মৃণাল এরা সবাই আত্মমর্যাদা ফিরে পাবার জন্য কেউবা সরব প্রতিবাদ করেছে, কেউবা নীরব প্রতিবাদ করেছে। এই পর্বে রবীন্দ্র-গল্পে নারীর যথার্থ মূল্যায়ণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

নিম্নে তাঁর গল্পগুলির নতুন করে মূল্যায়ণ করা হল। 'হিতবাদী' পত্রিকায় ১৮৯১

সালের প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পটি সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের মানবাধিকার চেতনা বিশেষ করে নারীর আত্মমর্যাদা, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। রামসুন্দরের একমাত্র কন্যা নিরুপমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে। যেখানে দশ হাজার টাকা পণ ও বহু দানসামগ্রী চেয়েছিল— রামসুন্দর সম্পূর্ণ টাকা দিতে না পারার জন্য রায়বাহাদুর বিবাহসভায় বলেছে— ''টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।''[৩] কিন্তু রায়বাহাদুরের পুত্র সেসব জানে না তাই নিরুপমাকে বিয়ে করে নিয়ে নিজের চাকরিস্থলে চলে যায়। এরপর শ্বশুরঘরে নিরুপমার প্রতি অত্যাচার করা হয় মানসিক ও শারীরিকভাবে। নিরুপমা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিরুপমার নারী স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নেয়, এমনকি তার বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পর্যন্ত মেলে না। নিরুপমা অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করার কোন চেষ্টা দেখা যায়নি, নিজের নারী সম্মানের জন্য নিরুপমা একবার মাত্র প্রতিবাদ করেছে— ''আমি কি একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।''[৪] নিরুপমার এই যে সামান্য প্রতিবাদের ভাষা এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো। যে মেয়ে এতদিন অত্যাচার সহ্য করে আসছে সে কদিন নিজেকে সংযত করে রাখবে ? তাই নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষার খাতিরে প্রতিবাদে গর্জে উঠতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু সংসার তাকে তার প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়নি তাই সমাজের কাছে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করতে না পারলেও পরোক্ষভাবে নীরব প্রতিবাদ করেছে অনশনের মাধ্যমে। নিরুপমার অনশনের পরে মৃত্যু হওয়া এ যেন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারী অধিকারের জন্য নীরব প্রতিবাদ। লেখক প্রথমত পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন অন্যদিকে নারীর জীবনের অধিকার, নারীর বেঁচে থাকার অধিকার ও নারীর স্বাধীনতার অধিকারের কথাও ভেবেছেন। যদিও নিরুপমার সামাজিক নিরাপত্তা দিতে না পারলেও নারীর অধিকার লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি কটাক্ষ করেছেন গল্পের শেষ উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে। রায় বাহাদুর মহিষী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের দ্বিতীয় বিবাহে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন— ''এবার বিশ হাজার পণ এবং হাতে হাতে আদায়।''[৫]

সুকুমার সেন মহাশয় নিরুপমার প্রতি সমাজের নির্মমতা দেখে বলেন— ''আধুনিক কালের ভদ্র বাঙালীর ঘরের এই নির্মম হৃদয়হীনতার পরিচয়— সাহিত্যে এই প্রথম।''[৬] 'কঙ্কাল' গল্পটি হতে পারে অতিলৌকিক বা রোমান্টিক গল্প,তবু এই গল্পে খুঁজে পাই নারী অধিকারের পুর্ণ আবির্ভাব। আত্মহত্যা করা পাপ, আইনের চোখে অপরাধ, কঙ্কালের সেই ছাব্বিশ বছরের রমণী একদিন ভালোবাসা পাবার জন্য আত্মহত্যা করেছিল, কিন্তু আজ সে কঙ্কাল হলেও তার নারী জীবনের আকাঙ্ক্ষায় সে বাঁচতে চেয়েছে, সে বাক্-স্বাধীনতার অধিকার আশা করেছে— ''আর একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।''[৭]

''ইচ্ছা করে আমার সেই ষোলো বৎসরের জীবন্ত, যৌবন তাপে উত্তপ্ত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই . . . ।''[৮]

'জীবিত ও মৃত' গল্পেও নারীর যথার্থ মূল্যায়ণ করা হয়েছে। নারীর বাঁচার অধিকার রয়েছে, তার আত্মসম্মান ও মাতৃত্বের অধিকার রয়েছে। বিধবা কাদম্বিনীর ভাসুরপো ছাড়া আর অন্য কেউ ছিল না। জমিদার শারদাশংকরবাবু অর্থাৎ কাদম্বিনীর ভাসুর ঘরে থাকতে একদিন কাদম্বিনীর হঠাৎ স্ট্রোক হলে তাকে মৃত মনে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, যারা শ্মশানে নিয়ে আয় তারা বৃষ্টি ও অন্ধকারের ভয়ে ওখানেই সেই কাদম্বিনীর দেহটি ছেড়ে চলে আসে। হঠাৎ শ্বাস ফিরে এলে, কাদম্বিনী দেখে চারিদিক অন্ধকার। কাদম্বিনী পুনরায় জা-ভাসুরের কাছে ফিরে যেতে দ্বিধা সংকোচবোধ করল, সমাজ সংস্কারের ভয়ে— ''আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। . . .আমি যে আমার প্রেতাত্মা।''[৯] বিধবা কাদম্বিনী বারবার ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে নারীর স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকার, বাঁচার অধিকারকে জাহির করতে চেয়েছে। যেদিন কাদম্বিনীর সই তাকে প্রেতাত্মা ভাবলে সেদিনও বিধবা কাদম্বিনী কেবল জীবনের অধিকার চেয়েছে, ''ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।''[১০] ভাসুরপোর কাছে এলে সেই খোকা তাকে চিনতে পারে, সে বোঝে কাকিমা প্রেতাত্মা নয়, সে জীবিতা। কিন্তু, শারদাশংকরবাবুর বাড়ির কেউ যখন তা মানতে রাজি নয় তখন কাদম্বিনী— ''মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।''[১১] এ যেন নারীত্বের যথাযোগ্য সম্মান পাবার জন্য মৃত্যুবরণ।

'মহামায়া, গল্পটিতে নারীর মূল্যায়ণের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি মহামায়ার দগ্ধ মুখশ্রীতে লক্ষ্য করা যায়। মহামায়া রাজীবের সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিল, তার নারীজীবন সুখে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সমাজের চাপের মুখে অকুলীন ব্রাহ্মণ রাজীবকে প্রথমাবস্থায় মেনে নিতে না পারলেও একদিন, সমাজের কৌলিন্যপ্রথার অর্থহীন আভিজাত্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে বলেছে—

''রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।''[১২] কিন্তু তৎক্ষণাৎ মহামায়াকে এক মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ভবানী চাটুর্য্যে তার বোনের কুল রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কুল রক্ষা হলেও সংসার রক্ষা হল না, মহামায়া বিধবা হল বিয়ের পরদিন। মহামায়াকে সমমৃতায় বসানো হয়েছে। সৌভাগ্য যে প্রবল বৃষ্টিতে জলন্ত চিতা থেকে অর্দ্ধদগ্ধ হয়ে মহামায়া রাজীবের ঘরে চলে আসে, কিন্তু মহামায়া ও রাজীবের মধ্যে একটা ঘোমটার ব্যবধান রয়েছে— সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী। অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।[১৩] সেই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটা জীবন্ত আশা প্রতিদিন মহামায়াকে আঘাত করে, মহামায়া কুল বাঁচাতে চায়নি, নারীত্বের

বলে সে নিজে বাঁচতে চেয়েছিল, ভালোবাসা চেয়েছিল, জীবন চেয়েছিল। সে কি জানত সমাজ তাকে জ্বলন্ত চিতায় বেঁধে ফেলে দেবে ? সেই সমাজের বিরুদ্ধে তার ধিক্কার, তাই অর্দ্ধদগ্ধ মুখটাকে আজ একটা শাড়ীর ঘোমটায় ঢাকা জনসমাজের নগ্নতাকে ঢাকতে চেয়েছে, যেদিন সেই সমাজের নগ্নরূপ রাজীব দেখে ফেলে সেদিন আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি, সে রাজীবের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে সমাজের প্রতিভু রাজীবের কাছেও সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রেখে চলে গেল। নারীর যথার্থ মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে ভেবেছিলেন বলেই মহামায়া গল্পে রবীন্দ্র কৌলিন্য প্রথার খোক্‌লা চেহারার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাই সমালোচক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর বাংলা ছোটগল্প সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে বলেন যে, কৌলিন্য রক্ষার জন্য হিন্দুসমাজে অনেক সময় বৃদ্ধ বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়— এই প্রথাটিকে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নারীর মর্যাদা, নারীর সম্মান, তার বেঁচে থাকার অধিকার, তার প্রাপ্য পাবার অধিকার, নারীর স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হয়েছে। নিবারণের স্ত্রী হরসুন্দরী ভীষণভাবে অসুস্থ হলে হরসুন্দরী নিবারণের দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব দেয়, নিবারণের নিজের মনেও দ্বিতীয় বিবাহের ইচ্ছা ছিল তাই এক ছোটোখাটো কমবয়সী শৈলবালার সঙ্গে বিয়ে হল। কিছুদিন পরেই শৈলবালা গর্ভবতী হলো। অল্পবয়সে গর্ভবতী হওয়ার জন্য তার অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন অকালে নষ্ট হয়ে গেল। শৈল তো মরতে চায়নি, সে নিরাপত্তা চেয়েছিল, অধিকার চেয়েছিল, ভালোবাসা, বাঁচার আস্বাদ চেয়েছিল। কিন্তু শৈল তা পায়নি বরং অকালে এই বালিকার জীবনটুকু ঝরে পড়ল। লেখক নিবারণ ও হরসুন্দরীকে আদালতে সাজা না দিলেও তাদের জীবনে শৈলকে মধ্যবর্তিনীরূপে রেখে মানসিক শাস্তি দিয়েছেন।

'শাস্তি' গল্পে নারীর অধিকার ও তার মূল্যায়ণ প্রসঙ্গ এসেছে। দরিদ্র দুখিরাম ও ছিদামের ঘরে একটা পারিবারিক সমস্যা থেকে ব্যক্তি সমস্যা সৃষ্টি হয়। বর্ষার সময় জমিদারের গৃহে বেগার খেটে প্রায় খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। এই উত্তপ্ত অবস্থায় ক্ষুধার্ত দুখিরাম রাধার কাছ ভাত চায়, ঘরে ভাতের অভাব তাই রাধা বিরক্ত হয়ে বলেছিল— ''ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি।'' ''আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।''[১৪] শেষের মন্তব্যে দুখিরাম অসহ্য হয়ে কিছু না ভেবে স্ত্রীর মাথায় দায়ের কোপ মারে। মুহূর্তের মধ্যে রাধা জায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ে এবং মারা যায়। গ্রামের লোকে জানাজানি হয়ে গেলে, ছিদাম চক্রবর্তীকে মিথ্যা কাহিনী বলে ফেলে— ''ছোটো বউ বড় বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।''[১৫] সমস্ত গ্রামে এই মিথ্যেটাই প্রচার হয়ে যায়। ছিদাম তার স্ত্রীকে এই অপরাধ নিজের কাঁধে নিতে বললে চন্দরা বজ্রাহত হয়ে পড়ে। রামলোচন চন্দরাকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর এক পরামর্শ দেয়, যে

দুখিরাম তার স্ত্রীর হত্যাকারী, তখন ছিদাম বলেছে— ''ঠাকুর বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।''[১৬] ঘটনাটি যখন আদালতের এক্তিয়ারে চলে যায় চন্দরা স্বামীর প্রতি অভিমান ও নীরব প্রতিবাদের ফলস্বরূপ জজসাহেব সেই মিথ্যেটাকে সত্য বলে জাহির করে। চন্দরার শাস্তি হয় ফাঁসি, ফাঁসির পূর্বে তাকে আদালতে জিজ্ঞেস করে— ''তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব। চন্দরা কহিল— মরণ!''[১৭] নারীকে যথার্থ মর্যাদা না দেওয়ায় গর্জে উঠেছে চন্দরা, যদিও তার প্রতিবাদ নিরুপমার মতো নীরব। চন্দরা নীরবতার মধ্য দিয়েই সমাজ ও সংসারের বিরুদ্ধে আত্মমূল্যায়ণ খোঁজার চেষ্টা করেছে।

'হৈমন্তী' গল্প সবুজপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গল্প। এই গল্পে নারী তার আত্মঅপমানের জন্য নীরবেই প্রতিবাদ করেছে। হৈমন্তীর বয়স বেশি, সতেরো। অথচ পাত্রের পিতা বেশি পণ পাবার জন্য ছেলের বিয়ে দেবার জন্য তাকেই বেছে নেয়। ''...বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, ''মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পনের অঙ্কটাও বড়ো।''[১৮] এছাড়া পাত্রের পিতা কল্পনা করে নিয়েছিল যে কন্যার পিতার প্রচুর সম্পত্তি। সে সব সম্পত্তি তার ছেলেই ভোগ করবে। হৈমন্তীর বিয়ের সময় তার শ্বশুরের চাহিদা মতো সমস্তটাই হৈমন্তীর পিতা গৌরীশঙ্কর সুদসমেত ধার নিয়ে কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন যে কন্যা যেন সুখে স্বামীর ঘর করতে পারে, ভেবেছিলেন পণ দিয়ে মেয়ে মর্যাদা পাবে, সম্মান পাবে। তার বদলে, শ্বশুর, শ্বাশুড়ির নির্যাতন, নীচতা, সংকীর্ণতা তাকে আত্মহত্যার পথ নিতে বাধ্য করেছে। যেমনভাবে নিরুপমা নীরব প্রতিবাদ করেছিল অনশনে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে, হৈমন্তীর পিতা গৌরীশঙ্কর কন্যাকে নিয়ে যেতে এলে হৈমন্তীর শ্বশুর ঘরের লোক অসম্মতি প্রকাশ করে তখন হৈমন্তী অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে— ''বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আসব তবে আমি ঘরে কপাট দিব।''[১৯] এই শেষ শব্দটি 'ঘরে কপাট দিব'—এ যেন হৈমন্তীর তীব্র প্রতিবাদ, যারা নারী অধিকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। যদিও আইনের চোখে হৈমন্তী পূর্ণ নারীর অধিকার পায়নি, কিন্তু অধিকার সম্পর্কে তার স্বামী পূর্ণ সচেতন হলেও আংশিক সচেতনতাই তার প্রচেষ্টা জানা যায় ''স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। ...যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়া ছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম।''[২০] এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন হৈমন্তীর স্বামীকে কটাক্ষ করতে করতে সীতা বিসর্জনের জন্য অযোধ্যাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

হৈমন্তীর স্বামী তার স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি বলেই উপযুক্ত স্থানে প্রতিবাদ করতে পারেনি, যদি প্রতিবাদ করতো তাহলে হৈমন্তীকে আত্মহত্যা করতে হত না। ঠিক যেমন 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার স্বামী তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি ঠিক যেমন উচ্চশিক্ষিত নিরুপমার স্বামী পিতা-মাতা সমাজের লাঞ্ছনার নীরব সমর্থক হয়েছিল তেমই হৈমন্তীর স্বামী ও তার পরিবারের শোষণ ও লাঞ্ছনার নীরব সমর্থক। তবে এ কথা সত্য যে হৈমন্তীর স্বামীর মধ্যে একটা অপরাধ বোধ জন্মেছিল, আজকে সেই অপরাধবোধ থেকেই হয়তো প্রতিবাদের ভাষা তৈরি হবে।

'ত্যাগ' গল্পে মানবাধিকার রক্ষার একটা স্পষ্ট উদাহরণ কুসুম। অনাথা বালবিধবা সে জাতিতে শূদ্র কিন্তু বিবাহের পূর্বে মুখুজ্যের ছেলে হেমন্তের সঙ্গে প্রেমাসক্ত হয়েছিল তাই হেমন্ত কুসুমকে বিয়ে করে ফেলে। পরবর্তীকালে যখন হরিহর জানতে পারেন যে কুসুম শূদ্র, ব্রাহ্মণ নয়, জাত নষ্ট হবার ভয়ে হরিহর তার ছেলেকে বলে— ''মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও।''[২১] কিন্তু হেমন্ত কুসুমার নারী মর্যাদা, নারীর অধিকার, জাত ধর্মের পূর্ণ মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে বলে— ''আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।''[২২]

হেমন্ত তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেনি, বরং পিতার বিরুদ্ধে ও সেই কৌলিন্য সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই বলেছে— ''আমি জাত মানি না''।[২৩] সে যুগে এক নিরীহ নারীর প্রতি অত্যাচার ও জাতপাতের জন্য মানুষের ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে হেমন্ত। এমনকি 'হালদার গোষ্ঠীর' বনোয়ারীলালের মধ্যেও এমনই প্রতিবাদ শোনা যায়।

'পয়লা নম্বর' গল্পেও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অনিলা স্বামীর কাছে উপযুক্ত অধিকার, মর্যাদা পায়নি। এমনকি তার নারীত্বের মূল্য পর্যন্ত পায়নি বলেই স্বামীর ঘর ছেড়ে দিল। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই একটি চিঠিতে জানিয়েছে— ''আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না, করলেও খোঁজ পাবে না।''[২৪]

'পয়লা নম্বর' গল্পটি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রথম শ্রেণির গল্প। এই গল্পে নারী তার আত্মসম্মান পায়নি বলেই শেষে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। স্বামী নিজের স্বার্থেই ব্যস্ত, এমনকি শ্যালকের মৃত্যুর দিনেও নিজের চর্ব্য, চোষ্য খাওয়ার জন্যই ব্যস্ত। অনিল সে ব্যাপারেও নিজের দুঃখ প্রকাশ করেনি বরং স্বামীর আদেশ পালন করে গেছে। স্বামীর কাছে অনিলা নারীর মর্যাদার মূল্য পায়নি, অন্যদিকে প্রতিবেশী সীতাংশু অনিলার প্রতি নারী লোলুপ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হতে চেয়েছে, তাই অনিলা যোগ্য জবাব দিয়েছে, একটা চিঠি লিখে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। অনিলার চিঠিই পরবর্তীকালে হয়তো যথার্থ মূল্য পাবে।

'অপরিচিতা' গল্পে কন্যার নারী মর্যাদার অপমান হতে দেখেও পিতার স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেখে তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পিতা শম্ভুনাথবাবু বিবাহ সভায় ঘোষণা করতে বাধ্য হন ''আমার কন্যার গহনা চুরি করিব একথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।''[২৫] যখন পাত্রপক্ষ অপমান করার পর ক্ষমা চায় কন্যাপক্ষের কাছে তখন কল্যাণী তার নারী অধিকারের মর্যাদা রক্ষায় সরব হয়ে বলে— ''আমি বিবাহ করিব না।''[২৬] নারী মর্যাদা রক্ষার এমন সরব প্রতিবাদ রবীন্দ্র ছোটগল্পেই দেখা যায়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল আত্মাধিকার ও নারী মর্যাদা রক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় স্বামীকে ত্যাগ করে মুক্তির পথে যাত্রা করে বলেছে— ''আমি বাঁচলুম।''[২৭]

সমালোচক রানী চন্দ তাঁর 'আলাপচারি' গ্রন্থে বলেন যে, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, প্রথমে আমি মেয়েদের নিয়ে স্ত্রীর পত্র গল্প বলি। এই গল্পে মৃণাল তার যোগ্য মূল্য পাবার জন্য প্রতিবাদ করেছে, সমাজ ও পরিবারের বিরুদ্ধে। পুরুষশাসিত পরিবারে নারীর অনাদর, লাঞ্ছনা, অপমান ও অমর্যাদার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করেছে। মৃণাল স্পষ্ট জানিয়ে দেয় চিঠির মাধ্যমে, ''আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।''[২৮] দীর্ঘকাল থেকে পরিবারের অত্যাচার, গুরুত্বহীনতা, মূল্যহীনতা সহ্য করতে না পেরেই মৃণাল এমন সাহসের পথ বেছে নিয়েছে। তৎকালীন এবং একালীন এই পুরুষ শাসিত সমাজের কাছে চিরকালই নারীর মূল্য ব্যক্তির গুণে নয় বরং রূপের গুণে বিচার করা হয়। এই সমাজ কোনদিনই নারীর নিজস্বতা বোধকে ভালো ভাবে মেনে নিতে পারেনি, এমনকি একথা মৃণাল তার মাকে বলেন—

> '' ...মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্য বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়ে মানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চতলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। ...তোমরা আমাকে মেয়ে জ্যাঠা বলেই দু-বেলা গাল দিয়েছো। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা।''[২৯]

নারীকে যথার্থ মূল্য না দেওয়া এই সমাজের ধর্ম ছিল। এখনও অনেকটাই আছে, তাই মৃণাল যখন কেবল অনাদর পেয়েছে, অপমান সয়েছে, বাড়ির সকলের চোখে অবজ্ঞা দেখেছে, তখন দৃঢ় কণ্ঠে বলেছে—

> '' ...মেয়ে মানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়ায় ভালো, আদরে দুঃখের ব্যাপারটা বেড়ে ওঠে।''[৩০]

এই গল্পে আরেক নারী চরিত্র দেখা যায়, সে হল মৃণালের বড় জায়ের বোন বিন্দু, সে

শত অপমান, লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করে, এমনকি বিন্দুর নিজের ভাই, দিদি কেউ তাকে অসম্মান, অত্যাচার, লাঞ্ছনা করতে বাদ দেয়নি। দিদির কাছে ঠাঁই নিলে দিদি তাকে কাজের ঝি বানায়। মৃণাল নারীর অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে বিন্দুকে নিজের ঘরে...সসম্মানে নিয়ে আসে, তাতেও সে পরিবারের চোখের বিষ হয়ে পড়ে। পরিবারের আর সকলে বিন্দুকে তাড়াবার জন্য বারবার যে কোন অঘটনে বিন্দুর কথার প্রসঙ্গ নিয়ে আসে। তারা কোন প্রমাণ না দেখিয়ে কেবল বলে—

"আর কোনো প্রমাণ ছিল না, কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।"[৩১]

বিন্দুকে আশ্রয় দেবার জন্য মৃণালকেও গঞ্জনা শুনতে হয় পরিবারের কাছে। এমনকি তার স্বামী হাত খরচ বন্ধ করে দেয়। মৃণালের বড়ো জার পরিকল্পনাতে বিন্দুকে সকলে মিলে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, বিন্দু ওখানে টিকতে না পারলে পালিয়ে আসে। বড়ো জা জোরপূর্বক বিন্দুকে আবার সেই পাগল স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেয়—

"পাগল হোক ছাগল হোক স্বামী তো বটে"।[৩২]

বিন্দু এসব সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। মৃণাল তাঁকে বাঁচাতে পারেনি, তাই অভিমানে এই পরিবারকে ধিক্কার দিয়ে ত্যাগ করে ওই মাখন বড়ালের গলিটা ত্যাগ করে চলে গেছে। সমালোচক শ্রীশ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"লাঞ্ছিত অপমানিত নারীর সে বিদ্রোহ বাণী আজ প্রতি মাসিক পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই জ্বালাময়ী বাণীকে তীব্র বিদ্রুপাত্মক ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন।"[৩০]

তৃতীয় পর্ব : ঠিক তেমনি চিত্রাঙ্গদা নাটকে চিত্রাঙ্গদার মধ্যে নারীর আরেক রূপের পরিচয় মেলে তার মধ্যে খুঁজে পাই সোহিনীর ঊর্বশী রূপ ও নন্দিনীর কল্যাণী রূপ। তাই চিত্রাঙ্গদা স্নেহবলে তিনি মাতা কিন্তু অর্জুনকে সদর্পে বলেছেন—

"নাহি দেবী নহি সামান্যা নারী
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে, সে নহি নহি।
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি, নহি।
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সঙ্কটে সম্পদে।
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"[৩৪]

এভাবে রবীন্দ্রনাথ নারীর যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। তার কাছে নারী দেবীও নয়,

দাসীও নয়, সে যথার্থ মর্যাদা চেয়েছে, কেবল বিপদের দিনে পাশে থাকতে চেয়েছে, পুরুষের হাতে হাত মিলিয়ে সহকর্মী, সহধর্মী, সহমর্মী হতে চেয়েছে। তাঁর সৃষ্ট নারী কোনো উপরি পাওনা পাবার আসা করেনি, জীবনের নির্দিষ্ট মূল্য দিয়েই বাঁচতে চেয়েছে।

চতুর্থ পর্ব : আজকের এই সমাজের মূল্যায়নের গুরুত্ব হিসাবে বলা যায়— নারীর যথার্থ মূল্য দিতে হলে পুরুষকে বাদ দেওয়া নয়, রবীন্দ্রনাথও পুরুষ বিদ্বেষের কথা বলেননি। পুরুষের সাথে সাথে নারীর চলার পথ হবে সমতালে নারী, পুরুষের পাশাপাশি এগোবে। একে অপরের কো-অপারেশনের মধ্য দিয়েই নারীর যথার্থ মূল্য পাবে। মেয়ে মানুষকে মেয়েমানুষ হিসাবে বাছবিচার করা চলবে না, তারাও মানবী, তাদেরও তো রক্তমাংসের প্রাণ আছে, তারাও জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হবে। ঠিক তেমনি নারীকে তার যথার্থ মূল্য দিতে হলে তার যোগ্য স্থান দিতে হবে, যোগ্য সম্মানের আসনে বসাতে হবে, তাকেও পাশে রেখেই জীবনের পথে যাত্রা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলা যায় যে—

''পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি।
মৃত্যুর মুখে দাঁড়াবে জানি তুমি আছ, আমি আছি।''

সমাজের যেখানেই বঞ্চনা, শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন দেখা যায়, যেখানে নারীর অমর্যাদা করা হয়, অসম্মান, অশ্লীলতার অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়, অথবা যেখানে জীবনের মূল্য দেওয়া হয় না, দাসত্বকে মেনে নিতে হয় সেখানেই মূল্যায়নের যে প্রশ্ন জাগে সেটা নারীত্বের অধিকার। এখানে নারীর জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব কেউ অস্বীকার করেন না, তবে কোনো স্রষ্টা নারীর মর্যাদা ও সম্মান দেবার জন্য সোচ্চার প্রতিবাদ করেন, কেউ বা নীরব ভাষায় যোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেন। একথা চিরন্তন সত্য যে কোন সৎ সাহিত্য নারী ও পুরুষের জীবনের সমস্ত কিছু অধিকার, স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসা, চাওয়া-পাওয়ার বহিঃপ্রকাশ। যাইহোক সময় ও শব্দের নির্দিষ্ট বাঁধনের জন্য আজ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হল না, আলোচনাটি যেন ছোটগল্পের সমাপ্তির মতো রয়ে গেল।

তথ্যসূত্র :

১. 'গীতাঞ্জলি' : ৪৫ সংখ্যক কবিতা, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬, ফাল্গুন ১৩৩৪, পুনঃমুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭) প্রকাশক, কুমকুম ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৬।

২. 'সোনার তরী' : যেতে নাহি দিব, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করণ, আশ্বিন।
৩. 'দেনাপাওনা' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রকাশক, শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ। পৃ. ১১।
৪. তদেব : পৃ. ১৪।
৫. তদেব : পৃ. ১৫।
৬. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' : চতুর্থ খণ্ড, সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৬২।
৭. 'কঙ্কাল' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রকাশক, শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ। পৃ. ৫৫।
৮. তদেব : পৃ. ৫৬।
৯. 'জীবিত ও মৃত' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রকাশক, শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ। পৃ. ৮৫।
১০. তদেব : পৃ. ৮৯।
১১. তদেব : পৃ. ৯১।
১২. 'মহামায়া' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রকাশক, শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ। পৃ. ১৫৫।
১৩. তদেব : পৃ. ১২৮।
১৪. 'শাস্তি' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রকাশক, শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ। পৃ. ১২৮।
১৫. তদেব : পৃ. ১৫৬।
১৬. তদেব : পৃ. ১৫৬।
১৭. তদেব : পৃ. ১৬১।
১৮. 'হৈমন্তী' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ৩য় খণ্ড, প্রথম করুণা সংস্করণ, অক্টোবর ২০০২, প্রকাশক, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৪৭২।
১৯. তদেব : পৃ. ৪৮০।
২০. তদেব : পৃ. ৪৭৯।
২১. 'ত্যাগ' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রকাশক, শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ। পৃ. ৭১।
২২. তদেব : পৃ. ৭১।
২৩. তদেব : পৃ. ৭১।

২৪. 'পয়লা নম্বর' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ৩য় খণ্ড, প্রথম করুণা সংস্করণ, অক্টোবর ২০০২, প্রকাশক, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৫৪০।

২৫. 'অপরিচিতা' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ৩য় খণ্ড, প্রথম করুণা সংস্করণ, অক্টোবর ২০০২, প্রকাশক, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৫১৯।

২৬. তদেব : পৃ. ৫২৪।

২৭. 'স্ত্রীর পত্র' : শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ ৩য় খণ্ড, প্রথম করুণা সংস্করণ, অক্টোবর ২০০২, প্রকাশক, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৪৯৬।

২৮. তদেব : পৃ. ৪৯৫।

২৯. তদেব : পৃ.৪৮৮।

৩০. তদেব : পৃ. ৪৮৯।

৩১. তদেব : পৃ. ৪৯১।

৩২. তদেব : পৃ. ৪৯৪।

৩৩. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' : শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৪, পুনঃমুদ্রণ ১৯৯৬, প্রকাশক শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, মডার্ন বুক এন্ড প্রা. লি., পৃ. ২০৮, ২০৯।

৩৪. 'চিত্রাঙ্গদা চিত্রনাট্য' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্র নাটক সমগ্র, ২য় খণ্ড), কামিনী প্রকাশালায়, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৩, প্রকাশক শ্যামাপ্রসাদ সরকার, পৃ. ৬৩৮।

সমাজ বাস্তবতার আলোকে শক্তিপদ রাজগুরুর ছয় উপন্যাস

ড. সুমন্ত মন্ডল

সারসংক্ষেপ : মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকে নানা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ সন্ধান করে চলেছেন, জীবনের সমগ্র রূপকে। সচেতনভাবেই হোক আর অচেতন ভাবেই হোক, মানুষ নিজের সৃষ্টির মধ্যে সর্বদায় নিজের একটি সমগ্র উপলব্ধি করতে চায়। এই চাওয়া থেকেই উপন্যাসের উদ্ভব। আর উপন্যাস হলো সামাজিক জীবন নির্ভর। তাই উপন্যাসে লেখক সমাজের ও সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকাশ করেন। এই সামাজিক সময় নির্ভর বৈশিষ্ট্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসা বা সমাজ বাস্তবতা। শক্তিপদ রাজগুরুর বিভিন্ন উপন্যাসে যে সমাজ বাস্তবতা উঠে এসেছে তা নিয়েই আলোচনা করব।

সূচক শব্দ : নরনারী, দাম্পত্য সংকট, সমাজ বিবর্তন, পরকীয়া, মধ্যবিত্ত মানসিকতা, নিম্নবিত্ত জীবন সমস্যা।

মূল আলোচনা

সমাজ বাস্তবতার সংজ্ঞার উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই তার প্রতিফলন দেখা যায় বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে। বাংলাতে সমাজবাস্তবতার পরিচয় পায় প্রাকৃত ভাষায় বৌদ্ধ জাতকে, বাংলা ভাষার আদি যুগে, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে, বলা যায় সর্বত্রই এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমাজ বাস্তবতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হল— ক) সমকালীন জীবনের প্রকাশিতব্য প্রামাণ্য তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ, খ) চরিত্র এবং ঘটনার তন্ময় চিত্রণ, গ) মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবন সমস্যা। এছাড়া মনুষ্যত্বের এবং কার্যকারণ সঙ্গতির নিপুণ বিশ্লেষণ, ঘ)

বাস্তববাদী সাহিত্যের ভাষা অলংকারহীন, ঙ) সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখে তাদের কথ্য ভাষার ব্যবহার, চ) যেখানে দরকার সেখানে অনুপুঙ্খ তার তথ্যনিষ্ঠ প্রয়োগ ইত্যাদি।

শক্তিপদ রাজগুরু মহাশয়ের জন্ম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, বাঁকুড়া জেলার গোপবন্দী গ্রামে। মূলত তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন এবং ১০০টিরও বেশি উপন্যাস লেখেন। তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম হল— নয়া বসত (অমানুষ), যদি জানতেম, মেঘে ঢাকা তারা, রং নিয়ে খেলা, স্বর্ণমৃগ, কেউ ফেরে নাই, মাটির কাছাকাঠি, রূপবদল, দেশকালপাত্র, শালপিয়ালের বন, অভয়ারণ্য, সপ্তম গোস্বামী, রূপান্তর, বাসাংসি জীর্ণানী, অনুরাগ, তবু বিহঙ্গ, দিন অবসান, অধিকার ইত্যাদি।

শক্তিপদ রাজগুরুর যে উপন্যাসগুলি আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছি তা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস। আর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার যে দিকগুলির প্রকাশ ঘটেছে তার বিশেষ কতগুলি প্রবণতা রয়েছে। সেগুলি হল—

ক) স্বাধীনতা পাওয়ার পরে মানুষ আশা করেছিল তাদের জীবনের সমস্যা অনেক কমে যাবে। কিন্তু তা না হয়ে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা বেড়ে গেল। ফলে এই সমস্যার দিকগুলি উপন্যাসে উঠে আসলো।

খ) দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার নগ্ন রূপ প্রকাশ পেল। আত্ম বিচ্ছিন্ন মানুষগুলি বাংলা উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠলো।

গ) দাম্পত্য সঙ্কটের নানারূপ প্রত্যক্ষ হলো এবং প্রেমের অন্য চেহারা দেখা দিল।

ঘ) নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও গ্রামীণ জনজাতি ও উপজাতিদের সম্পর্কে লেখকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। অচেনা-অজানা মানুষ ও তাদের জীবনধারা উপন্যাসে স্থান করে নিল।

ঙ) ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, কৃষকদের অধিকার ঘোষণা, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বাংলা উপন্যাসকে অনুপ্রাণিত করল।

চ) নয়ের দশকের বিশ্বায়নের পটভূমিতে চিন্তাজগতে যে আলোড়ন এলো তা মূলত পারিবারিক-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এলো। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির কুফল সম্পর্কিত বক্তব্যগুলিও উঠে এলো উপন্যাসের পাতায়।

ছ) নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ খোলামেলা চিন্তাভাবনার প্রকাশ হল। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীর চিন্তাজগতে যে বিদ্রোহ জেগে ছিল তারই প্রকাশ পরিবারে ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে দেখা দিল।

এবার আমরা শক্তিপদ রাজগুরুর কয়েকটি উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার পরিচয় খুঁজবো। চল্লিশের দশক ছিল বাংলার সমাজ জীবনে অত্যন্ত আলোড়নকারী সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সমগ্র দেশকে আলোড়িত করেছিল। এই ঘটনাগুলির প্রভাবে সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। এদের সামনে চেতনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের গুরুদায়িত্ব লেখকরা গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করেছিল, সে স্বাধীনতা তো এলোই না, উপরন্তু স্বাধীনতার বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে স্বাধীনতার স্নিগ্ধ মোহভঙ্গ হয়ে কঠিন-কঠোর বাস্তবের সামনে এনে দাঁড় করালো। দারিদ্র্য বেকারি জীবনের আরও নানান সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন মাত্রা পেয়ে গেল। এই মধ্যবিত্ত মন কে কেন্দ্র করে শক্তিপদ রাজগুরু চিত্রিত করেছেন অনেক উপন্যাসে যথেষ্ট যত্ন সহকারে।

ক) স্বাধীনতা-উত্তর সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের মূলিভূত বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। যেমন— তার বিখ্যাত উপন্যাস 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসটিতে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নেতাজি কলোনির বস্তি অঞ্চলের মানুষের জীবন, অভাব-অনটন, মানবিকতা, অমানবিকতা, সবকিছুই এই উপন্যাসের চরিত্র গুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—

> "কাদম্বিনী নিজেও বুঝতে পারে নিজের পরিবর্তনটা। ক্রমশ বদলাচ্ছে সে। পীরগঞ্জের সেই লক্ষ্মীশ্রী হারিয়ে— আজ একটা ধ্বংস স্তূপের মত বসে আছে, অতীতের স্মৃতি শ্মশানে। নইলে একদিন কিছু হয়ত খরচ করে এসেছে নীতা ভাই-বোনদের জন্য। এমনিভাবে তাকে কথা না শোনালেও পারতো।"[১]

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ব্যক্তির নিজস্ব ভুবনের মধ্যে তার তৃপ্তি ও অতৃপ্তি। নিজের অন্বেষণকে ঘিরে তার যে অভিজ্ঞতার জগত রচিত হয় তা যথেষ্ট পরিমাণে এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। যেমন—

> "নীতার মনে দৃঢ়তার ছায়া, সামান্য পাওয়াতে সে তৃপ্ত নয়। জীবনের সব কঠিন বাধা উত্তীর্ণ হয়ে সে মহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখে। সাধনা করে, বলে

ওঠে— কিছু টাকা স্টাইপেন্ড পাবে, বাকি যদি আমি চাকরি নিই তার থেকে যা হোক করে হোক ম্যানেজ করা যাবে।"[২]

সমাজ ব্যবস্থার চাপে প্রচলিত সম্পর্কগুলি তুই নষ্ট হয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে তাও লেখক উন্মোচিত করেছেন—

"কাদম্বিনী বলে ওঠে নিতার সঙ্গেই ঠিক করেছিলাম দিদি। কত সাধ্যসাধনা করলাম মেয়েকে, তা ওই মেয়ের ধনুক ভাঙ্গা পণ, এম. এ. পাশ না করে বিয়ে করবে না। কি করি এদিকে এমন ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাবে তাই গীতার সঙ্গেই ঠিক করলাম বাধ্য হয়ে। নীতা ঘরে বসে পড়ছিল, মায়ের কথাগুলো কানে আসে। সারা শরীরে জ্বালা ধরায়— মনে হয় এক্ষুণি চিৎকার করে ওর স্বরূপ জানিয়ে দেয় সকলকে। সব মিথ্যা বলছে ওই মেয়েটি যাকে নীতা ঠিক চেনে না।"[৩]

এই উপন্যাসটিতে ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণার ছবিও স্পষ্ট। কর্মক্ষেত্রে পরিবারে সর্বত্রই মানুষের যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে মানুষ একসময় রিক্ত হয়ে যায়। এই বক্তব্যই লেখক তুলে ধরেছেন। যথা—

"চাকরি ছেড়ে দিয়ে কি করবে শুনি। ছাড়ি নি এখনো, তবে ছাড়তে পারলেই ভালো হতো। সে কম্ম করে এলেই পারতে। ঝাঁঝ ফুটে ওঠে গীতার কথা সুরে; জিভে যতটুকু গরল ছড়ানো সম্ভব, ছিটিয়ে বলে ওঠে— আবার মন্ত্রণাদাতা জুটেছে বোধ হয় ?[৪]

বিচ্ছিন্নতাবাদের কথাও উঠে এসেছে 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসটিতে। একই ছাদের তলায় থেকেও মানুষ কতটা বিচ্ছিন্ন হতে পারে তা চিত্রিত হয়েছে এই রচনায়—

"চোখের সামনে গীতা দেখতে পায় এ বাড়িতে তার ঠাঁই কতখানি— তার তুলনায় নীতা আজও সনতের নিকটতমা।"[৫]

লেখক এই উপন্যাসটিতে সেকালের মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, আদর্শবাদী সৃষ্টির বদলে বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ, চিরাচরিত কক্ষপথ ছেড়ে ছোট-বড় ভাঙাচোরার মধ্য দিয়ে নিজের পথ খোঁজা ইত্যাদি গভীর রেখায় এঁকেছেন।

খ) স্বাধীনতা পরবর্তী জীবনে মানুষের সংকটের সঙ্গী ছিল— উদ্বাস্তুসমস্যা। উদ্বাস্তুজীবনের করুণ ঘটনা ও তার ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন 'দেশ-কাল-পাত্র' উপন্যাসটিতে। এই উপন্যাসটিতে লেখক বর্ণনা করেছেন—

> "দুই সীমান্তে দুই দেশের জাগ্রত সীমান্ত প্রহরীর দল মারণাস্ত্র হাতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে দুই দেশের সীমারেখার মাঝখানে। এই বাঁশ বন— 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'। কারো দখলদারি এখানে নেই। হতভাগ্য, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মানুষগুলোর মন থেকে বাঁচার শেষ আলোটুকু হারিয়ে গেছে। সামনে তাদের নিশ্চিত উপবাস। নাম-দেশ-পরিচয়হীন হয়ে তারা মৃত্যুর জগতে হারিয়ে যাবে।"[৬]

গ) আধুনিক মানুষের জীবনকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত করেছে সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি। সাংস্কৃতিক পালাবদলে আধুনিক মানুষের জীবনের ছকটাই গেছে বদলে। এই সময়ের প্রক্ষেপ পড়েছে আধুনিকের শরীরে এবং মনে। অবাধ যৌনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও পরকীয়া জীবনের কোমল অনুভূতিগুলোকে হত্যা করেছে। ফলে অবৈধ প্রেম ও দাম্পত্য সমস্যা তীব্র ভাবে ফুটে উঠেছে। পরকীয়ার প্রকাশ দেখি 'অভয়ারণ্য' ও 'বাসাংসি জীর্ণানি' উপন্যাস দুটিতে। 'অভয়ারণ্য'-তে দেখা যায় কমলা ও নেহাল সিংহের অবৈধ প্রেম ও দাম্পত্য সমস্যা। আমরা জানি যে দাম্পত্যের অর্থ হল— শুধুই ভোগ নয়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও সম্পর্ককে এক বোধের জগতে নিয়ে যাওয়া। এসবের ধার ধারেনি নেহাল সিং। ফলে কমলার মনে বিতৃষ্ণাতে ভরে ওঠে—

> "কমলা বিরক্ত হয়, লোকটার প্রাণহীন যান্ত্রিক কামনার নিষ্প্রাণ তীব্রতায়। ওর হাত খানা সরিয়ে দিতে চায়। লোকটা তবু তাকে কাছে টেনে নেয়। ওর হাতের বাঁধন হিমশীতল সাপের ছোঁয়ার মতো বোধ হয় কমলার। নেহাল সিংহের মনে বারবার সেই দেহটার মাদকতা ছাপিয়ে উঠে। কমলা নয়, সেই দেবীরই দেহের অনাস্বাদিত স্বাদ যেন কল্পনায় পেতে চাই সে।"[৭]

আবার 'বাসাংসি জীর্ণানি'তে দেখতে পায় পরকীয়ার কথা। যেমন—

> "ঘরে পা দিয়েই চমকে ওঠে প্রশান্ত। ওই তার সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু- আর ওই তার স্ত্রী। যার কাছে আশা করেছিল সে সান্ত্বনার। দুজনের মনের গোপন পাপের কালোছায়া, ঘরের আলোটুকু গ্রাস করেছে।...প্রশান্ত বুঝেছে আজ প্রীতির সঙ্গে তার সম্পর্কের গভীরতা টাকার জন্য এসেছিল। এতদিন তার টাকা ছিল তাই সম্পর্কটাও ছিল তার সঙ্গে।"[৮]

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, গ্রাম সমাজের পরিবর্তন, কৃষক

জীবনের মধ্যে, ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠা, নতুন সামাজিক সম্পর্ক এই সমস্ত কিছুই উপন্যাসে উঠে আসলো। যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেল 'বাসাংসি জীর্ণানি' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে—

> "এতকাল তেমনিই চলে এসেছিল। এবার হঠাৎ যেন কেমন একটা সাড়া জাগে। পানু দাস দাঁড়াচ্ছে, তারই কয়েকজন চর ও অনুচর ঘুরছে। ওদিকে কামারপাড়া থেকে যারা মাথা তুলেছে, তারাও দাঁড়াবে। আশেপাশের গ্রামে তন্তুবায় সমিতি, কৃষক সমিতি, আরো অনেক সাধারণ মানুষ এবার মাথা তুলেছে।"[৯]

কৃষক জীবনের মধ্যে ভূমি সংস্কারের ছবি পায় এই উপন্যাসে—

> "সারা দেশে চালু হচ্ছে নতুন কায়েমি ব্যবস্থা। জমির মালিক আর সরকার দুজনেই বহাল থাকবে। মধ্যে জমিদার-মধ্যস্বত্বাধিকারী— দরপত্তনিদার কেউ মুনাফালোভী থাকবে না।...দেখেছে নতুন ব্যবস্থায় অনেক বাড়তি জমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ওরা, সেই জমি এসে পড়েছে ওদের হাতে, ভূমিহীন একটি শ্রেণির হাতে।"[১০]

ঘ) গ্রামীণ জনজাতি ও উপজাতিদের নিয়ে লেখা উপন্যাস হলো 'শালপিয়ালের বন' ও 'কেহ ফেলে নাই।'

ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনা, বরাকর, সিংভূম এবং মানভূম জুড়ে বাস করে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাং প্রভৃতি কয়েক শ্রেণির আদিবাসী। তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথা উঠে এসেছে এই উপন্যাসটিতে। এছাড়া কয়লাখনির অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ সঞ্চারি মৃত্যুর আতঙ্ক,জীবন-যাত্রার দুঃস্বপ্ন, রোমাঞ্চিত বর্ণনা পায় 'শাল পিয়ালের বন' উপন্যাসটিতে।

> "কেরোসিনের কুপির আলোয় এগিয়ে চলে সুড়ঙ্গ বেয়ে। গুর গুর শব্দে মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে পাতালপুরীর অন্ধি সন্ধি। কয়লা কাটায় হচ্ছে, গান পাউডার চার্জ করে। জমাট কয়লার চাপ ফাটিয়ে দিয়ে ওরা কয়লা তুলছে।"[১১]

অথবা—

> "ফুকন বিস্মিত না হয়ে পারে না এই ক'দিনের দেখা দুনিয়াকে যা চিনেছে, সে তাতে মন বিষিয়ে গিয়েছিল তার। চারিদিকে পঙ্কিল পরিবেশ, এই

> বেশ্যাগিরি মাঝে ও সে টের পেয়েছে তার অপমৃত্যুর। কিন্তু নাগপাশ হতে মুক্তির পথ নাই। তাই ব্যাকুল অনুনয় তার ফুকনের অন্তর স্পর্শ করে। তার দেওয়া অন্ন গ্রহণ করতে আর বাঁধে না।"[১২]

আবার 'কেহ ফেরে নাই' উপন্যাসে ও একই ভাবে চিনাকুড়ি কয়লা খাদের নারকীয় বিভীষিকার চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক।

ঙ) নয়ের দশকে জীবনধারায় বড় পরিবর্তন ঘটল আন্তর্জাতিক স্তরে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর সারা পৃথিবীর আর্থিক, বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হল। ফলে উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষ নিজেকে নিয়োগ করে ফেলল এককেন্দ্রিক চিন্তাভাবনায়। 'অনুরাগ' উপন্যাসে দেখি সম্পর্কের কথা এলো খোলাখুলিভাবেই—

> "বাসন্তী অনিমেষকে সেদিন দেখার পরেই, তার রান্নাঘরে কাজলী কে বলেছিল, অনিমেষ বেশ ভালো ছেলে। তুই ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা কর। মাঝে মাঝে পড়ার নাম করে ওর বাড়িতেও যা। কাজলী তখন অন্য জগতের স্বপ্ন দেখছিল— বিশেষ একজন কোন মানুষের মন জয় করতে তখন বড় বেশি উৎসাহ তার নেই।"[১৩]

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালব্যাপি পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীর চিন্তাজগতে যে বিদ্রোহ জেগেছিল তারই প্রকাশ পরিবারে বা সমাজের আরও নানান ক্ষেত্রে দেখা গেল। যেমন—

> "লক্ষ্মী বলে— পথ ছাড়ো, ক্লাসে যাবো। ছেলেদের বলে— আমাদের দাবি এটা। আমরা চাই ক্লাস হোক, আমরা ক্লাসে যাবো। একজন ছেলে এগিয়ে এসে বলে— ক্লাসে যাবে মানে ? লক্ষ্মী এবার গর্জে ওঠে— আমি যাচ্ছি— তোমরা কে কে যেতে চাও আমার সঙ্গে এসো। এবার অন্য ছেলেমেয়েরাও সাহস পায়। এই লক্ষ্মী যে এইভাবে প্রতিবাদ করে ক্লাস যাবে, আর অন্যরা যে তাকে সমর্থন করবে তা ভাবতেও পারেনি তারা।"[১৪]

আলোচনা শেষে এ কথা বলা যায় যে, শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাসগুলিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, প্রকরণের ভাঙা-গড়ায়, নতুনত্বের আস্বাদনে সমাজবাস্তবতার পরিচয়কেই তুলে ধরে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে সমাজবাস্তবতার প্রকাশ যুগোপযোগী হয়েছে যেমন একদিকে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মূল্য চেতনার প্রকাশ ও নিপুন থেকে নিপুনতর হয়েছে। এছাড়া উপন্যাসগুলি সামগ্রিকভাবে শুভবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা এই অন্তহীন পথ চলাই আমাদেরকে আলোর পথের সন্ধান দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১. শক্তিপদ রাজগুরু, মেঘে ঢাকা তারা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা-২৬
২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭
৬. শক্তিপদ রাজগুরু, দেশকালপাত্র, সাহিত্যমালা, ৯৮/২, আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা ৬, পৃষ্ঠা-১৩৩
৭. শক্তিপদ রাজগুরু, অভায়ারণ্য, সাহিত্যমালা, ৯৮/২, আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা ৬, পৃষ্ঠা-১৫
৮. শক্তিপদ রাজগুরু, বাসাংসি জীর্ণানি, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা-৩০৮
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৯
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩০
১১. শক্তিপদ রাজগুরু, শাল পিয়ালের বন, পরমাণু প্রকাশনী, উদয়পুর, রাজস্থান, নতুন প্রকাশ ২০১৪, পৃষ্ঠা-৮৬
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯
১৩. শক্তিপদ রাজগুরু, অনুরাগ, প্রভা প্রকাশনী কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা-৬৯
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মডার্ন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬, কলকাতা-৭৩
২. ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত) প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী ৫৫ডি কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, ডিসেম্বর ২০১১, কলকাতা-৯
৩. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুনা প্রকাশনী, (চতুর্থ সংস্করণ ২০০৮), ৭ যুগল কিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬
৪. সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিকতা, (১৯৯৪), এজেন্সি লিমিটেড, কলকাতা-৯
৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশার্স, (পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর, ২০০৩), কলকাতা-৭৩

শহীদুল্লা কায়সার-এর 'সারেং বৌ': স্বতন্ত্র নারী নবিতুন

সুমনা পাত্র

সারসংক্ষেপ: শহীদুল্লা কায়সার-এর 'সারেং বৌ' উপন্যাসটিতে দেখি সারেং বৌ নবিতুনের জীবনসংগ্রামের কাহিনি। এই সংগ্রাম মূলত পরিচালিত হয়েছে বামনছাড়ি গ্রামের এক শ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষের নারীলোলুপতার প্রতিরোধে, তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট আর্থিক দৈন্যের বিরুদ্ধে এবং অসহায় এক নারীর কাছে তার অনুপস্থিত স্বামীর বিরুদ্ধে কল্পিত অবিশ্বস্ততার কাহিনির নির্লিপ্ত প্রত্যাখ্যানে। নবিতুন স্বামীর কাছে কলঙ্কিনী অপবাদের পরেও প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে গোটা বামনছাড়ি গ্রাম যখন তছনছ হয়ে গেছে তখনও মুমূর্ষু কদমের প্রাণরক্ষার্থে নবিতুন নিজেকে নিংড়ে দিতে মুহূর্তে দেরি করেনি। স্বামীকে স্তন্যপান করিয়ে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছে। নবিতুন বাংলা সাহিত্যের একজন সতীসাধ্বী নারী যে প্রতিনিয়ত নিজের অস্তিত্ব ও সম্মানরক্ষায় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, পরিণামে তার মুখে পাঠক দেখেছে সদ্যজাগা পলির স্নিগ্ধতা, বিজয়িনীর গৌরব। 'সারেং বৌ' উপন্যাসের নবিতুন চরিত্রটি এক অনন্যসাধারণ নারী চরিত্র, যার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব আলোচনাই আমার গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য।

মূল প্রবন্ধ :

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে

পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"[১]

কল্পনাতাপস রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের এই বিশেষ নারীভাবনা শুধু যে তেজস্বিনী স্বাতন্ত্র্য পরায়ণা দৃপ্তা রমনীগণের জন্যই প্রযোজ্য তা নয়, এই ভাবনা শাশ্বত, সর্বকালীন, দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র তা গ্রহণযোগ্য। নারী ও পুরুষের যাপিত জীবনের ধরণে প্রভেদ থাকলেও বৃহত্তর জীবনস্বার্থে তারা একে অন্যের কাছে অপরিহার্য। যদিও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদার দাবী নিয়ে নারীকে যুগে যুগে রাষ্ট্রে- সমাজে পরিবারে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। জৈবিক অঙ্গ সংস্থানের পৃথক বিশেষত্বের কারণেই নারীমাংসলোলুপ পুরুষ আজও সন্ধানরত ব্যাধের ভূমিকায়, আর নারী নিজের অস্তিত্বকে আড়াল করে বাঁচতে চাওয়া ভীতা হরিণী। যুগে যুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজই নারীর মনে একাধিপত্যে উপনিবেশ পত্তন করে পিতৃতন্ত্রকে নিশ্চিদ্র করার আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। বহুবিভাজিত সমাজে যেহেতু বর্ণ-বর্গ ও লিঙ্গগত পার্থক্যকেই পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, সেক্ষেত্রে নারীর অবস্থান যে ছিল সবক্ষেত্রেই প্রান্তিকায়িত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীকে জায়া-জননী-ভগিনী-কন্যা বিভিন্ন রূপে প্রতিমায়িত করে তাকে নারীসত্তার মৌল পরিচয় এবং মর্যাদার আকর করে তোলা হয়েছিল। ভারতীয় সমাজের বিধি প্রণেতা মনু তাঁর 'মনুসংহিতা' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৮ নং শ্লোকে নারীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের দাবীকে নস্যাৎ করে বলেছিলেন—

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্তরি প্রেতেন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।।"[২]

অর্থাৎ বাল্যকালে পিতার, যৌবনে পতির ও পতিমৃত হলে পুত্রদের অধীনে স্ত্রীলোকে থাকবেন। স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে থাকবেন না।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের 'আমাদের জন্মকথা' কবিতায় কয়েকটি পংক্তি মনে আসে—

"দূর দেশ থেকে হেঁটে আসছিলাম
কোন ইতিহাস থেকে . . .

কবে যেন আমাদের জন্ম হয়েছিল।
আমরা অর্থাৎ-নারী, রমনী,মানবী
আমাদের জন্মকথা লেখাই হয়নি
ব্রহ্মা থেকে মনু আর মনু থেকে মানবসন্তান
আশ্চর্য!
এই ইতিহাসের কোনও নারীজন্ম নেই!"[৩]

এই নারীজন্মের অপরাধে নারীমনের পরতে পরতে ক্ষোভ জমতে জমতে এক সময়ে তা বিস্ফোরণের আকার নিয়েছিল। মেয়েদের কথা বলার জন্যে মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে এই বোধ নারী মনে জন্মেছিল। বিশ্ব জুড়ে সংগঠিত হওয়া নারীবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল স্বাধীনতাকামী নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী। এই ' নারীবাদ' শব্দটির যে বিশেষ কোনো আভিধানিক অর্থ আছে তা নয়, এটি একটি বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন যেখানে অবদমিত নারীজাতি আপন ভাগ্য জয় করতে তৎপর হয়েছে। আর সেই আন্দোলন দেশে দেশে আজও সমাজের সর্বস্তরে বর্তমান রয়েছে।

তবুও নারীরা শত সহস্র বছরের অনালোকিত বন্দীদশা কাটিয়ে দৃশ্য-অদৃশ্য বহু শৃঙ্খলমোচন করে মুক্ত জগতের মাঝে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র যে শিক্ষিত নারীরাই আলোকপ্রাপ্ত হয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরব হয়েছে তাই নয়, তথাকথিত নিরক্ষর অতিসাধারণ গ্রামীন বধূরাও নিজেদের ভালোবাসা ও বিশ্বাসকে সম্বল করে শতসহস্র সামাজিক প্রতিকূলতার নিরন্তর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে শহীদুল্লা কায়সার-এর 'সারেং বৌ' উপন্যাসের নায়িকা নবিতুন এক নারী যে শত প্রলোভনের সামনেও নিজেকে নত করেনি, স্বামীর প্রতি প্রেমে অবিচল থেকে হাসিমুখে দারিদ্রকে বরণ করেছে, এমনকি সেই স্বামী যখন তাকে সন্দেহ করেছে তখনও সে ভালোবাসার অগ্নিপরিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-শোকে নবিতুন তার স্বামীকে লতার মত ঘিরে থেকেছে, যখন স্বামীর প্রাণসংশয় হয়েছে তখনও নবিতুন নিজেকে নিংড়ে স্বামীর তৃষ্ণা মেটাতে দ্বিধা করেনি। নারীসত্তার অনন্য উন্মোচনে নবিতুন তাই স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। আমার গবেষণাপত্রেউপন্যাসের কাহিনি আলোচনাক্রমে বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে নবিতুনের অনমনীয় দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত দিকটিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'সারেং বৌ' উপন্যাসের লেখক শহীদুল্লা কায়সার-এর জন্ম ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অবিভক্ত বাংলার (বিট্রিশ ভারত) ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে। পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লা, মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। ১৯৪৬ সালে

কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হলেও শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক।

সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি 'সংশপ্তক', 'রাজবন্দীর রোজনামচা' , 'কৃষ্ণচূড়া মেঘ', 'দিগন্তে ফুলের আগুন' ইত্যাদি। সাহিত্যের জন্য পেয়েছেন 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬৩) ও 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' (১৯৬৯)। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসরের দ্বারা ধৃন হন এবং তারপর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁর 'সারেং বৌ' উপন্যাসটি ১৯৬১ সালে কারাগারে বন্দী থাকাকালীন রচিত হয়েছিল।[৪]

এবার প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসটির কাহিনি বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করতেই হয়। সমুদ্র উপকূবর্তী মানুষদের বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনি নিয়ে রচতি হয়েছে উপন্যাসটি। সারেং বৌ নবিতুনের কঠোর জীবনসংগ্রাম এই উপন্যাসের ভরকেন্দ্রে অবস্থিত। 'সারেং বৌ' উপন্যাসটি একদিকে যেমন সমুদ্রগামী নাবিক জীবনের কাহিনি অন্যদিকে আবার এক প্রোষিতভর্তৃকার তার স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস আর অবিচল নিষ্ঠা ও প্রেমের কাহিনিও। আর এই বিশ্বাসই নবিতুন ও তার স্বামী কদমের দাম্পত্যের ভিত্তিস্তম্ভ, যার দৃঢ়তার বলে কদমের বিরুদ্ধে হাজারো কানাঘুষো কথা নবিতুন নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করেছে, নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছে—

"সারেং তার অমন লোকই নয়।"[৫]

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি সারেং বৌ নবিতুন তার প্রবাসী স্বামীর অপেক্ষায় দিনের পর দিন মেয়ে আক্‌কিকে নিয়ে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করেছে। যদিও উপন্যাসের বাকি পরিবারগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটা বিষয় সহজেই চোখে পড়ে তা হল পরিবারগুলি প্রত্যেকটিই মোটামুটি স্বচ্ছল। নবিতুনের অন্যান্য জ্ঞাতিরা স্বচ্ছলতায় থাকলেও নবিতুন তাদের কাছে প্রতিদিন চেয়েচিন্তে সংসার চালানোর পক্ষাপাতী ছিল না। সেক্ষেত্রে তার আত্মাভিমান তাকে স্বনির্ভর হতে শিখিয়েছে। মুরগী পালন, হাঁস পালন, চাটাই বোনা, কোরা বানানো, ডুলা বানানো আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান এনে ঢেঁকিতে ছেঁটে চাল তৈরি করে সে নিজেদের অন্নসংস্থান করেছে। একসময় বাজারে ধানভানার কল বসলে তার 'বারান্দার'র কাজটিও চলে গেছে। তার চূড়ান্ত দুর্দিনে একমাত্র শরবতি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। তবু নিত্যদিন অনাহার, অর্ধাহারের সাথে লড়াই করেও শেষপর্যন্ত তার আত্মসম্মানই জয়লাভ করেছে, কারণ—

"বড় হিস্যার বড় গুমান। একদিন উধার দিবে তো দিন দিন খোঁটা দিবে।"[৬]

বামনছাড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের অর্ধেক লোকই বছরের পর বছর জাহাজের কাজে বিদেশে কাটায়। যদিও স্বামীর জন্য প্রতিরক্ষারত নবিতুন প্রতিদিন শোনে সাধারণ গ্রামের মানুষদের বিদেশে গিয়ে ঘর সংসার ভুলে বিদেশিনী বিয়ে করার কথা। লোকে বলে—

"বামনছাড়ির গাঙ পার থেকে শুরু হয়েছে কদুর খিল, তারপর যে পিয়ালগাছা,
সেসব গ্রামে নাকি এমন ঘটনা 'আকসার' ঘটছে।"[৭]

আবার দীর্ঘ তিন বছর যে মানুষের কোনো চিঠিপত্র খোঁজখপর পাওয়া যায়নি, সে মানুষের বেঁচে থাকা নিয়েও গ্রামের মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আর সেক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করার তো কোনো যুক্তি নেই, তাই আবার সব ভুলে নবিতুনের নতুন জীবন শুরু করা উচিত এমন ভাবনাও লোকে ভাবতে শুরু করেছে। তবু সর্বজন প্রচলিত—

"যে দেয় কয়াল পাড়ি
বৌ তার দুপুরে রাঁড়ি।"[৮]

প্রবাদের মুখে ঝামা ঘষে নবিতুন স্থির বিশ্বাসে অটল থেকেছে যে কদম ফিরবেই আর তার স্বামী তাকে ভুলে এমন কাজ করতেই পারে না।

বেঁচে থাকার প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেও নবিতুন পথভ্রষ্ট হয়নি, সে বারবার অসৎ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছে। তার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে লুন্দর শেখ, ছোট চৌধুরী, কোরবানের মত মানুষরা তাকে নষ্ট করতে চেয়েছে। পুবপাড়ার লুন্দর শেখের কুটনী কুঁজাবুড়ি তাকে প্রতিনিয়ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন দেখিয়েছে, বলেছে—

"বিবির সুখে থাকবিরে নবিতুন। বিবির সুখে থাকবি। বৌদের বড় মহব্বত
করে লুন্দর শেখ!"[৯]

তবুও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও নবিতুন অসৎ পথে পা বাড়ায়নি। তার হয়তো মনে হয়েছে এই অসৎ প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেওয়া আর নিজেকে বিক্রির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। মল্লিকা সেনগুপ্তের 'ধনতেরাস' কবিতার পংক্তি ধার করে বলা যায়—

"সোন মানে এক দারুণ গর্ব
উদ্বেল পৌরুষ
সোনা মানে বন্দিনীর স্বপ্ন
পুরুষের দেওয়া ঘুষ"[১০]

শুধু ভালোবাসার কাছে যে নারী নিজেকে সমর্পণ করেছে তার কাছে সোনার গহনার প্রলোভন তো ষোলাআনাই ফাঁকি। সারেং বৌ হলেও নবিতুন অভাবের তাড়নায় চৌধুরী

বাড়িতে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে। লেখকের কথায়—

> "চৌধুরী বাড়ির কামটা দাসীর কাঝ। কিন্তু কাম-কাজ সেরে নিজের ভাতটা লয়ে বাড়ি ফিরতে পারে নবিতুন। রাত্রে বাড়িতেই থাকে ও। দাসীগিরির সাথে এটুকুই তফাৎ। এই তফাৎটুকুই যেন নবিতুনের মান-ইজ্জৎ আর আব্রুর নিশ্চিত দলিল।"[১১]

যদিও ছোট চৌধুরীর কুৎসিত চাহনি নবিতুনকে প্রতিমুহূর্তে বিব্রত করেছে। সে সবাইকে বোঝাতে চেয়েছে যে, সে স্বামী পরিত্যক্তা নয়, তার স্বামী বিদেশে গেছে, আর একদিন না একদিন সে ফিরবেই। নবিতুনের কষ্টের দিনগুলিতে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না এলেও তার কাজকর্মের নিন্দে করতে কেউ পিছপা হয়নি। বড় হিস্যার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য কামিজ বুড়ো বলেছে—

> "হতে পারে সারেং বাড়ি গরিবের বাড়ি। তা বলে সারেং বাড়ির মেয়েরা বড় বাড়ি গিয়ে দাসীবান্দীর কাম নিয়েছে এমন লজ্জাকর ঘটনা কেউ শোনেনি কোন দিন।"[১২]

ঘরে বাইরে চূড়ান্ত অসহযোগিতার মধ্যেও নবিতুন নিজেকে রক্ষা করেছে। চৌধুরী বাড়ি থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকারে পাটের ক্ষেতে লুন্দর শেখ তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে নষ্ট করতে চেয়েছে, যদিও অসীম সাহকিতার সঙ্গে নবিতুন সেই পাশবিক আক্রমণ প্রতিহত করেছে। শরীরে মনে বিধ্বস্ত একসময় আশংকিত হয়েছে কদমের খবর না পেয়ে; হতাশা অবসাদে ক্লিষ্ট নবিতুনের যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে লেখকের বর্ণনায়—

> "...এমন করে নিজেকে কত রাত রক্ষা করে চলবে নবিতুন! এত উৎপাত, এত যন্ত্রণা, এত অভাব, এত প্রলোভন। কতদিন কতদিক সামলাবে নবিতুন ?"[১৩]

একসময় দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করে এবং জাহাজের কাজ নিয়ে দেশবিদেশ ঘুরে কদম দেশে ফিরেছে। কিন্তু গ্রামে ফিরে ঘরদোরের জরাজীর্ণ ভগ্নদশা দেখে সে হতবাক হয়েছে। স্ত্রী নবিতুন ও মেয়ে আক্‌কিকে বারবার প্রশ্ন করেও সে কোনো সদুত্তর পায়নি। যত কদমের কাজে ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে এসেছে ততই নবিতুন তাকে চাষাবাদ করে ঘর গৃহস্থ করার জন্য জোর করেছে, মেয়ে আক্‌কির বিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। জমির টান দিয়ে, গৃহস্থির নেশা দিয়ে সে কদমের সমুদ্রের নেশাটা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। কদম দালানকোঠার স্বপ্ন দেখালে নবিতুন জানিয়েছে ঘরের মানুষ ছাড়া ঘর সর্বদাই শূন্য। নবিতুন যত কদমকে জাহাজের কাজ ছাড়ার কথা বলেছে, কদম তাকে বুঝিয়েছে—

"আমি যা রোজগার করে আনি গেরস্থিতে যে তার অর্ধেকও পাবি না নবিতুন!"[১৪]

তবু নবিতুন সে সব কথা কানে তোলেনি, কদমকে সে আর কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। কারণ পুরুষ বিবর্জিত জীবনে নারীকে যে কি চূড়ান্ত অসহায়তা ও বিপদ লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয় নবিতুন তা জীবনের বিনিময়ে বুঝেছিল। প্রেমাস্পদকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে রেখে সুখী দাম্পত্য যাপনের স্বপ্ন যেমন ছিল, তেমনি ছিল কদমের কাছে নিরাপদে থাকার আশাও। একদিকে নিজেকে রক্ষা, অন্যদিকে কিশোরী আক্‌কিকে সমাজের চোখে আড়াল করে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদিও গ্রামীণ সমাজ তা হতে দেয়নি।

আত্মাভিমানী নারীকে দমন করার সহজতম পন্থাটিকেই তারা অবলম্বন করেছিল আর তা হল নবিতুনের চারিত্রিক অধঃপতনের রটনা। গ্রামের মানুষ সুযোগ বুঝে নবিতুন সম্পর্কে নানা তির্যক মন্তব্য করে কদমের মন বিষিয়ে দিয়েছে। অফুরান বিশ্বাস ভরসা নিয়ে নবিতুন স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছিল কিন্তু গ্রামের লোকের অল্পকথাতেই কদম স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে। গ্রামের পোস্টমাস্টার আর লুন্দর শেখের কথায় কদম নবিতুনের সন্তান সম্ভাবনার বিষয়টিতেও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। নবিতুনের গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃপরিচয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করে কদম নবিতুনকে আঘাত করেছে, বলেছে—

"যা ছোট চৌধুরীর ঘরে যা। খানকি 'মায়া মানুষ' নিয়ে ঘর করি না আমি"।[১৫]

এমনকি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে নবিতুন যখন অচৈতন্য, তখনও কদম ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। তাদের আগত সন্তান ছেলেই হবে বলে কদম একদিন ভবিষ্যতবাণী করেছিল, কিন্তু সন্দেহের আগুনে পুড়ে কদমের কারণেই তাদের সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পায়নি। মৃত সন্তানের শোকে মূহ্যমান নবিতুন যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন কদম উদ্যোগ নিয়েছে কাজে ফেরার।

তবু বামনছাড়ির সব মানুষ একযোগে কদম নবিতুনকে আলাদা করতে সচেষ্ট হলেও প্রকৃতি সঠিক সময়ে মোক্ষম চাল দিয়ে আবার তাদের এক করেছে। নদী বা সমুদ্রতীরে বাস সর্বদা সর্বনাশকে সঙ্গী করেই। খেয়ালি প্রকৃতি প্রলয়ংকরী রূপ নিয়ে তান্ডব শুরু করে মুহূর্তে সব পরিস্থিতিকে ওলোটপালোট করে দিয়েছে। প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আত্মরক্ষা করতে সবাই যখন লুন্দর শেখের দালানবাড়িতে ঠাঁই নিতে ছুটেছে তখনও নবিতুন নিজের জেদে অবিচল থেকেছে, কোন পরিস্থিতিতেই সে লুন্দরের আশ্রয়ে যেতে চায়নি, তা সে সুখভোগের জন্যই হোক বা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতেই হোক। এই অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে নামা নবিতুন সহজেই পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। তবু মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নবিতুন কদমের সব সন্দেহের অবসান করেছে,

ছোট চৌধুরীর স্ত্রীর কাছ থেকে সে জেনেছিল কিভাবে পোস্টমাস্টার আর লুন্দর শেখের কারসাজিতে কদমের পাঠানো চিঠিপত্র ও টাকা তারা আত্মসাৎ করেছিল, এমনকি কদমের তার প্রতি হঠাৎ বিরূপতার মূলে যে তাদের ইন্ধন ছিল তাও সে জানতে পেরেছিল। এসব শুনে কদম নবিতুনকে অকারণ সন্দেহ করার জন্য আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়েছে। সুতীব্র সন্দেহে সে সম্পর্ক ভাঙতে বসেছিল, প্রকৃতির অমোঘ খেলায় একলহমায় আবার তা জোড়া লেগেছে। নবিতুনের শাড়ির আঁচল কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলেছে— "যদি মরি একসাথেই মরব, বুঝলি ?"[১৬]

প্রবল সামুদ্রিক ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে বামনছাড়ি গ্রামের আর সকলের যখন সলিলসমাধি হয়েছে, তখনও নবিতুনের প্রেমের কাছে হার মেনেছে মৃত্যু। চতুর্দিকে জল কাদায় মাখামাখি অজস্র মৃতদেহের ভিড়ে জেগে থেকেছে শুধু নবিতুন আর কদম। লেখকের বর্ণনায়—

> "ওরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম মানব-মানবী-বাবা আদম আর বিবি হাওয়া। অকস্মাৎ হৃদয়হীন বিধাতা ওদের ছিঁড়ে দিয়েছে এই রুক্ষ পৃথিবীতে। হঠাৎ করে অপরিচিত ভূমিতে এসে পড়ে ওরা শঙ্কিত বিমূঢ়।"[১৭]

একসময় নবিতুন মৃতদেহের ভিড়ে খুঁজে পেয়েছে চেতনাশূন্য মুমূর্ষু কদমকে। আশা-আনন্দ উৎকণ্ঠায় সে চিৎকার করে উঠেছে। আর এখানেই মাতৃত্ব হেরে গেছে চিরন্তন প্রেমের কাছে। মেয়ের অকালমৃত্যুর জন্য নবিতুন ব্যাথাতুর হয়নি, তার মৃতদেহ খোঁজবার চেষ্টাও করেনি। বরঞ্চ মুমূর্ষু কদম যখন বারবার চেয়েছে তৃষ্ণার জল, তখন সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র থেকে আঁজলা ভরে জল এনে প্রেমাস্পদের মুখে দিয়েছে, কিন্তু অফুরন্ত জলসম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও সমুদ্র কদমের তৃষ্ণা নিবারণে অসমর্থ হয়েছে। পিপাসায় কাতর কদম যখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে, তখন মরিয়া নবিতুন শেষ চেষ্টা করেছে স্বামীকে বাঁচানোর। সদ্যপ্রসূতি নবিতুন সম্পর্ক ভুলে স্বামীকে কোলে তুলে শুধু স্বামীকে কোলে তুলে স্তন্যপান করিয়েছে, সঞ্চিবনী জীনবসুধায় কদমকে নব প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করেছে। সম্পর্কের সমাজ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে শুধু স্বামীর জীবনবাঁচানোর তাগিতে এমন সাহসী পদক্ষেপ সত্যিই পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। যদিও কদমের সংজ্ঞা ফিরতেই নবিতুন ভৎর্সনার শিকার হয়েছে, নূন্যতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেই কদম বলেছে—

> "একি করেছিস ? একি করেছিস নবিতুন ? পর করে দিলি ? এমন দুশমনি করলি ?"[১৮]

তবু শত ভৎর্সনার পরও নবিতুনের মুখে লেগে থেকেছে বিজয়িনীর হাসি। স্বামীর জীবন বাঁচানোই যেখানে মূল অভিষ্ট সেখানে তার পন্থা কি হবে সে নিয়ে নবিতুন ভাবিত হয়নি। তবুও সদ্যসংজ্ঞাপ্রাপ্ত ভৎর্সনা তার অন্তরাত্মাকে আহত করেছে। তার কাজের মধ্যে যে ভুল কোথায় তা নিয়ে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেও সে কোনো সদুত্তর পায়নি। লেখকের বর্ণনায় ব্যক্ত হয়েছে নবিতুনের মর্মযন্ত্রণা—

> "বামনছাড়ির সারেং বৌ নবিতুন। কুটনীর কুমন্ত্রনা, বালাখানার প্রলোভনের মুখে যে ছিল শক্তিমতি নারী। লুন্দর শেখের শয়তানি আর লালসার সুমুখে যে ছিল এক ফুলকি আগুন। অনাহার দুর্ভোগ আর ক্ষণিকের তরে সন্দেহ বিভ্রমের উন্মাদ হওয়া আপন মানুষটির ধিক্কারের মুখেও যে ছিল ধৈর্যবতী বসুন্ধরা। মহাপ্রলয়ের অতল গহ্বর থেকে, সহস্র ঘূর্ণাবর্তের অন্ধকার ফুঁড়ে যে উঠে এলো সূর্যস্নান পলিমাটির স্নিগ্ধ জীবনের রাজ্যে। ক্ষিপ্ত সাগরের সেই আসমান-উঁচু প্রলয়ংকরী তরঙ্গের টুঁটি টিপে জীবনকে সে ছিনিয়ে আনল। সেই নবিতুনের বুকের আধারে এখনও তো কত শক্তি। কত সুধা! ওই সুধার নির্ঝর ঢেলে কেন আপন প্রিয়তমকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে না ও ?"[১৯]

সৃষ্টির প্রারম্ভিক লগ্নে নিষ্কলুষ দুই মানব-মানবী আদম ও ইভ যেমন একে অপরকে অপার বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিল, ঠিক তেমন ভাবেই নবিতুন ও কদম বিস্ময়াভিভূত হয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছে। ক্রমশ সম্বিত ফিরলে তারা বুঝেছে তারা সম্পূর্ন নগ্ন। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তাদের মনের কলুষতাকে ধৌত করার পাশাপাশি তাদেরকে আব্রুহীনও করেছে। এক মৃতদেহের পরনের তবন খুলে তারা দুজনে লজ্জা নিবারণ করেছে, তারপর হাতে হাত রেখে অজানার উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করেছে।

'সারেং বৌ' উপন্যাসের নায়ক নবিতুন, সে-ই উপন্যাসের মুখ্য চালিকা শক্তি। সে প্রমাণ করেছে শুদ্ধ প্রেম ও একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য দিয়ে শত অপমান -বঞ্চনা-মিথ্যাভাষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সম্ভব। আর তাই যুগ যুগ ধরে সমাজ নির্ধারিত জায়া-জননী-ভগিনী-কন্যা সব পরিচয় সম্পর্কের উর্ধ্বে উঠে সে নিজের সৃষ্টিশীল নারীসত্তাকেই মহিমান্বিত করেছে। এখানেই উর্বরা ধরিত্রী আর নারী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সর্বং সহা ধরিত্রী যেমন নিজেকে নিঃশেষিত করেও প্রতিনিয়ত নিজের ধৈর্য ও সহ্যশক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে, নারীও তেমনই যুগে যুগে ধৈর্য ও সহ্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। তবে এই সহ্যশক্তির অবমাননাকে তারা মান্যতা দেয়নি, কালের নিয়ম পরিবর্তনের চাকায় একসময় পুরুষের দম্ভ গুঁড়িয়ে গেছে। নারী প্রমাণ করেছে ভালোবাসা-প্রেম তাদের বেঁচে থাকার হাতিয়ার, কখনই তাদের দুর্বলতা নয়। নবিতুনের

সংগ্রাম পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে গ্রামীণ সুবিধাভোগ মানুষদের নির্লজ্জ নারীলোলুপতাকে, তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট আর্থিক দৈন্যতাকে ,সর্বোপরি সুষ্ঠ দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করে কিভাবে তার ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেওয়া যায় সেই নির্লজ্জ প্রবণতাকে। যুগ যুগ ধরে বাংলার সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা নারী নির্যাতন ও নারী অবমাননার ঘটনাই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'সারেং বৌ' উপন্যাসে। নবিতুন বাংলা সাহিত্যের সেই নারী যে কাঙ্খিত সম্পদকে আপন ক্ষমতাবলে পুনরুদ্ধার করেছে, ভালোবাসা যার মূলধন, আত্মবিশ্বাস যার একমাত্র শক্তি। সমগ্র উপন্যাস জুড়েই নবিতুনের একনিষ্ঠ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কখনও সে প্রেমপ্রকাশে বলিষ্ঠ, আবার কখনও অব্যক্ত প্রেম চোখের জল হয়ে ভাষালাভ করেছে। অজানার উদ্দেশ্যে হাতে হাত রেখে পাাড়ি দেওয়া দুই যুবক-যুবতীকে দেখে দাম্পত্য প্রেমের এক চিরন্তন বাণী মনে আসে, রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব— তুমি আছ আমি আছি"।[২০]

এই প্রতিশ্রুতি পূরণের মধ্যে দিয়েই নবিতুন প্রেমের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে,আর তাই নবিতুনের চোখে দেখি—

"....সদ্যজাগা পরীর স্নিগ্ধতা। বিজয়িনীর গৌরব"।[২১]

বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শস্থাপনেই নবিতুন এক স্বতন্ত্র নারী চরিত্র যে শুধু 'সারেং বৌ' উপন্যাসটিকেই বিশেষত্ব দেয় নি, সেইসঙ্গে আগামী দিনের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির কাছে আদর্শ প্রেমের একটি মানদন্ড তৈরি করেছে, আর এখানেই নবিতুন স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রাঙ্গদা', রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ (প্রথম খন্ড), কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৬, পৃষ্ঠা ৩৫৭।
২. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মনুসংহিতা, ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা', কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ/ অষ্টম মুদ্রণ, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৬২।
৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'পুরুষকে লেখা চিঠি' কাব্যগ্রন্থ , কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ/ পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭ , পৃষ্ঠা ২৩।
৪. শহীদুল্লা কায়সার, 'সারেং বৌ', বাংলাদেশ, ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, মলাট অংশ।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২২।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা ২৭।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১১।
১০. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'পুরুষকে লেখা চিঠি' কাব্যগ্রন্থ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ/পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫০।
১১. শহীদুল্লা কায়সার, 'সারেং বৌ', বাংলাদেশ, ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৮।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৮।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৬।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১০৮।
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১২২।
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৪।
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৬।
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৬।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ, 'নির্ভয়' কবিতা, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,প্রথম প্রকাশ/ ষষ্ঠ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬২৭।
২১. শহীদুল্লা কায়সার, 'সারেং বৌ', বাংলাদেশ, ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ১২৭।

বিশেষ গ্রন্থঋণ:

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ/ দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা পুস্তকমেলা ২০২০, 'বাখতিন ও নারীচেতনাবাদ' অধ্যায়, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা ৫।
২. অতনু শাশমল, 'রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা ও অন্যান্য', কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৫ , 'রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা' অধ্যায়, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা ৯।

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

সমরেশ বসুর শাম্ব : মিথে বিনির্মাণ

কৈলাশপতি সাহা

সাহিত্যে মিথ বা মিথের প্রয়োগ বিষয়টিকে বহু তাত্ত্বিক বহুভাবে দেখেছেন। মিথ কেবলমাত্র কোনো কাহিনি নয়, ধর্ম নয়, সংস্কার নয় বা সাহিত্য নয়— তবে সমাজ বদলকে বুঝতে, ব্যক্তি মানুষের সমাজের দ্বন্দ্বক্রিয়াকে জানতে, জীবন প্রবাহের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে জানতে কিংবা নির্মাণ করতে মিথ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। মিথের সর্বগ্রাসী রূপের কারণে আলাদাভাবে মিথকে জানতে বা বুঝতে চাওয়ার ইচ্ছা স্বাভাবিক। মিথের উদ্ভব কোথায়, কী তার কাজ, কী তার বিষয়— এই সব প্রশ্ন ভিড় জমায় পাঠকের মনে। 'মিথ' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Muthos' থেকে। 'Muthos' শব্দটির অর্থ হল 'anything uttered by a word of mouth,' অর্থাৎ মুখ হতে নিঃসারিত শব্দ দ্বারা উচ্চারিত যেকোনো কিছু। হোমার 'মিথ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বর্ণনা (Narrative) ও কথোপকথন (Conversation) অর্থে- গল্প বা কাহিনি অর্থে নয়। প্লেটো 'Muthos' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'Muein' (to initiate into secrets) শব্দের অনুসঙ্গে, যার অর্থ রহস্য সমূহে দীক্ষাগ্রহণ। এখানে তিনি এমন কিছু বোঝাতে চাইলেন যা মুখ্যত সত্য বর্জিত কিন্তু পুরোপুরি অসত্য নয়। নৃতাত্ত্বিকেরা মিথ দিয়ে খোঁজেন সভ্যতা বা জাতির কালচার, মনস্তাত্ত্বিকেরা মিথ ব্যবহারে তাঁদের মনোবিজ্ঞানকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চান, সমাজবিজ্ঞানীরা এর সাহায্যে সময়ের অন্দরমহলকে ধরতে চান এবং সাহিত্যিকেরা মিথের সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাও সাহিত্যের মুখ চেয়েই।

মিথের প্রজন্মোত্তরে যাত্রার মধ্যে ম্যাক্সমুলার খুঁজে পেয়েছিলেন নতুন ভাষা ও ব্যাখ্যানের অস্তিত্ব। টেলার থেকে জেমস জর্জ ফ্রেজারের চিন্তায় এর ব্যাপকতা ও গভীরতা বেড়েছে অনেকটা। জর্জ ফ্রেজার তাঁর 'The Golden Biugh— A Study in Magic and Religion' গ্রন্থে দেখালেন মিথ পুরাকথার ব্যাখ্যা হলেও মিথ আপনাতেআপনি বিকশিত

হতে পারে না, সে স্বভাবতই বিজরিত হয়ে থাকে ধর্ম, রিচুয়াল আর যাদুর সঙ্গে। মিথের সম্পর্কটি ম্যালিনস্কি ব্যাখ্যা করেছেন সামাজিক প্রেক্ষিত আভাসের মধ্যে। মিথ চর্চায় সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এবং সি.জি. ইয়ুং-এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ফ্রয়েড মিথকে আখ্যান গল্প বা তার রূপান্তর দিয়ে দেখেন নি, বরং 'স্বপ্ন' বা 'যৌনতা'-র আদিরূপের সন্ধান চালিয়ে মানবমনের জটিল রূপের একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফ্রয়েডের ছাত্র ইয়ুং মিথ ভাবনায় ফ্রয়েডের থেকে ভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন। মানুষের ইতিহাসে ব্যবহারিক সংস্কৃতির যে বিবর্তন ঘটেছে সেগুলিকে গল্পের আকারে এক একটি জাতি নিজের মতো করে সঞ্চিত করে রেখেছে তাদের ঐতিহ্যের পরম্পরার মধ্যে। এগুলি তাদের মধ্যে এমনভাবে বিস্তার করে রাখে যে মানব মনের গভীরে সেগুলি স্থায়ীভাবে অবস্থান করে— যাকে ইয়ুং বলেছেন 'কালেকটিভ আনকনসাস' বা 'যৌথ অবচেতন' বা 'সামুহিক নিজ্ঞান'। এই সামুহিক নির্জ্ঞানের মধ্যে মিথকথার আদিমতম মূর্তিটি লুকিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত অবচেতনের চেয়ে বৃহত্তর পরিধিতে ইয়ুং সমষ্টিগত অবচেতনকে গুরুত্ব দেন। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের বিষয় জাতির স্মৃতিভান্ডার থেকে জন্ম নেয় এই অবচেতন মনের। প্রতিটি শিশু বংশানুক্রমে এই সমষ্টিগত অবচেতনের ভাগীদার। ফলত আমার আদিমতম পূর্বপুরুষের ভয়, ঘৃণা, ভালোবাসা আমার উত্তরাধিকার। এই সমষ্টিগত অবচেতনের বিষয় হল আর্কেটাইপ। সমালোকচকের ভাষায়— "আর্কেটাইপ হল মানবজাতির অভিজ্ঞতাপ্রসূত কিছু মানসিক রূপায়ণ। তার সুনির্দিষ্ট চেহারা বা বৈশিষ্ট্য বলা মুশকিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিককে বিচার করার সময় সহজভাবে মানুষ এইসব আর্কেটাইপ ব্যবহার করে। মাতৃত্বের আর্কেটাইপ, শিশুর আর্কেটাইপ, কুমারীর আর্কেটাইপ, জ্ঞানী বৃদ্ধ, উভলিঙ্গ, বীরপুরুষের আর্কেটাইপ।"[১] ইয়ুং এর তত্ত্ব অনুসারে মিথের সৃজন হয় সমষ্টিগত অবচেতনের ভাষায়।

'মিথ' মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বহন করে। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা চোদ্দটি মিথের অনুমান করে থাকেন— সৃষ্টিরহস্য, মহাপ্লাবন, আত্মা, দেবতার জন্ম, মানুষের উদ্ভব, দেবদানবের দ্বন্দ্ব, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, দিন-রাত্রি, বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য, স্বর্গ-নরক-পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, আচার-সংস্কার-রীতি-নীতি, অগ্নি আহরণ, বিভিন্ন শিল্প বস্তুর উৎপত্তি। মিথ থেকে টেল এবং তার থেকে লিজেন্ডের মধ্য দিয়ে এই কাহিনিগুলি প্রবাহিত হয়। ভারতবর্ষে অনেক সময় মিথ ও পুরাণ একাকার হয়ে গেছে। মিথের সঙ্গে পুরাণ, লোককথা, ইতিহাস ইত্যাদিকে মিলিয়ে মিশিয়ে ব্যবহার করেন আধুনিক লেখকেরা। তাই মিথ আধুনিক সাহিত্যে এক সামগ্রিকতা নিয়ে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ মিথের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন— "আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নি-বায়ু, সূর্য চন্দ্র মেঘ বিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া

সজীব ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন— ইহা আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে।"[২] এই স্পর্শ পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে এবং সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থে মিথের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন— "পুরাণ কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে— শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভোগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে-বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে ভোলে।"[৩] মিথ চিরজীবী। ফিলিপ রাহব মিথ প্রীতির মধ্যে লক্ষ করেছিলেন ইতিহাস বিরোধিতা। সমালোচক রবীন পাল মনে করেন— "পুরাণ বা মিথের ব্যবহারের অর্থ বর্তমান থেকে সরে যাওয়া নয়, কোন স্থবিরতায় আবদ্ধ হওয়া নয়। মিথ অতীতের সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও বর্তমানকেই প্রকাশ করে, তাকে অর্থবহ করে তোলে। তাই অনবরত ব্যবহারেও শিল্পীর হাতে মিথ নামক অস্ত্রটির ধার কখনো ভোঁতা হয় না দর্শক পাঠক শ্রোতার কাছেও মিথের আবেদন ম্লান হয় না; রবং তা নিত্যনতুন অর্থ পায়।"[৪]

সমরেশ বসু রামায়ণ ও মহাভারতকে অবলম্বন করে তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। পুরাণ কাহিনিকে কালকূট একটা রূপক হিসেবে গণ্য করে তার মধ্যে আমাদের বহু শতাব্দীর চলমান ইতিহাসের পথ সংকেত খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। সমালোচক সুবোধ ঘোষ 'ভারত প্রেমকথা' গ্রন্থের মুখবন্ধে ক্লাসিক সাহিত্যের রূপ ও ভাবের প্রবহমানতা প্রসঙ্গে বলেছেন— "ক্লাসিক-এর রূপ ও ভাব খণ্ডকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কালোত্তর প্রেরণার শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে আছে কবি বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত। বিশেষ কোন জাতির জীবনের রীতিনীতি ও ঘটনা অথবা বিশেষ কোন যুগের ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত হলেও বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে মানবজীবনের চিরকালীন আনন্দ হর্ষ ও বেদনার ব্যাকুলতা বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে।"[৫] ভোরের সূর্যের মত ক্লাসিক সাহিত্যগুলি মানুষের মনের আকাশে নিত্যনতুন আলোর দিগন্ত খুলে দেয়। তাই প্রত্যেকটি জাতির সাহিত্যে দেখা যায় কবি সাহিত্যিকেরা মহাকাব্য, গাথা, সঙ্গীত ও শিল্পরীতি থেকে প্রেরণা আহরণ করেছেন। পুরাণ কথার অভ্যন্তর থেকে ইতিহাসের পদচিহ্নকে অন্বেষণ করা আধুনিক লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ।

ভারতীয় পুরাণবৃত্ত নিয়ে সমরেশ বসুর অন্বেষণ চোখে পড়ে 'শাম্ব' (১৯৭৮), 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি', (১৯৮৪), 'প্রাচেতস' (১৯৮৪) এবং 'পৃথা' (১৯৮৬) এবং 'অন্তিম প্রণয়' (১৯৮৭) উপন্যাসে। 'শাম্ব' আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর সমরেশ বসুর পুরাণ কাহিনি নির্ভর উপন্যাসগুলি জনপ্রিয় হয়েছে। সমরেশ বসুর উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত বলেছেন— "পৌরাণিক চরিত্রকে যেভাবে উপন্যাসগুলির মধ্যে এনেছেন, তাতে

মিথের যে পরিচিত প্রতিমা— সেটার অনেকখানি ভাঙা এবং আরো অনেকখানি গড়ার ব্যাপারটুকু ঘটে গেছে। মিথের ভাঙাগড়ার এই সুকুশল কারুকৃতি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে কালকুটের উপন্যাসগুলিকে।"[৬]

'শাম্ব' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু শ্রীকৃষ্ণ বা মহাভারতের ঘটনাকে ঐতিহাসিক নথি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শাম্বের কাহিনি রয়েছে মহাভারতের মৌষলপর্বে। যেখানে যাদববংশীয় একদল দুর্বিনীত যুবক তাঁকে গর্ভবতী রমনীর ছদ্মবেশে সাজিয়ে এনে দ্বারকা নগরীতে আগত মুনিগণ— কাশ্যপ, বিশ্বমিত্র, দুর্বাসা, কন্ব, নারদ, প্রমুখের সামনে উপস্থিত করেন। মুনিদের সঙ্গে রসিকতা করে জানতে চান এই নারীর সন্তান কী হবে মেয়ে, না ছেলে ? পেটের সঙ্গে লোহার একটি মুষল বেঁধে শাম্বকে গর্ভবতী সাজানো হয়েছিল বলে ক্রুদ্ধ মুনিরা অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, তিনি মুষলই প্রসব করবেন। এই মুষলের সূত্র ধরে স্বয়ং কৃষ্ণেরও মৃত্যু ঘটে এবং যদুবংশ ধ্বংস হয়। মহাভারতের এই কাহিনিটি অধিকতর পরিচিত। কিন্তু কালকূট এই পরিচিত কাহিনিটিকে উপেক্ষা করেছেন। মুনিদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের জন্য দুর্বাসার শাপে শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্থ হলেন— এমনটা না দেখিয়ে, তিনি উপন্যাসের উপাদানে এনেছেন স্বল্পপরিচিত সেই কাহিনিকে, যেখানে নিজের কয়েকজন বিমাতার সঙ্গে অনাচারে লিপ্ত হবার অপরাধে শাম্ব পিতৃশাপে দুরারোগ্য ও ঘৃণিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে কালকূটের কলমে বিমাতার পরিবর্তে কৃষ্ণের বৃন্দাবন সহচরী গোপিনীদের সঙ্গে শাম্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে।

এর পর থেকে কালকূটের পুরাণ অন্বেষণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে 'আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব ও বেদনা। তাঁর নিজের কথাতেই—"আমি একটি ব্যক্তির কথাই বলতে চেয়েছি, যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেন।"[৭] বস্তুত পৌরাণিক শাম্ব একটি দুর্বল চরিত্র। কিন্তু সেই শাম্বকে এই উপন্যাসে দেখা গেছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও, সেই রোগে ক্লিষ্ট অন্যান্য মানুষদের নিরোগ করে তোলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী এক পুরুষরূপে। তাঁর সূর্যতপস্যা প্রতীকী এবং তাৎপর্যবাহী। শাম্ব নিজে উত্তরণের প্রতীকরূপে। যদিও— "নিজের উত্তরণ তাঁর শেষ কাম্য নয়। সকলকে নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে, বাঁচার সংগ্রামে... তাই শাম্বের উত্তরণের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত শাপমুক্তির সঙ্কেতই প্রদর্শিত হয়নি। সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের সাপমুক্তির প্রয়াসে সম্প্রচারিত আন্দোলন যেন ধীরে ধীরে বিপ্লবের পথ দেখিয়ে, একটা বৈপ্লবিক কর্মের সমাধা করেছে।"[৮]

যদু বংশনাথ কেন্দ্রিক পরিণামের ইঙ্গিতবাহী মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের পরিবর্তে সমরেশ ভবিষ্য সৌর-শাম্ব এই তিনটি কম গুরুত্বপূর্ণ পুরাণকে অবলম্বন করে অগ্রসর

হয়েছিলেন। কারণ পরাভব বা ধ্বংস নয়— এই কাহিনিতে তাঁর অভিপ্রেত হল জয় ও সৃষ্টির কথা বলা। সাধনা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে মানুষের অপরাজেয় সত্তা যে সমস্ত বিঘ্ন ও প্রতিকূলতাকে জয় করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেই, এই কাহিনির রূপকে মানুষের সেই অপরাজেয়তার তত্ত্বটিকেই কালকূট বলতে চেয়েছেন। "১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই-এর ক্ষেত্ররাজ বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয় থেকে দেবনগরী অক্ষরে প্রকাশিত হয় বশিষ্ট বিরোচিত শাম্বপুরাণ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা থেকে বিজনবিহারী গোস্বামী মূলগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। নাম দেন 'শ্রী সাম্বপুরাণ' নামে। পুরাণ পরিচয় গ্রন্থে যে অষ্টাদশ পুরাণের নাম পাওয়া যায় সেখানে এর উল্লেখ নেই। এটি আসলে সূর্যোপাসনার গ্রন্থ। কালকূট সম্ভবত এই সংস্কৃত সংস্করণটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।"[৯]

কালকূট অবশ্য শাম্বমিথসম্পৃক্ত আরো একটি প্রচলিত ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন— "শাম্বের সূর্যোপাসনার সঙ্গে তান্ত্রিক অভিচারের সম্বন্ধ রয়েছে— এ কথাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কালকূটের শাম্ব এই তন্ত্রসংস্রব-মুক্ত হিসেবেই কাহিনিতে এসেছেন। ভবিষ্যপুরাণে আছে যে, চন্দ্রভাগা তীরে সূর্যমন্দির নির্মাণ করে শাকদ্বীপী সৌরব্রাহ্মণদের সেখানে আনিয়ে শাম্ব 'মার্তন্ডোপাসনা' করেছিলেন। সমরেশ সেটিকে অবলম্বন করেই উপন্যাসের পরিকাঠামো তৈরি করলেও এখানে শাম্বকে প্রতিজ্ঞায়, ব্যক্তিত্বে, সেবায়, সাধনায় মহীয়ান করে তুলেছেন; ফলে পুরাণের শাম্বের চেয়ে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছেন।"[১০] আসলে ঔপন্যাসিক তাঁর চরিত্রের মধ্যে এই সমস্ত মাত্রাগুলিকে সংযুক্ত করেছেন আধুনিক মানস লক্ষণগুলিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। তিনি শাম্বকে এমনই এক আধুনিক মানুষ রূপে উপস্থাপিত করেছেন যিনি চিকিৎসকের এবং বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানবজীবন থেকে দূরারোগ্য ব্যাধির করাল অভিঘাতকে দূর করতে সাধনানিষ্ঠ। সূর্যবিজ্ঞান হল তাঁর সেই সাধনার মাধ্যম।

'শাম্ব' উপন্যাসের শুরুতেই সমরেশ বস্তুবাদী দৃষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় পুরাণবৃত্তের বিশ্লেষণ করার সূত্রে ইতিহাসের কিছু শাশ্বত সত্যকেও অনুসন্ধান করেছেন। তাই শাম্ব নগণ্য পুরাণপুরুষ হয়েও আলোচ্য উপন্যাসে এই কালের এক অপরাজেয় সংগ্রামী মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের 'অসূয়া অহংকার সম্ভোগেচ্ছা'র কথা জানতেন নারদ। শাম্বকে সম্ভবত তিনি রমণীমোহনের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে চলতেন। বহুদিনের আলাপে নারদ এই বিষয়টি অনুমান করতে পেরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব অসাধারণ রূপবাণ, আসঙ্গপ্রিয় এবং রমণীমনোহরণকারী। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে এসে নারদ দেখলেন শাম্ব যেন কিছুটা গর্বিত ও উদ্ধত। তিনি তাঁর গর্ব চূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন, 'তোমার যত সন্তান আছে, তার মধ্যে শাম্ব রূপে সকলের মন

আকৃষ্ট করেছে, এমনকিতোমার পত্নীদেরও।' শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করেনি। তারপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক পর্বতের উপবনে মদিরাপানে মত্ত হয়ে তাঁর মহিষীবৃন্দের সঙ্গে জলকেলি করছিলেন। সুযোগ সন্ধানী নারদ শাম্বকে জানালেন যে রৈবতক উপবনে পিতা তাঁকে ডাকছেন। শাম্ব উপবনে দেখা মাত্র মাতৃস্থানীয় জাম্ববতী, রুক্মিনী এবং সত্যভামা ছাড়া বাকি রমণীকূলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। উদ্ভিন্নযৌবনা নারীদের নির্লজ্জতায় অপমানিত হয়ে বজ্রপাতের মত শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হল ভয়ঙ্কর অভিশাপ— "শাম্বের অসামান্য রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হল। পুত্রকে তিনি অভিশম্পাত করলেন, তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।"

একই সঙ্গে তিনজন স্ত্রী ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত অন্যান্য রমণীরা যে তাঁর সম্মোহনের বদলে শাম্বের দ্বারা চালিত হয়েছেন এটা তিনি মেনে নিতে পারেন নি বলে আবার অভিসম্পাত করলেন— "তোমরা যেমন পণ্যাঙ্গনাদের ন্যায় ব্যবহার করেছ, আমার মৃত্যুর পরে, তোমরা তস্করের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবে।"[১২] স্বাভাবিক অবস্থায় এসে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপক্ষ সমর্থনে শাম্বের উদ্দেশ্যে বলেন— "যা ঘটে যায়, তা ভবিতব্য তা-ই অভিশাপরূপে উচ্চারিত হয়। তোমার জন্মলগ্নেই এই কুৎসিত ব্যাধি তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। আমি অতি ক্রোধে উচ্চারণ করেছি মাত্র। তোমার কোষ্ঠীর কাল অনুায়ায়ী, তোমার ব্যাধির প্রকটরূপ প্রকাশের সময় আসন্ন।"

শাম্বের মধ্যে এই যুক্তির পরিবর্তে মহাপুরুষ পিতার অভিশাপের কথা বেশি করে রয়ে গেছে আখ্যানের শেষভাগ পর্যন্ত। অভিশপ্ত শাম্ব দ্রুত ফিরে এসে দর্পণে আবিষ্কার করে তাঁর নাসা, কর্ণ, ভ্রূ ইত্যাদি স্থানে স্থানে স্ফীতিলাভ করেছে। অলঙ্ঘ্যনীয় অভিশাপে শাম্বের জীবন এরপর থেকে বইতে শুরু করে সম্পূর্ণ অন্য খাতে। সবথেকে শক্তিশালী রাজবংশের উত্তরাধিকারী শাম্বের সঙ্গে পথের ভিখারি শাম্বের দেখা হল। করুণ হলেও সেটাই বাস্তব। ব্যাধিগ্রস্ত শাম্বকে তাঁর নিজের রাজ্যের প্রহরীরা, আত্মীয়রা চিনতে পারেনি। যদুবংশের অতুলনীয় পুরুষটির শরীরে তখন কুষ্ঠরোগের পচন। তাঁর ঠাঁই হয়েছে সভ্যসমাজের বাইরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। দেবর্ষি নারদের উপদেশ মত শাম্বকে যেতে হবে সূর্যক্ষেত্রে। সূর্যদেবের উপাসনাতে আরোগ্য মিলবে শাম্বের।

ঔপন্যাসিক কালকূটের কাছে শাম্ব এক সংগ্রামী ব্যক্তি। আলোচ্য উপন্যাসে তিনি এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছেন কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হয়েও শাম্বের এই জীবনচর্চা বোধহয় দুর্লভ। আরোগ্যের জন্য তাঁর যে কষ্টসাধ্য কাজ এবং সর্বোপরি সমস্ত মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ

কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে। দ্বারকার উত্তর সমুদ্রতীর বরাবর উত্তরপূর্বে পঞ্চনদের দেশ পেরিয়ে চন্দ্রভাগা তীরে মিত্রবন (সূর্যক্ষেত্র)। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাম্ব অতিক্রম করেছেন আরোগ্যের আশায়। শাম্বের চলার পথে একের পর এক রাজত্ব, মানুষ, রীতিনীতির পরিচয় মেলে। কারণ ভারতের বেশিরভাগটাই বোধহয় তিনি ঘুরেছেন গোটা আখ্যান জুড়ে। এক বছর বিভিন্ন নদ-নদীতে স্নান ও সূর্যালোকের প্রভাবে ত্বকের রোগমুক্তির কথা শুনে প্রাচীন যুগের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানা যায়। নিশ্চিত ভাবে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংকেত পাওয়া যায় এই আখ্যানে।

'শাম্ব' উপন্যাসে শাম্ব ও শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা নয়, নেহাতই উচ্চবর্ণের মানুষ বলে মনে হয়েছে। কারণ দৈবকে চ্যালেঞ্জ করা বা রোখার ক্ষমতা তাদের নেই। নারদমুনিও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহুদর্শী, তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার উল্লেখ নেই। যদিও তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্য শাম্বের জীবনে অভিশাপ নেমে এসেছিল। বহু রমণীর কাঙ্ক্ষিত পুরুষ শাম্বকে কুষ্ঠরোগীর শিবিরে দেখে কষ্ট পায় পাঠক। মহাবীর শাম্বের অশ্বারোহনের ক্ষমতা নেই, অস্ত্রধারণের ক্ষমতা নেই— তাঁর সমস্ত শরীরে পচন ধরে গেছে। তাঁর Suffering দেখে পাঠক শিউরে ওঠেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর মনে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি কোনো অবিশ্বাস জন্মায় না, আত্মহননের চিন্তাও আসে না। শাম্ব মনে মনে বলেন, "আমার একটাই মাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত " এই কঠিন কথার তাড়নাতেই শাম্বের অন্তহীন পথচলা। নিয়তির কাছে সমর্পণ না করে অদম্য কর্মকাণ্ডের কারণেই বোধহয় শাম্ব অতুলনীয়।

পুরাণের অভিশাপকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক লেখকেরা তাদের সমকালীন যুগভাগ্য রচনা করেছেন। গ্রিক অভিশপ্ত সিসিকাস এযুগের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নৈরাশ্যপীড়িত মানুষে রূপান্তরিত। 'শাম্ব' উপন্যাস অভিশাপের ট্রাজেডি নয়, দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম এবং পরিণামে তার জয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কালকূটের কলমে রচিত হয়েছে পুরাণের নবনির্মিত আখ্যান।

তথ্যসূত্র :

১. মিথ সৃজনে মনস্তত্ত্ব, জয়ন্তী বসু, দোতারা, সম্পাদক কুন্তল মিত্র, পৃ-৩৬
২. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (১১ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৯৬, পৃ-১৩২
৩. মহাভারত কথা, বুদ্ধদেব বসু, সিগনেট প্রেস, মার্চ ২০২১, পৃ-১৩
৪. উপন্যাসের উজানে, রবীন পাল, সময় তোমাকে, সম্পাদক তাপসী দাস, ২০১৪-১৫, পৃ-৩৯

৫. ভারত প্রেমকথা, সুবোধ ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২২, ভূমিকা
৬. মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণী, ২০১৫, পৃ-১৮৮
৭. শাম্ব, সমরেশ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, ভূমিকা
৮. কালকূটের সাহিত্য সন্ধানে, শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, পৃ-১০৯
৯. পুরাণের নবজন্ম : কালকূটের উপন্যাস, তারক সরকার এবং জলার্ক, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ-৯১
১০. মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া, পৃ-১৯০
১১. শাম্ব, পৃ-৪৪
১২. তদেব
১৩. তদেব, পৃ-৪৬

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

আধুনিক জীবনশৈলীতে যোগাঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা

ড . অপূর্ব গঁরাই

সার : আধুনিক জীবনে নানা সমস্যার মধ্যে যোগাভ্যাস একটি অঙ্গ রূপে গৃহীত হতে চলেছে। শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শান্তির একমাত্র পথ যোগ এবং তার আটটি অঙ্গ। বর্তমানে মানুষ এতটাই জটিলতায় ঘিরে রয়েছে যে তার থেকে মুক্তি না পেলে সেই নৈসর্গিক শান্তিকে অনুভব করতে পারছে না। সকলেই এখন এই দানবীয় জগতে হিংসা, প্রতরণা, ঘৃণায় নিমজ্জিত। ভারতীয় প্রাচীন সনাতন চিন্তাধারা সর্বদাই বৈষয়িক সুখের তুলনায় নৈসর্গিক সুখকেই শ্রেয় রূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং তারই মার্গ অনুধাবনের প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিল। যোগাঙ্গ তারই একটি ব্যবহারিক রূপ। সকলপ্রকার দুঃখের মূল কারণ হল চিত্তবিকৃতি। চিত্ত প্রভাবিত হয় ইন্দিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুগ বিষয়ের দ্বারা। অতএব সুখলাভের উপায় হল ইন্দ্রিয় তথা চিত্তের সংযম। যা যোগের মাধ্যমেই পূর্ণরূপে সম্ভব এবং যাগোঙ্গাভ্যাসের মাধ্যমেই তার পূর্ণতা সম্ভব।

মূল শব্দ : যোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, মোক্ষ, অষ্টাঙ্গযোগ, বৃত্তি, যম, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি।

ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বৈজ্ঞানিক তথা আধ্যাত্মিক পন্থা হল যোগ। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি আদি সর্বত্রই যোগের উল্লেখ রয়েছে। যোগ শব্দ যুজ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ সমধি। শাস্ত্রে বিবিধ প্রকার যোগের বর্ণনা প্রাপ্ত হয়, যেমন— রাজযোগ, হঠযোগ, তাছাড়া গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ। সকল প্রকার যোগেরই পরম উদ্দেশ্য নৈসর্গিক শান্তি বা মোক্ষ। রাজযোগই হল পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গযোগ, যা সাংখ্যমীমাংসার সাথে তত্ত্বতঃ সম্বন্ধযুক্ত। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।[১]

অর্থাৎ, যোগ হল মানুষের চিত্তের যে পাঁচটি বৃত্তি (প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি) তার সম্পূর্ণ নিরোধ। বৃত্তির নিরোধ হলে চিত্ত অভীষ্ট বিষয়ে স্থির হবে, এই অভিষ্টবিষয়ে চিত্তস্থিরতাকেই যোগ বলে। যোগ হল সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিক বল। যথা মহাভারতে—

নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগ সমং বলম্।[২]

এখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা কিভাবে মানসিক বল উৎপন্ন হয় তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্যশক্তির দ্বারা অনেক দুরূহকার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হওয়া যায়। দূর্বলতা মূলত চিত্তের অস্থিরতা বা বৃত্তির প্রভাবেই হয়ে থাকে এবং এই যোগপ্রাপ্ত মানসিক বলের দ্বারাই সেই পরম লক্ষ্য পরমানন্দের প্রাপ্তিও সম্ভব।

বর্তমানে আধুনিকতার যুগে মানুষ অনেক সুযোগসুবিধা ভোগ করলেও নৈসর্গিক শান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন। এই একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি চরম শিখরে উত্তীর্ণ হয়েছে। মানবজাতি স্বার্থ, লোভ, হিংসায় নিমজ্জিত। একে অপরের প্রতি যে ঘৃণার বীজ বপিত হয়েছে তার ফল প্রতিনিয়ত দৃষ্ট হচ্ছে। যত্রতত্র হিংসার পরিস্থিতি সকলকে দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন করেছে। কিন্তু এই সংসারে সকলেই সুখ ও শান্তির কামনা করে। সংসারে যেকোনো মানুষই কর্ম করে তা ভালো হোক বা খারাপ, তার একটাই উদ্দেশ্য সুখপ্রাপ্তি। অবশ্যই কুকর্মের ফল কখনোই সুখকর হয় না, তা সকলের জ্ঞাত। আধুনিক সমাজে মানবীয় মূল্যবোধের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে, যার ফলস্বরূপ মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা। অর্থাৎ জীবনের পরম প্রাপ্তি নৈসর্গিক শান্তি প্রাপ্তিতে কেউই সক্ষম হচ্ছে না।

মানবসভ্যতার প্রারম্ভ লগ্ন থেকেই সনাতন ঋষিরা যোগকে জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে একাত্ম করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ পরমপ্রাপ্তিকে তারা উপলব্ধি করেছেন এবং তার পথও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানাকারে সুরক্ষিত করেছেন। যোগের দ্বারা সেই চরম লক্ষ্য নৈসর্গিক শান্তির প্রাপ্তি সম্ভব। যোগের অনুষ্ঠানের জন্য তার অঙ্গগুলি অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির অনুষ্ঠান আবশ্যক। এই আটটি অঙ্গকে যথাযথ অনুষ্ঠান করলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। মানুষমাত্রের কল্যাণের জন্য শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ আশীর্বাদস্বরূপ, যার দ্বারা জীবন সুখকর হতে পারে। যোগসূত্রে যোগাঙ্গ প্রসঙ্গে বলেছেন—

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি।[৩]

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই আটটিকে পতঞ্জলি যোগাঙ্গ রূপে বর্ণনা করেছেন, এই কারণে পাতঞ্জল যোগমীমাংসাকে অষ্টাঙ্গযোগ বলা হয়। এই যোগানুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হয় এবং তার ফলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্যন্ত জ্ঞান

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যোগাঙ্গ যোগপ্রাপ্তির সাধন। মহাভারতেও অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনা প্রাপ্ত হয়। যথা—

বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ।[৪]

হঠযোগে সাতপ্রকার অঙ্গের বর্ণনা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু রাজযোগ অর্থাৎ পাতঞ্জল যোগের অষ্টাঙ্গের গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনবিদিত। প্রতিটি অঙ্গ মানসিক ও শারীরিক শান্তিপ্রাপ্তিতে বর্তমানেও ততখানি গুরুত্বপূর্ণ।

যম—

অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম অঙ্গ হল যম। যমানুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং মনকে হিংসাদি অশুভ বিচার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মকেন্দ্রিক করা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি যম প্রসঙ্গে বলেছেন—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।[৫]

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি একত্রে যম।

অহিংসা—

অহিংসার অর্থ হল কোনো প্রাণীকে মন, বাক্য বা কর্মের দ্বারা কষ্ট না দেওয়া। শুধুমাত্র প্রাণীকুলের প্রতি পীড়া বর্জন করা নয়, অপিতু প্রাণীবর্গের প্রতি মৈত্রী এবং করুণার ভাব ব্যক্ত করাকেই অহিংসা বলে। ব্যাসভাষ্যে বলেছেন—

তত্রাহিংসা সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানামনভিদ্রোহ।[৬]

সর্বদা বাহ্যিক স্বার্থপরতা ত্যাগ না করলে প্রাণী হিংসা থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। বর্তমানকালেও মানুষের বাহ্যসুখের প্রতি অনুধাবনই হিংসার মূল কারণ। সেই কারণেই শাস্ত্রে সর্বত্রই অহিংসার উপদেশ প্রাপ্ত হয়—

অহিংসা পরমো ধর্মঃ।[৭]

মা হিংসাত্ সর্বভূতানি।[৮]

মহর্ষি পতঞ্জলি অহিংসার ফল বর্ণনা করেছেন—

অহিংসা প্রতিষ্ঠাযাং তত্সন্নিধৌ বৈরীত্যাগঃ।[৯]

অর্থাৎ অহিংসার দ্বারা নিকটস্থ সকল স্বাভাবিকবিরুদ্ধ প্রাণীদেরও বিরোধের নিবৃত্তি হয়। এই জন্য গান্ধীজী ও অহিংসার পথ অবলম্বন করে সম্পূর্ণ বিশ্বকে বাঁচার পথ নির্দেশ করেছিলেন।

সত্য—

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতব্য বাক্য বা চিন্তা যা শ্রোতার নিকট অর্থশূন্য না হয়ে সর্বভূতের কল্যাণকারী হয়, তাই সত্য। মন চঞ্চল এবং অলীক কল্পনার আধার বলে যথার্থ তাত্ত্বিক সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই যোগীরা অলীক কল্পনা থেকে বিরত থেকে সত্যানুষ্ঠানে ব্রতী হন। মন স্থির না হলে সত্য সাধন দুষ্কর। অহিতকর এবং অর্ধসত্য অপেক্ষা মৌনতা শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে ব্যাসভাষ্যে বলেছেন—

> এষা সর্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়।[১০]
>
> উপনিষদে উক্ত-সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।[১১]

সত্যসাধনের ফল প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেছেন—

> সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।[১২]

সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব গুণযুক্ত হয়। অর্থাৎ সত্যবাদীর কথা অখণ্ডিত হয়, শাপ আশীর্বাদের ন্যায়। সত্যবাদী যোগী কিছু বললে সত্যের দ্বারা স্থিরচিত্ত হওয়ার ফলে এবং বিশ্বাসের জোরে সত্যবাদী যোগীর উক্ত বিষয় বাস্তবায়িত হয়। তারা কখনোই এমন কোনো কথা বলবেন না যা চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব।

অস্তেয়—

অস্তেয় শব্দের অর্থ চুরি না করা। অন্যের বস্তুকে জিজ্ঞাসা না করে নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে গ্রহণ করাকে চুরি বা স্তেয় বলে। অর্থাৎ যা নিজের নয় তার প্রতি লোভ না করা এবং গ্রহণ না করাকেই অস্তেয় বলে। শ্রুতিবাক্যেও প্রাপ্ত হয়—

> মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্।[১৩]

অস্তেয়র ফলপ্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে যে, অস্তেয়ানুষ্ঠানকারী যোগীর অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হলে সকল রত্ন তার নিকট উপস্থিত হয়। এই রত্ন চেতন এবং অচেতন দুইই। যার অন্য বস্তুতে স্পৃহা নেই তার নিকট সকল উত্তম ব্যক্তি সকল উপস্থিত হন এবং অন্যেরাও তাকে উত্তম বস্তুতে ভূষিত করেন।

ব্রহ্মচর্য—

কামনা বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে এমন খাদ্যাদি, দৃশ্য শ্রব্য এবং শৃঙ্গারাদি পরিত্যাগ করে সর্বেন্দ্রিয় সংযত করে উপস্থ সংযমকেই ব্রহ্মচর্য বলে। ব্রহ্মচারীকে অব্রহ্মচর্যের বিষয় থেকে নিজেকে সংযত রেখে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোকে বশীভূত করতে হয়। ব্রহ্মচর্যবিহীন ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎকার অসম্ভব। শ্রুতিতে আছে—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।[১৪]

ব্রহ্মচর্যের ফল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।[১৫]

ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা হলে বীর্যলাভ হয়। ফলতঃ অবাধিত জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং তার ফলে শিষ্যহৃদয়ে জ্ঞানের উদয় করানো সম্ভব হয়।

অপরিগ্রহ—

বিষয়াসক্ত হলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষ করে মুমুক্ষুর বিষয় ত্যাগ এবং বিষয় অগ্রহণ তাকেই অপরিগ্রহ বলে। পরিগ্রহ শব্দের অর্থ সংগ্রহ করা। জীবনধারণের জন্য ন্যূনাতিন্যূন বিষয় ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হলেই সমাধি সম্ভব। সেইজন্য যোগীরা প্রথমে সর্বস্বত্যাগ করেন এবং পরে প্রাণধারণের অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করেন না। বর্তমানেও পরিগ্রহের জন্যই বিশ্বপরিমণ্ডল অশান্তি হিংসার আতুরঘর হয়ে উঠেছে। সকলের অধিকাধিক সংগ্রহের ইচ্ছার জন্য প্রকৃতি তথা প্রাণীকুল ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব অপরিগ্রহ সর্বদাই গ্রহণীয়।

নিয়ম—

যোগাঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ হল নিয়ম। নিয়ম প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেছেন—

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।[১৬]

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটি হল নিয়ম।

শৌচ শব্দের অর্থ হল শুদ্ধতা বা পবিত্রতা। যোগানুষ্ঠানের জন্য বাহ্য এবং অভ্যন্তর দুই শৌচেরই প্রয়োজন। মেধ্য বা পবিত্র আহার গ্রহণ, শরীর এবং আধারস্থান পবিত্র রেখে বাহ্য পবিত্রতা সম্ভব। মদ মানাদি রিপু প্রভৃতি মনের মলিনতা দূর করাই হল অভ্যন্তরীণ শৌচ। মনুস্মৃতিতে প্রাপ্ত হয়—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি।।[১৭]

শৌচের ফল প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন, নিজের দেহ শোধন করতে করতে ঘৃণা বা জুগুপ্সা উৎপন্ন হয়। ফলে সাংসারিক মায়া দূরীভূত হয় এবং এর দ্বারা বিষয়স্পৃহা ও ইন্দ্রিয় স্পৃহা শূন্য হয়। ফলে যোগী শরীরকে কেবলমাত্র সাধন রূপে ব্যবহার করে।

সন্তোষ—

ইষ্টপ্রাপ্তির যে আনন্দ তাই সন্তোষ। যে সাধন নিজের কাছে রয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট অন্যবস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা না করাকেই সন্তোষ বলে। সন্তোষের দ্বারা যে আত্মিক এবং মানসিক সুখ মানুষ প্রাপ্ত করে তা বৈষয়িক ধনরাশির দ্বারা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। পতঞ্জলিও সন্তোষের ফল প্রসঙ্গে বলেছেন—

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।[১৮]

তপঃ—

যে কর্মে আপাতদৃষ্টিতে সুখপ্রাপ্ত হয়, সেই সকল কর্মের নিরোধের প্রচেষ্টাকে তপ বলে। মহাভারতে যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— তপঃ স্বধর্মবর্তিত্বম্। অর্থাৎ নিজের কর্তব্য পালনে যে বাধাবিপত্তি উপস্থিত হয় তাদের উপেক্ষা করে স্বধর্ম পালনকেই তপ বলে। দ্বন্দ্ব সহন অর্থাৎ সমতা প্রাপ্তি করাই হল তপ।

তপ প্রতিষ্ঠা হলে অশুদ্ধি ক্ষয়ীভূত হয়ে কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্বাধ্যায়—

ভাষ্যকার স্বাধ্যায় প্রসঙ্গে বলেছেন— মোক্ষ শাস্ত্রাধ্যয়ণ অথবা প্রণব জপই হল স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের দ্বারা শাস্ত্রের প্রতি একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, ফলে অর্থজ্ঞান সরল হয়। মোক্ষশাস্ত্র পাঠের ফলে বৈষয়িক মায়া ক্ষীণ হয় এবং পরমার্থের প্রতি প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বরপ্রণিধান—

পরমগুরু পরমাত্মাতে সকল কর্মের অর্পণই হল ঈশ্বরপ্রণিধান। ভাষ্যে আছে—

তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্বকর্মার্পণম্।[১৯]

সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করতে হলে তা পবিত্র হতে হবে। ফলে ভক্ত সর্বদাই শারীরিক, মানসিক তথা আত্মিক ভাবে শুদ্ধ থেকে কর্মে লিপ্ত হবে ঈশ্বরার্পণ নিমিত্তে। ঈশ্বরপ্রণিধান থেকে সমাধি সিদ্ধি হয়। যমনিয়মাদি সাধন অন্যভাবে সমাধি প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়। কিন্তু ঈশ্বরপ্রণিধান সাক্ষাৎ সমাধির সাধন।

আসন—

যম এবং নিয়মের বর্ণনার পর তৃতীয় যোগাঙ্গ আসনের লক্ষণে বলা হয়েছে—

স্থিরসুখমাসনম্।[২০]

স্থিরভাবে সুখকর উপবেশনই হল আসন। যেমন— পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন,

দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পর্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন এবং সমসংস্থান এগুলিতে স্থির এবং সুখে বসাকেই আসন বলে। আসনে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয়। শ্বেতাশ্বেতরে আছে—

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্।[২১]

ধ্যানাদি উপাসনার জন্য আসনের অভ্যাস অত্যন্ত আবশ্যক। বর্তমানে যোগ বলতে মানুষ কেবল আসন প্রাণায়ামকেই বোঝে। কিন্তু এগুলি যোগের অঙ্গ মাত্র।

হঠযোগের বর্তমানে ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে নানাপ্রকারের আসনের বর্ণনা রয়েছে। ধ্যানাত্মক আসন ছাড়াও অনেক আসনের বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক আরোগ্যের প্রাপ্তি হয়।

প্রাণায়াম—

আসনের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হলে চতুর্থ যোগাঙ্গের অভ্যাস আবশ্যক। প্রাণায়াম প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেছেন—

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।[২২]

অর্থাৎ আসনে সমর্থ হলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদকে প্রাণায়াম বলে। স্বাভাবিক শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস ছাড়ার গতিতে পরিবর্তনই হল গতি বিচ্ছেদ। প্রাণায়াম মূলত ত্রিবিধ— বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। হঠযোগে আবার এদেরকে রেচক, পূরক ও কুম্ভক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যথাযথ প্রাণায়ামের ফল প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন—

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।[২৩]

এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানের দ্বারা অজ্ঞান ক্ষীণ হয়। মনু বলেছেন সন্ন্যাসীদের অনিচ্ছাকৃত হিংসার পাপ স্খলনের জন্য ছয়বার প্রাণায়ামের দ্বারা ক্লেশাদি এবং তার ফল রূপ দোষগুলোকে নষ্ট করা সম্ভব।

অহ্না রাত্র্যা চ যাজ্ঞন্তুন্থিনস্ত্যজ্ঞানতো যতিঃ।
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধার্থং প্রাণায়ামাষচরের।[২৪]

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্।[২৫]

প্রাণায়ামের দ্বারা আধ্যাত্মিক চিন্তনের ক্ষমতা উৎপন্ন হয় এবং চিত্তের অভীষ্ট বিষয়ে স্থাপন করা সম্ভবপর হয়।

বর্তমানে প্রাণায়ামের মাধ্যমে শারীরিক তথা মানসিক সুস্থতার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে

দেখা হচ্ছে। প্রায় সকলেই প্রাণায়ামের ফল বিষয়ে অবগত না হলেও প্রাণায়াম বিষয়ে অবগত। সম্পূর্ণ বিশ্বে প্রাণায়ামের মহিমা প্রসারিত হচ্ছে।

প্রত্যাহার—

বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিজ নিজ রূপ রসাদি বিষয়ের প্রতি সন্নিকর্ষ না হলেও চিত্তবৃত্তির অনুরূপ আকার যুক্ত হয়ে যায়। ফলে যখন সাধক অভ্যাস বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণে আনে তখন বিরক্ত মনের অধীন ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় ও মনের বিরক্ত ভাব বা অন্তর্মুখী হওয়া একেই প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহারের সহায়ক হল প্রাণায়াম। প্রত্যাহারের ফল প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।[২৬]

অর্থাৎ প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানের দ্বারা যোগী ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আসক্তিই মানুষকে স্বকর্ম থেকে বিচ্যুত করে। কিন্তু তার ফলে কখনোই কল্যাণকর হয় না। তাই প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় হলে চিত্তবিকৃত হয় না এবং স্ববিষয়ে নিয়োজিত থাকে।

ধারণা—

নাভিচক্র, হৃদয়পুণ্ডরীক, মূর্ধজ্যোতি, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র ইত্যাদি দেশে অথবা বাহ্য কোনো বিষয়ে চিত্তের যে একাগ্র হওয়া বা বন্ধ হওয়া তাকেই ধারণা বলে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা।[২৭]

প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং মনকে স্থূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে যখন সূক্ষ্ম পরমাত্মা আদিতে কেন্দ্রীভূত করা হয়, তাকেই ধারণা বলে। ধারণা হল ধ্যানের ভিত্তি স্বরূপ। ধারণার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হলে ধ্যানের পথ মসৃণ হয়।

ধ্যান—

ধ্যানের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।[২৮]

অর্থাৎ ধারণাকালে যে নাভিচক্রাদি দেশে চিত্তবৃত্তিকে বন্ধ করে। সেই দেশে চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা প্রাপ্ত হওয়াকেই ধ্যান বলে। ধ্যানের সময় পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বিষয় অনুভূত হয় না সেই পরমাত্মার স্বরূপেই নিমগ্ন হওয়াকেই ধ্যান বলে। ধারণাতে চিত্তবৃত্তি কেবল অভিষ্টবিষয়ে আবদ্ধ হয় কিন্তু সেখানে ধারাবাহিকতা থাকে না, অভ্যাসের দ্বারা একাগ্র হওয়াকে ধ্যান বলে। ধারণা জলের ধারার মতোই একতান নয় কিন্তু ধ্যান মধু বা তেলের

ধারার মতো একতান।

ধ্যান বিষয়টি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো কর্মে একাগ্র না হওয়া পর্যন্ত তার প্রাপ্তি সম্ভব নয়, তাই আমরা স্বভাবতই 'ধ্যান দিয়ে করো' ইত্যাদি প্রয়োগ করে থাকি। ধ্যানের আগে প্রাণায়াম করা আবশ্যক। কারণ মন শান্ত হয় ও স্থির মনেই ধারণা বা ধ্যান সম্ভব।

সমাধি—

যোগাঙ্গের মুখ্য অঙ্গ সমাধি হল ধ্যানেরই শ্রেষ্ঠ রূপ। সমাধির লক্ষণ হল—

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশুন্যমিব সমাধিঃ।[২৯]

পূর্বোক্ত ধ্যান যখন ধ্যেয় স্বরূপমাত্রের প্রকাশক হয়ে ধ্যানাকার রূপের শূন্যের মতো হয় তখন তাকে সমাধি বলে। যেমন জলের মধ্যে লবণ মেশালে লবণের উপস্থিতি থাকলেও লবণের জ্ঞান হয় না, কেবল জলের জ্ঞান হয়। সেভাবেই সমাধিকালে ধ্যান বিদ্যমান হলেও ধ্যেয় রূপ হয়ে যাওয়ায় ধ্যানরূপে ভাসিত না হয়ে কেবল ধ্যেয় রূপেই ভাসিত হয়। যখন ধ্যাতা ধ্যান করতে করতে ধ্যেয় বস্তুরই কেবল অনুভূতি হয়, ধ্যাতা বা ধ্যানের উপলব্ধি হয় না। ধ্যেয়বস্তুর এরকম চিত্তের স্থিরতাকেই সমাধি বলে।

এখানে মূল সমাধি বর্ণিত হয়নি। এটি একটি যোগের বা সমাধির অঙ্গমাত্র, যা মূল অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন। মূল সমাধিই হল যোগ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার হল বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হল অন্তরঙ্গ। অর্থাৎ প্রথম পাঁচটি ইন্দ্রিয়সংযমের সহায়ক এবং পরবর্তী তিনটি মন ও আত্মা মিলনের সাধন এবং মনের সংযমের সহায়ক। তাই ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে একত্রে সংযম বলা হয়—

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।[৩০]

উপরোক্ত এই আটটি যোগাঙ্গ যোগ বা সমাধির প্রমুখ সাধন। যার দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা ও শান্তি প্রাপ্তি সম্ভব। বর্তমানে মানুষ স্বার্থ, লোভ, ক্রোধাদিতে এতটাই নিমগ্ন যে তাদের মূল চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মরীচিকার মতো ভ্রান্ত বিষয়ের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। পাতঞ্জল যোগ এই মানুষদের জন্যই। যারা পরমসুখ প্রাপ্তিতে অক্ষম। যম নিয়মাদি মানুষের যে হিংসাদি মল রয়েছে তার থেকে সংযত হতে শেখায়। আসন ও প্রাণায়াম শরীর মনকে সুস্থ ও স্থির হতে সাহায্য করে। শরীর পবিত্র ও সুস্থ না হলে কোনো শুভ কর্ম করাই সম্ভব নয়। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।[৩১]

অর্থাৎ শরীরই হল ধর্মের প্রথম ও উত্তম সাধন। তাই শরীরকে সক্ষম ও সুস্থ রাখতে আসন ও প্রাণায়ামের বিকল্প নেই। যা আজ সম্পূর্ণ বিশ্ব স্বীকার করেছে। সংযুক্ত রাষ্ট্র মহাসভা ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একুশে জুন বিশ্ব যোগ দিবস রূপে স্বীকার করেন। যা ভারতীয়দের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। সম্পূর্ণ বিশ্ব ২০১৫ সাল থেকে একুশে জুন বিশ্ব যোগ দিবস হিসাবে পালন করছে।

প্রত্যাহারের দ্বারা লোভাদি থেকে মুক্তি হলে আন্তরিক আনন্দ বা সন্তুষ্টি প্রাপ্তি হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা মনের সংযম ও আধ্যাত্মিক সন্তুষ্ট প্রাপ্ত করা সম্ভব।

বর্তমানে হঠযোগের ব্যবহার বাড়ালেও তা মূলত পাতঞ্জল যোগমীমাংসারই ব্যবহারিক রূপ, যা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়টি মূলতঃ অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগেই প্রাপ্ত হয়। অতএব এটা বললে অত্যুক্তি হয় না যে বৈদিক কাল থেকে প্রচলিত এই যোগাঙ্গ বর্তমানেও মানুষের পরম সুখ প্রাপ্তির সাধন।

তথ্যসূত্র :

১. যোগসূত্র ১/২
২. শান্তিপর্ব
৩. যোগসূত্র ২/২৯
৪. শান্তিপর্ব ৩১৬/৭
৫. যোগসূত্র ২/৩০
৬. যোগসূত্র, ব্যাসভাষ্য ২/৩০
৭. অনুশাসনপর্ব অ. ১১৬
৮. অথর্ববেদ
৯. যোগসূত্র ২/৩৫
১০. যোগসূত্র, ব্যাসভাষ্য ২/৩০
১১. মুণ্ডক উপনিষদ
১২. যোগসূত্র ২/৩৬
১৩. ঈশোপনিষদ্
১৪. মুণ্ডকোপনিষদ ৩/১/৫
১৫. যোগসূত্র ২/৩৮

১৬. যোগসূত্র ২/৩২
১৭. মনুস্মৃতি ৫/১০৯
১৮. যোগসূত্র ২/৪২
১৯. যোগসূত্র, ব্যাসভাষ্য ২/৩২
২০. যোগসূত্র ২/৪৬
২১. শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ২/৮
২২. যোগসূত্র ২/৪৯
২৩. যোগসূত্র ২/৫২
২৪. মনুস্মৃতি
২৫. মনুস্মৃতি
২৬. যোগসূত্র ২/৫৫
২৭. যোগসূত্র ৩/১
২৮. যোগসূত্র ৩/২
২৯. যোগসূত্র ৩/৩
৩০. যোগসূত্র ৩/৪
৩১. কুমারসম্ভবম্

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. অরণ্য, হরিহরানন্দ— পাতঞ্জল যোগদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।
২. মুনি, ব্রহ্মলীন— পাতঞ্জল যোগদর্শন, চৌখম্ভা প্রকাশন, বারাণসী, ২০১০।
৩. মিশ্র, জগদীশচন্দ্র— ভারতীয় দর্শন, চৌখম্ভা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ২০০৮।
৪. ভট্ট, রামেশ্বর— মনুস্মৃতি, চৌখম্ভা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ২০১৫।
৫. ঘোষ, জগদীশচন্দ্র— শ্রীগীতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ২০০৩।
৬. ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৯।

শব্দতত্ত্বে পরমার্থপ্রসঙ্গ : শব্দাদ্বৈতবাদ ও ওঁকারব্রহ্মবাদে প্রপঞ্চ অতিক্রান্তির ধারণা

সুশোভন দে

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মানব জীবনের যে দুটি লক্ষ্যের কথা সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে, তা হল— অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয় হল প্রকৃত অর্থে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা বা সুখভোগ যা অর্থরূপ সম্পদের দ্বারা আনীত এবং ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে নিঃশ্রেয়স হল পরম কল্যাণ বা পরম শ্রেয় যা নির্দেশ করে পরম পুরুষার্থস্বরূপ মোক্ষ এবং এই মোক্ষলাভের জন্য অপরিহার্য ত্যাগের মনোভাব ও মোক্ষাভিমুখী উৎকৃষ্ট জীবনযাপন।

এই নিঃশ্রেয়সরূপ লক্ষ্যকে অবলম্বন করে ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে নানাবিধ সম্প্রদায় তথা দার্শনিক প্রস্থানের (এখানে 'প্রস্থান' শব্দের অর্থ— যার দ্বারা পরম সত্যের জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়) উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। এই সকল দার্শনিক প্রস্থানগুলি কেবল বৌদ্ধিক ও নৈতিক চর্চার মধ্যে নিজেদের আলোচনাকে সীমায়িত না রেখে দুঃখমুক্তিস্বরূপ পরম কল্যাণলাভের উপায় অনুসন্ধান ও তা ব্যক্ত করার মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছে। আর এই কারণেই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় আবির্ভূত ও বিকশিত হয়েছে নানাবিধ মোক্ষশাস্ত্র এবং মোক্ষমার্গ। এই সকল আধ্যাত্মিক প্রস্থানের অন্যতম হল অদ্বৈত-প্রস্থান, যার মধ্যেও আবার নানা মতবাদ দৃষ্ট হয়, যথা— আচার্য শঙ্কর ও তদনুগামী প্রচারিত ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ, আচার্য ভর্তৃহরি-সম্মত শব্দাদ্বৈতবাদ, আচার্য গৌড়পাদ প্রমুখ প্রাচীন সমর্থিত ওঁকারব্রহ্মবাদ, অভিনব গুপ্ত প্রমুখ কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ প্রবর্তিত শিবাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি।

এই সকল অদ্বৈতমূলক দার্শনিক প্রস্থনগুলির তত্ত্ব ও তত্ত্বব্যাখ্যান কৌশলের মধ্যে নানাবিধ তারতম্য দৃষ্ট হলেও এই সকল মতবাদগুলির প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার

করেছে যে, শব্দময়ী ভাষার দ্বারা যে শুধুমাত্র লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয়— তাই নয়। উচ্চারিত শব্দ বা বাক্যের কিংবা লিখিত শব্দের ক্রমিক সূক্ষ্মতা উপলব্ধির দ্বারা পরমতত্ত্বস্বরূপ অদ্বৈততত্ত্বের উন্মোচনও সম্ভবপর হয়। প্রকৃতপক্ষে যেমন শব্দজ্যোতির দীপ্তিতে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি শব্দের সূক্ষ্মরূপ সর্বপ্রপঞ্চের অন্তরালবর্তী ও প্রপঞ্চের সারভূত অদ্বৈততত্ত্বকে উপস্থাপন করে ব্রহ্মস্বরূপতাকে ব্যক্ত করেছে। এ বিষয়ে আচার্য ভর্তৃহরির বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।"[১]

অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশরহিত এবং অক্ষর যে ব্রহ্ম, তাই হল শব্দতত্ত্ব এবং এরূপ তত্ত্ব থেকেই অর্থরূপে জগৎপ্রক্রিয়া বিবর্তিত (প্রতীয়মান) হয়।

'শব্দ' কথাটির বিবিধ তাৎপর্য :

পূর্বোল্লিখিত শব্দতত্ত্বের আলোনচার প্রারম্ভে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত 'শব্দ' কথাটির কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টিদান একান্ত আবশ্যক। 'শব্দ' বলতে আমরা সাধারণভাবে যেমন মানুষের ব্যবহৃত শব্দকে বুঝি, তেমনি পাখির কাকলি, নদীর কলতান, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি, যানবাহনের শব্দ প্রভৃতিকেও বুঝে থাকি। ন্যায় দর্শন মতে যে-কোন ধ্বনিই শব্দ, যা আকাশের গুণ এবং অনিত্য, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল। যে-কোন শব্দ কোন প্রকার সংযোগ কিংবা বিভাগের দ্বারা আকাশে উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই বিলীন হয়ে যায়। জিহ্বার সাথে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগের ফলে যে অ-প্রভৃতি বর্ণউৎপন্ন হয়ে লিপিরূপে প্রযুক্ত হয়, সেগুলি সেই আকাশের গুণস্বরূপ শব্দের সংকেত রূপেই মানুষের ভাষারূপে প্রয়োগযোগ্য হয়। পূর্বমীমাংসামতে বর্ণই শব্দ— বর্ণসমূহ হল অর্থের বাচক। তবে মীমাংসকমতে এই বর্ণাত্মক শব্দ হল নিত্য বা উৎপত্তিবিনাশরহিত। অদ্বৈতবাদী শাব্দিক বা বৈয়াকরণগণ অবশ্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ কিংবা বর্ণাত্মক শব্দকে প্রকৃত শব্দরূপে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, প্রকৃত শব্দ হল ক্ষয়রহিত, উৎপত্তিবিনাশহীন, বিকার বা পরিবর্তনহীন ও সর্বব্যাপী যা 'স্ফোট' নামে চিহ্নিত। শাব্দিক আচার্যগণ বলেন যে, যা থেকে অর্থের অভিব্যক্তি হয় তাই হল স্ফোট। সুতরাং স্ফোট হল অর্থের বাচক নিত্য শব্দ। শাব্দিক মতে, এইরূপ নিত্য শব্দ উচ্চারিত কিংবা শ্রুয়মান শব্দ নয়, যাবতীয় শ্রুয়মান শব্দ হল ধ্বনি যা প্রকৃতপক্ষে স্ফোটের অভিব্যঞ্জক। কিন্তু ধ্বনি অভিধেয় অর্থের বোধক না হওয়ায় ধ্বনির অতিরিক্ত অথচ ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোটকেই শাব্দিকগণ শব্দের প্রকৃত রূপে বা শব্দতত্ত্বরূপে চিহ্নিত করেছেন।

আবার মান্ডূক্যোপনিষদ্ এবং মান্ডূক্য কারিকাকার আচার্য গৌড়পাদ প্রমুখ প্রাচীন অদ্বৈতীর দৃষ্টিতে ওঁকাররূপ শব্দ সর্বশব্দ, সর্বপ্রপঞ্চ এবং সর্বপ্রপঞ্চের সারস্বরূপ ব্রহ্মের বাচকরূপে শব্দতত্ত্বের মর্যাদায় আসীন। এই শব্দতত্ত্বে প্রকৃত শব্দ যে 'স্ফোট' নামে চিহ্নিত হয়েছে, তা নয়, তবে এইরূপ ওঁকার ব্রহ্মবাদ যে শব্দকে প্রকৃত শব্দরূপে তত্ত্বের মর্যাদা দিয়েছে তা স্ফোটের ন্যায় ধ্বনি বা বর্ণের (অ-উ-ম) দ্বারাই অভিব্যক্ত কিন্তু তত্ত্বতঃ ধ্বনি বা বর্ণের দ্বারা আবদ্ধ নয়। বর্তমানে আলোচনায় আমরা ধন্যাত্মক কিংবা বর্ণাত্মক শব্দের পরিবর্তে স্ফোটাত্মক কিংবা ওঁকারাত্মক শব্দকেই শব্দ বা বাক্‌রূপে গ্রহণ করব। কারণ, ধ্বনি কিংবা বর্ণের উচ্চারিতত্ব কিংবা লিখিততত্ত্বের দ্বারা যে-কোন জাগতিক বিষয়ই উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে মূলত যে সকল মতবাদগুলি আলোচনা করতে চাইছি, সেই মতবাদগুলির মূল্য বক্তব্য হল এই যে, সমগ্র জগৎ বৈচিত্র্যকে বা প্রপঞ্চকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বুঝতে হলে এবং জগতের মূল তত্ত্বে উপনীত হতে গেলে কোন না কোনভাবে জগতের বাইরে থাকা বা প্রপঞ্চ-অতিক্রান্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর শব্দতত্ত্বের সাহায্যে সেইরূপ প্রপঞ্চ-অতিক্রান্তি সম্ভব করতে চাইলে তা কেবলমাত্র জাগতিক বিষয়ের জ্ঞাপক বর্ণাত্মক কিংবা ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বারা সম্ভব নয়।

শব্দাদ্বৈতবাদে শব্দের তাত্ত্বিক পরিচয় :

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে শব্দের লৌকিক ব্যবহার থেকে শব্দ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মায় তার সাথে শব্দের তাত্ত্বিক রূপের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বিশেষত গৌড়পাদের ন্যায় প্রাচীন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক এবং শব্দৈদ্বৈতবাদীগণ শব্দের ব্যবহারিক বা লৌকিক তাৎপর্যকে শব্দ তত্ত্বরূপে মেনে নিতে পারেন না। তাই তাঁরা সাধারণতঃ শব্দ বা বাক্-কে চারটি স্তরে ভাগ করে শব্দতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। শাব্দিক সম্মত শব্দের এই চারটি স্তর হল— বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরাবাক্।

আমরা অহরহ যে সকল পদ বা বাক্য উচ্চারণ করে চলেছি এবং যা মুখের অভ্যন্তরে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত থেকে উৎপন্ন ও মুখনিঃসৃত হয়ে অন্যের শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তা হল বৈখরী বাক্। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন নির্দিষ্ট ভাষায় বিশেষ বিশেষ অভিধেয়কে নির্দেশ করতে গিয়ে যে প্রথাসিদ্ধ নাম বা শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকেই বৈখরী বাক্ বলা হয়। বাক্ বা শব্দের এই পর্যায়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে লব্ধ জগৎ এবং জাগতিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয় এবং লোকব্যবহার সম্ভব হয়।

এর থেকে সূক্ষ্ম হল মধ্যমা বাক্ যার উৎপত্তিস্থল হল হৃদয়দেশ বা বক্ষঃস্থল, বস্তুতঃ বৈখরী বাক্ প্রয়োগের পূর্বে বক্তার অন্তঃকরণে এবং বৈখরী বাক্ শ্রুত হওয়ার পর শ্রোতার অন্তঃকরণে যে বাক্ বা শব্দের প্রতিভাস হয় তা হল মধ্যমা। এই অবস্থায় শব্দ উচ্চারিত হয়

না। তবে উচ্চারণের পূর্বে বক্তার মনোভাব এবং উচ্চারণের পরে শ্রোতার মনোবৃত্তি এই মধ্যমাবাকের সহায়তায় বোঝা সম্ভব হয়। জড়, মূক প্রভৃতি ব্যক্তির এই মধ্যমা বাকের সহায়তায় নানাবিধ ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজের অভিপ্রেত অর্থকে প্রকাশ করেন। বস্তুত বক্তার অভিপ্রেত অর্থের জ্ঞানের হেতুই হল মধ্যমা বাক্।

আরও সূক্ষ্ম হল পশ্যন্তী বাক্। বাক্ বা শব্দের এই স্তর লোকব্যবহারের অতীত এবং এর স্থিতি হল নাভিপ্রদেশ। পশ্যন্তী বাক্ কেবলমাত্র বুদ্ধি ও মনের গোচর, কেবল যোগিগণ শব্দের এই স্তরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন এবং এর সহায়তায় বিশ্বের সকল বিষয়কে জানতে সক্ষম হন। পশ্যন্তী বাকের স্বরূপ সম্পর্কে এই মাত্র বলা যায় যে শব্দতত্ত্বের যে পর্যায়ে শব্দের সাথে অর্থের যোগ সম্পাদিত হয়, তাই হল পশ্যন্তী। সমস্ত প্রকার শাব্দিক বহিঃপ্রকাশের মূল বীজাকারে নিহিত থাকে এই পশ্যন্তী বাক্তত্ত্বে। যে-কোন স্থূল শব্দ উচ্চারণ কিংবা শ্রবণের সময় শব্দটি যে কোন না কোন পদার্থ বা অভিধেয়ের বাচক— এইরূপ অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori) জ্ঞানের ভিত্তিভূমিরূপে পশ্যন্তী বাকের স্থিতি বুদ্ধিস্থ হয়।

সূক্ষ্মতম শব্দ হল পরাবাক্ যা জীবের মূলচক্রে স্থিত এবং জ্যোতিস্বরূপ। শব্দতত্ত্বের এই স্তরটি বাক্য ও মনের আগোচর এবং একই সাথে বাচ্য ও বাচক উভয়ই। এই পরাবাক্ তত্ত্বকে অবলম্বন করেই শব্দাদ্বৈতবাদী, ওঁকারব্রহ্মবাদী, শৈবাগমের অনুগামী ও শাক্তাগমের অনুসারিগণ জগৎ অতিক্রান্তির ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তবে মহাবৈয়াকরণ আচার্য ভর্ত্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে (১/১৪২)[২] পশ্যন্তীকেই সূক্ষ্মতম বাক্ বা শব্দ বলেছেন। এখানে তিনি পশ্যন্তী বাক্ বা শব্দকেই পরাবাক্ রূপে উল্লেখ করেছেন। এই কারণে অনেক শাব্দিক আচার্য মনে করেন যে ভর্ত্তৃহরি পরাবাকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। কিন্তু পাণিনীয় আচার্যগণ বাক্ বা শব্দের চতুর্বিধ স্তরের কথাই স্বীকার করেছেন। মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে পতঞ্জলি চতুর্থ স্তরের বাক্ বা শব্দকেই মানুষের উচ্চারণযোগ্য রূপে উল্লেখ করেছেন এইভাবে— "তুরীয়ং বা এতদ্ বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ততে, চতুর্থমিত্যর্থঃ[৩]"।

শাব্দিক সম্মত চতুর্বিধ শব্দ বা বাক্ শ্রুতি থেকে শুরু করে বহু স্থলেই উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।[৪]"

অর্থাৎ সমগ্র বাক্ চতুর্ভাগে পরিমিত বা বিভক্ত। যাঁরা পণ্ডিত এবং বেদজ্ঞ তাঁরাই বাকের এই স্বরূপ জানেন। এর তিনটি স্তর বা পর্যায় গুহাতে নিহিত আছে, এজন্য সেই তিনটি স্তর

ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয় না। মানুষ কেবল চতুর্থ স্তরের বাকের দ্বারা লোকব্যবহার সম্পন্ন করে। আচার্য পতঞ্জলি উক্তরূপ বেদমন্ত্র থেকেই বাকের চতুর্বিধত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজ বৈয়াকরণ মত উপস্থাপন করেছেন।

যাইহোক, পরাবাক রূপ শব্দতত্ত্ব পশ্যন্তী বাকের সঙ্গে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন— এ বিষয়ে শাব্দিকদের মধ্যে কিছুটা মতদ্বৈধতা থাকলেও যে জগৎ প্রপঞ্চকে তাঁরা শব্দাত্মক বলেছেন, সেই জগৎ প্রপঞ্চের সারসত্য বা শব্দব্রহ্ম যে বৈখরী কিংবা মধ্যমাবাক্ নয়, তা বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। শাব্দিক বা শব্দৈদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত এই শব্দব্রহ্মবাদের সমর্থন শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে শব্দব্রহ্মের তত্ত্ব স্বীকার করে বলা হয়েছে—

"বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম" (বৃঃউঃ ১/৩/২১)[৫] অর্থাৎ, বাক্ বা শব্দই ব্রহ্ম।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ এবং মাণ্ডুক্যকারিকায় ওঁকাররূপ শব্দতত্ত্বের পরিচয়:

শব্দতত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিভিন্ন উপনিষদে আমরা এর প্রমাণ পাই। তবে শব্দতত্ত্বের দ্বারা প্রপঞ্চ অতিক্রান্তি এবং ব্রহ্মতত্ত্বের উন্মোচনের আমরা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি— মাণ্ডুক্যোপনিষদে এবং প্রাচীন অদ্বৈতবাদী আচার্য গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডুক্যকারিকায়। মাণ্ডুক্যোপনিষদে ওঁ-কারকে সর্বাত্মক বলা হয়েছে— "ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্।"[৬] অর্থাৎ, এই সমস্তই (সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চ) 'ওঁম্'-এই অক্ষরাত্মক। উপনিষদে উল্লিখিত ওঁম শব্দটি 'অ', 'উ' এবং 'ম' এই তিনটি বর্ণের দ্বারা গঠিত একটি অক্ষর। এই এক অক্ষর উপনিষদীয় অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের বাচক। এই আত্মা বা ব্রহ্ম নিত্য, অদ্বৈত, সর্বব্যাপী এবং সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যে অন্তর্নিহিত ও একমাত্র সত্য। এরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা সর্বব্যাপী হলেও ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে 'চতুষ্পাদ' বলা হয়েছে। এই চতুষ্পাদ বা চারটি পাদ হল— বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও চতুর্থ বা তুরীয়। 'পাদ' শব্দটি করণ অর্থে 'পদ্যতে যেন' অর্থাৎ 'যার দ্বারা পাওয়া যায়' এবং 'পদ্যতে যঃ' অর্থাৎ 'যা পাওয়া যায়'—এই উভয় রূপ অর্থেই নিষ্পন্ন হয়। করণ অর্থে 'পাদ' শব্দটি বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং ভাবার্থে 'পাদ' শব্দটি তুরীয় আত্মাকে নির্দেশ করে। তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ— এই তিনটি পাদের মধ্যে একে একে প্রতিটির অসত্যতা প্রতিপাদনের দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব হয়। 'ওঁম্' শব্দের অন্তর্গত 'অ', 'উ' এবং 'ম'—এই তিন বর্ণ যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ— এই তিন পাদের জ্ঞাপক। ওঁকার-এর উপর যে চন্দ্রবিন্দু (নাদ ও বিন্দু) থাকে তা মায়া উপহিত চৈতন্য বা অপর ব্রহ্ম এবং অনুপহিত চৈতন্য বা তুরীয় পরব্রহ্মকে নির্দেশ করে।

পরব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে পাদ ও মাত্রাহীন এবং নিষ্ফল (কলা বা অংশবিহীন)। এরূপ ব্রহ্মচৈতন্যকে কোন প্রকার স্থূল শব্দের দ্বারা যথার্থরূপে জ্ঞাপন করা সম্ভব হয় না বলে অনেকসময় এই পরমতত্ত্বকে কেবল 'চতুর্থ' বলে উল্লেখ করা হয়। পূর্বোক্ত চারটি পাদ মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ও গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডুক্যকারিকা অবলম্বনে সংক্ষেপে আলোচিত হল—

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ কথিত আত্মা বা ব্রহ্মের প্রথম পাদ ব্যষ্টিদৃষ্টিতে বিশ্ব এবং সমষ্টিদৃষ্টিতে বৈশ্বানর (আত্মা স্বরূপতঃ এক হলেও নানা দেহের প্রতিভাসবশতঃ এক আত্মাতে নানাত্বের প্রতিভাস হয়। এখানেই ব্যষ্টিদৃষ্টি ও সমষ্টিদৃষ্টির পার্থক্য, তত্ত্বতঃ বিশ্ব ও বৈশ্বানরের মধ্যে কোন পার্থ্যক নেই। অন্যান্য পাদের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য। পঞ্চীকৃত পৃথিবী, জল, তেজ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের দ্বারা যে জীবশরীর গঠিত, যে জীব বাহ্য বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন এবং বাহ্যবিষয় থেকে প্রাপ্ত স্থূল সুখ-দুঃখের ভোক্তা সেইরূপ জীবকে বিশ্ব বলা হয়েছে। আত্মার এই পাদ জীবের জাগ্রত অবস্থার দ্যোতক। কারণ, জাগ্রৎ কালে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের বাহ্য বিষয়ের অনুভব ও বাহ্য বা স্থূল বিষয়ের ভোগ (সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎ কারকে ভোগ বলা হয়) সম্ভব হয়। ওঁকারতত্ত্বের বর্ণনায় এই বিশ্ব বা বৈশ্বানর 'ওঁম'-এর প্রথম মাত্রা (letter) অ-কারের সাথে অভিন্ন।

ব্রহ্মাত্মার দ্বিতীয় পাদ ব্যষ্টিদৃষ্টিতে তৈজস এবং সমষ্টিদৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান), মন ও বুদ্ধি— এই সতেরোটি অঙ্গ নিয়ে গঠিত যে সূক্ষ্ম জীব-শরীর, সেই জীবকে তৈজস কিংবা হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। এইরূপ জীব স্থূল ও বাহ্য বিষয়ের পরিবর্তে সূক্ষ্ম বিষয়ের (বাসনা-সংস্কার) অনুভূতিসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোক্তা। আত্মার এই পাদ জীবের স্বপ্ন অবস্থার দ্যোতক। তাৎপর্য এই যে, জাগ্রৎ কালে স্থূল বা বাহ্য বিষয় ভোগ করার পর যখন নিদ্রা আসে তখন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হয়, কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয় হতে প্রাপ্ত বিষয়ের অনুভব দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারের উদ্বোধন হয় যার ফলশ্রুতি হল স্বপ্ন। এই স্বপ্নাবস্থায় জীবের স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরে লীন হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা স্বপ্নাবস্থ জীব সংস্কাররূপ আন্তর বিষয়ের ভোক্তা হয় বলে এইরূপ জীবকে 'অন্তঃপ্রজ্ঞ' বলা হয়। এই অবস্থায় জীব মন ও বুদ্ধিরূপ তেজোময় অন্তঃকরণের দ্বারা উপহিত থাকে। তাই একে 'তৈজস' বলা হয়। ব্রহ্মের বাচক শব্দ ওঁকারের দৃষ্টিতে তৈজস এবং উ-কার উভয়েই মধ্যবর্তী হওয়ায় স্বপ্নাবস্থা এবং তৈজস (স্বাপ্নিক) জীব ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা উ-কারের সাথে অভিন্ন।

আত্মার তৃতীয় পাদ হল ব্যষ্টিদৃষ্টিতে প্রাজ্ঞ এবং সমষ্টিদৃষ্টিতে ঈশ্বর। অদ্বৈতমতে জীবের কেবল স্থূল শরীর কিংবা সূক্ষ্ম শরীর থাকে— তা-ই নয়। আরও একটি জীবশরীর

বিদ্যমান, যাকে বলা যায় কারণশরীর। এই কারণশরীরের একটিই অবয়ব বা অঙ্গ, আর তা হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানরূপ কারণশরীরের দ্বারা গঠিত জীবকে ব্যষ্টিদৃষ্টিতে প্রাজ্ঞ ও সমষ্টি দৃষ্টিতে ঈশ্বর বলা হয়। ব্রহ্মাত্মার এই পাদ জীবের সুষুপ্তি (স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা) অবস্থার সূচক। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় জীব যথাক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোগের দ্বারা পরিশ্রান্ত হলে জীবের স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে লীন হয়। এই অবস্থায় জীব কোন বাহ্য কিংবা আন্তর বিষয়ের জ্ঞাতা হয় না। ফলত সুষুপ্তিকাল হল জীবের বিশ্রাম স্থান। অবশ্য এই অবস্থায় জীবের কোন প্রকার বোধ বা জ্ঞান থাকে না— এমন নয়। যেমন সূর্য মেঘে ঢাকা পড়লেও তার কিছুটা আলো সর্বদাই ধরা পড়ে, তেমনি সুষুপ্তির অবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ হলেও তার 'কিছু না জানার' একটা বোধ এবং এক ধরণের সুখানুভূতি তখনও জাগ্রত থাকে। সুষুপ্তি ভঙ্গের পরে সুষুপ্তিকালীন অভিজ্ঞতার 'আমি এতক্ষণ সুখে নিদ্রিত ছিলাম এবং আমি এতক্ষণ কিছুই জানতে পারিনি'— এইরূপ স্মরণই সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের বোধের প্রতি প্রমাণ। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে সুষুপ্তির অবস্থায় অজ্ঞানের কার্যভূত যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় অজ্ঞানে লীন হয়, কেবল মূলীভূত অজ্ঞান উদিত থাকে। এই অবস্থায় জীবের একপ্রকার তামসিক আনন্দ বা সুখের অনুভূতিও থাকে। এই আনন্দ বা সুখ ব্রহ্মানন্দের সাথে তুলনীয় নয়, তবে সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের কার্যস্বরূপ প্রপঞ্চের লয় হওয়ায় এ সময় ব্রহ্মানন্দের বা তুরীয়কালীন আনন্দের সামান্যতম স্ফুরণ অনুভূত হয়। এইরূপ আনন্দের ভোক্তা এবং প্রপঞ্চ-হিত অজ্ঞানের জ্ঞাতারূপী সুষুপ্তিকালীন জীবকে ব্যষ্টিদৃষ্টিতে 'প্রাজ্ঞ' বলা হয়। আর সমষ্টি দৃষ্টিতে এই অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত ব্রহ্মচৈতন্য জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা রূপে ঈশ্বর নামে পরিচিত হন। ওঁকার ব্রহ্মবাদীর দৃষ্টিতে ওঁকারের অ-কার ও উ-কার ম-কারে লীন হয়। তাই ম-কারকে প্রাজ্ঞ জীবের সাথে অভিন্ন রূপে গ্রহণ করতে হবে।

আত্মাবরক অজ্ঞান তিরোহিত হলে ওঁকার স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে এবং সেই স্পন্দনহীন ওঁকার ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ (প্রকৃত অর্থে পাদ নয়) বা তুরীয় অবস্থাকে নির্দেশ করে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ— এই ত্রিবিধ শরীরের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই চতুর্থ বা তুরীয় চৈতন্য বলা যায়। যেহেতু চৈতন্যের এইরূপ স্থিতিতে বাহ্য কিংবা আন্তর— কোন বিষয়েরই ভোগ হয় না, সেহেতু তুরীয় চৈতন্যের কোন প্রকার শরীর (ভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান) চিন্তিত হয় না। এই তুরীয় চৈতন্য বিশ্ব বা জাগ্রৎ নয়, স্বপ্ন বা তৈজস নয়, সুষুপ্তি বা প্রাজ্ঞও নয়। তুরীয় এই সব কিছুরই অন্তঃস্যূত অথচ সর্ব প্রপঞ্চের অতিক্রান্ত বিরামস্বরূপ শান্ত, মঙ্গলস্বরূপ ও অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই পর্যবসিত হয়। এই তুরীয়স্বরূপ ওঁকার বা পরমাত্মায় প্রকৃত অর্থে কোন পাদ বা মাত্রা নেই। কেবল বদ্ধ জীবের কাছে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদানের অভিপ্রায়ে তুরীয় চৈতন্যকে 'চতুর্থ পাদ' কিংবা 'চতুর্থ' রূপে উল্লেখ করা হয়।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ অনুসারে যিনি এইরূপে ওঁকারের ব্রহ্মাত্মস্বরূপতা উপলব্ধি করেন তিনি পরমাত্মায় লীন হয়ে যান এবং সর্বপ্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চের মূলস্বরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তিতে তাঁর সকল প্রকার দুঃখ, জন্মবন্ধন ও কর্মবন্ধনের নাশ হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধ হয় যে এক আত্মা বা ব্রহ্মাই অবস্থাভেদে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় নামে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য, জগৎ প্রপঞ্চ এবং জাগতিক দৃশ্য পদার্থসমূহের কোন বাস্তব সত্তা নেই। ওঁকার উপাসনার মধ্য দিয়ে কিংবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ— এই তিনটি পাদের ক্রমিক মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের মধ্য দিয়ে তুরীয়স্বরূপ ব্রহ্মাত্মার উপলব্ধি সম্ভব হয়।

শব্দাদ্বৈতবাদ ও ওঁকারব্রহ্মবাদের সম্মিলন : ওঁকারস্ফোটতত্ত্ব :

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ও মাণ্ডুক্যকারিকা অবলম্বনে ওঁকারব্রহ্মবাদী যেভাবে সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চকে ওঁকাররূপ শব্দাত্মক বলে ঘোষণা করেছেন এবং সেই ওঁকারের বিভিন্ন পাদ ও মাত্রার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ও অদ্বৈত ব্রহ্মের সত্যতা প্রতিপাদনের প্রয়াসী হয়েছেন, সেইরূপ আচার্য ভর্তৃহরি প্রমুখ অদ্বৈতবাদী শাব্দিকগণ তাঁদের শব্দতত্ত্বের দ্বারা জগৎ প্রপঞ্চের শব্দাত্মকত্ব এবং শব্দের ক্রমিক সূক্ষ্মতার উপলব্ধির দ্বারা জগৎ-মিথ্যাত্ব ও জগৎ অতিক্রান্তির ধারণা ব্যক্ত করেছেন। উভয় মতবাদের সম্মিলনস্বরূপ আমরা যে মতবাদ পাই তার মূল বক্তব্য হল— নাম (যে-কোন ভাষায় যে-কোন বিষয়ক বাচক শব্দ) এবং নামী (অভিধেয় অর্থ বা বাচ্য) পরস্পর অভিন্ন। ওঁকার হল আত্মা বা ব্রহ্মবস্তুর বাচক, তাই ওঁকার ব্রহ্মাত্মার সাথে অভিন্ন। এই মতবাদকে পারিভাষিকভাবে 'ওঁকারস্ফোটতত্ত্ব' নামে চিহ্নিত করা যায়।

শব্দাদ্বৈতবাদসম্মত পূর্বোক্ত চার প্রকার বাক্ বা শব্দ (বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরাবাক্) জীবচৈতন্যের চার প্রকার অবস্থার উপস্থাপক— জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। ওঁকারের চারটি মাত্রা 'অ', 'উ', 'ম' এবং নাদবিন্দু যথাক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় চৈতন্যের প্রতীক। জাগ্রদবস্থা ব্যবহারিক জগৎকে নির্দেশ করে। আর ব্যবহারিক জগতের যে-কোন বিষয়ের নাম প্রকাশক শব্দই হল বৈখরী বাক্। স্বপ্নকালীন অবস্থা ব্যবহারিক জগৎ বা জাগ্রদবস্থায় অর্জিত ও সঞ্চিত নানা সংস্কারের প্রতিমূর্তি বা আকার। একইভাবে মধ্যমা বাক্ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জগতের বিষয়াকারের প্রকাশক প্রতীক। এই বিষয়াকারকে কোনভাবেই ব্যবহারিক জগতের বাহ্য বিষয় বলা যায় না। আবার এগুলি বাহ্য বিষয়ের সাথে একেবারে সম্বন্ধ রহিত নয়। অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য এইরূপ বিষয়াকারগুলিকে কান্টীয় ক্যাটাগরিসের সাথে সমতুল রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এগুলির প্রকাশক শব্দকে (মধ্যমা বাক্) Syntax বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] স্বপ্নাবস্থার থেকে

সূক্ষ্মতর সুষুপ্তির অবস্থার প্রতীক হল পশ্যন্তী বাক্ যা মধ্যমা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। মধ্যমা বাকে বাহ্য বিষয় প্রকাশিত হয় না বটে, কিন্তু মধ্যমা বাহ্য বিষয়ের আকার প্রকাশক। তাই মধ্যমা বাক্ সূক্ষ্ম হলেও তা বাহ্য বিষয়ের চিন্তনপ্রসারী ও মূর্ত। কিন্তু পশ্যন্তী বাক্ বাহ্য কিংবা আন্তর বিষয় অথবা বিষয়াকারের প্রকাশক নয়, কেবল প্রতিটি শব্দের সাথে প্রতিটি অর্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বোধক এবং বিষয় মহাসামান্যের প্রকাশক। পশ্যন্তীর ঊর্ধ্বে আছে পরাবাক্। এরূপ বাকের কোন বহির্মুখিতা থাকে না। কোন বিষয়, বিষয়াকার কিংবা বিষয়-মহাসামান্য এরূপ শব্দের দ্বারা উপস্থাপিত হয় না। পরাবাকের পর্যায়েই নাম এবং নামী (শব্দ এবং অর্থ) তথা ওঁকার এবং কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ তুরীয় চৈতন্য পরস্পর অভিন্নরূপে উপলব্ধ হয়।

অদ্বৈতমূলক ওঁকারস্ফোটতত্ত্বে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিভাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা প্রথমে নিজেকে 'অহং' রূপে উপস্থাপন করলেন। এই 'অহং' রূপে পরমাত্মার উপস্থাপনই হল পরাবাক্ বা শব্দব্রহ্ম। তারপর এই 'অহং'-এর প্রাথমিক স্পন্দন দ্বারা উপস্থাপিত হল 'ইদং'। এরই নাম পশ্যন্তী, যা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জাগতিক বিষয়ের মূলীভূত বীজস্বরূপ বিষয়— মহাসামান্য (object in general)। এরপর উপস্থিত হল মধ্যমারূপে যাবতীয় বিষয়াকার এবং তার থেকে বিবর্তিত হল বাচ্যরূপে স্থূল বা বাহ্য বিষয়সমূহ এবং ঐ সকল স্থূল বিষয়সমূহের প্রকাশরূপে স্থূল বৈখরী শব্দ। অদ্বৈতীর দৃষ্টিতে এইরূপ জগতের সৃষ্টি ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল সৃষ্টির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হলেও তা তত্ত্বতঃ মিথ্যা। অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ বা যাবতীয় দৃষ্ট জাগতিক বস্তুর তুরীয় ব্রহ্মাত্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কিন্তু অজ্ঞানাবদ্ধ জীব জগৎপ্রপঞ্চ তথা জাগতিক বস্তু সমূহ ও অত্যন্ত স্থূল বৈখরী বাকের প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট থাকে। ফলে সেইরূপ জীব জন্মবন্ধন, কর্মবন্ধন ও নানাবিধ দুঃখের ভারে নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু বিবেকজ্ঞানসমন্বিত মুমুক্ষুর দৃষ্টিতে জাগতিক ভোগ্য বিষয় এবং ভোগ কখনই চিরন্তন সত্য হয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জু নামক অধিষ্ঠান থেকেই সর্পের উৎপত্তি বা প্রতিভাস, আবার ভ্রমের অবসানে রজ্জুতেই সর্প বিলীন হয়ে যায়। একইভাবে বিবেকীর কাছে সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যের ভ্রমীয় প্রকাশ এবং ভ্রমের অবসানে সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ সেই ব্রহ্মচৈতন্যেই লীন হয়ে যায়।

ওঁকার স্ফোটবাদী বলেন, শব্দের তাত্ত্বিক রূপটি ব্রহ্মস্বরূপ। এই মূলীভূত শব্দব্রহ্ম থেকে বাচ্য অর্থ এবং বাচক শব্দ দুটি ভিন্ন রূপে বিবর্তিত হয়। ক্রমশঃ স্থূল শব্দ থেকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর শব্দের মননের মধ্য দিয়ে শব্দব্রহ্ম বুদ্ধিগোচর হয় এবং তখন নাম এবং নামী বা বাচক (শব্দ) ও বাচ্য (অর্থ)— এতদুভয়ের মধ্যে অভিন্নতার উপলব্ধি হয়।

ওঁকারস্ফোটতত্ত্বের এইরূপ বাহ্য বিষয় ও তৎপ্রকাশক স্থূল শব্দ থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম

বিষয় ও তৎপ্রকাশক সূক্ষ্ম শব্দের প্রতি চিত্তের অভিমুখীনতা এবং জগৎ অতিক্রান্তির প্রচেষ্টা কি জগৎ বিমুখতাকে নির্দেশ করে ?— এরূপ একটি প্রশ্ন সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থিত হতেই পারে। এর উত্তরে বলা যায়, উক্তরূপ অদ্বৈততত্ত্বে উল্লিখিত অন্তর্মুখিনতা এবং জগৎ-বিমুখতা এক নয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্যের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়— "যে বিশুদ্ধ চিৎ বিষয়রাজি থেকে নিজেকে ক্রমশঃ গুটিয়ে নিচ্ছে সে তো বিষয় জগতের দিকে দৃষ্টি রেখেই পিছু হটছে।"[৮] তাৎপর্য এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি যখন পরমতত্ত্বের উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হতে চান তখন তাঁকে আত্মনিবিষ্ট এবং বাইরের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হয়। কিন্তু এইরূপ আত্মমুখী বা চিৎমুখী হওয়ার ব্যাপারটি একবারে সম্ভব হয় না। তাই অদ্বৈতী ক্রমশঃ চিত্তকে আত্মনিবিষ্ট করার কথা বলেছেন যা প্রকৃতপক্ষে জগতের দিকে দৃষ্টি রেখেই ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করে নেওয়াকেই নির্দেশ করে। এইভাবে নিজ চিত্তকে ক্রমশঃ বাহ্য ও স্থূল বিষয় এবং স্থূল বিষয়ের বাচক স্থূল শব্দ থেকে ক্রমশঃ নিবৃত্ত করে আত্মবিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট করতে পারলেই সেই চিত্ত স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় শুদ্ধ ও সংস্কৃত হয়ে পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই প্রযোজক হয়।

নাম (শব্দ) ও নামীর (অর্থের) অভিন্নতা-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর :

ওঁকারস্ফোটের আলোচনায় যেভাবে ওঁকাররূপ শব্দের প্রপঞ্চাত্মকত্ব ও শব্দের ব্রহ্মাত্মকত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে, তার দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে— ওঁকার কিংবা অন্য যে-কোন ব্রহ্মবাচক শব্দ এবং ব্রহ্ম— এতদুভয়ের মধ্যে ঐক্য বা একীভাব সম্ভব হয় কোন যুক্তিতে ? ব্যবহারিক জগতে তো কোন নাম (শব্দ বা বাক্) এবং নামী (অর্থ বা অভিধেয়)-এর মধ্যে ঐক্য বা একীভাবের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতী বলেন, বাহ্যজগতে যখনই কোন বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই সেই বস্তু এবং বস্তুজ্ঞান প্রকাশক শব্দ বা বাক্ পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত থাকে। অর্থাৎ, জগতের সকল পদার্থই শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ (গভীরভাবে সন্নিবিষ্ট)। যেমন— একটি ঘটের প্রত্যক্ষ দ্বারা অনুবিদ্ধ (গভীরভাবে সন্নিবিষ্ট)। যেমন— একটি ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলে আমরা মনে মনে কিংবা উচ্চারণের দ্বারা 'এটি ঘট' বলে থাকি। এইভাবে সকল ব্যবহারিক বিষয়ের জ্ঞানের সাথে শব্দকে সর্বদা এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে জানতে পারার ফলে জগৎ শব্দাত্মক কিংবা ব্রহ্ম ওঁকারাত্মক— এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাছাড়া, ওঁকারাত্মক শব্দ এবং ব্রহ্ম— যে অভিন্ন সে বিষয়ে সাধনমার্গে বলা হয়েছে— ওঁকার প্রভৃতি শব্দ হল উপাসনার মাধ্যম। ওঁকারকে 'প্রণব'ও বলা হয়। যার দ্বারা প্রকৃষ্টতম স্তব ও প্রণাম সম্ভব হয় তাকেই 'প্রণব' বলা হয় এবং এর অপর নাম হল ওঁকার। এই প্রণবরূপ নাম ও ব্রহ্মরূপ নামীর ঐক্যের প্রতি

আস্থা রেখে দৃঢ় রূপে মনন করলে কিংবা মন্ত্র জপ করলে পরব্রহ্মকেই লাভ করা যায়। সুতরাং ওঁকার এবং ব্রহ্ম পরস্পর অভিন্ন।

ওঁকারস্ফোটতত্ত্বের পক্ষে প্রদত্ত এই যুক্তি খুব শক্তিশালী নয়। কারণ, আমরা যেমন ঘট ও ঘটত্বকে একে অন্যের সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে পেলেও এ দুটিকে এক বলি না, তেমনি শব্দ ও ব্রহ্ম এতদুভয়কে পরস্পর অন্বিতভাবে পাওয়া গেলেও এদের পারস্পরিক অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আচার্য শঙ্কর বেদান্তসূত্রের শারীরক ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ওঁকারস্ফোটবাদ নিরাকরণ করেছেন।[৯] এ বিষয়ে তাঁর প্রধান বক্তব্য হল— ওঁকার হল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। ব্রহ্ম হলেন উপেয়। উপায় এবং উপেয়ের স্বরূপের বিভিন্নতাবশতঃ ওঁকারাত্মক শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ হতে পারে না। বস্তুতঃ ওঁকারের উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধন বলেই শ্রুতিতে 'এই সমস্তই ওঁকার'—এইরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানসাধন ওঁকারের স্তুতি বা প্রশংসার নিমিত্তই ওঁকারের সর্বাত্মকত্ব ও ব্রহ্মাত্মকত্ব বর্ণিত হয়েছে। তবে ভগবৎপাদ আচার্য শঙ্কর উক্ত প্রকারে ওঁকারের ব্রহ্মাত্মকত্ব নিরাকরণ করলেও ব্রহ্মোপসনার জন্য অখণ্ড, নির্বিশেষ ব্রহ্মের পাদ ভাবনা এবং ব্রহ্মাকে ওঁকাররূপে ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তিনি অস্বীকার করেন নি। ওঁকারকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করে ওঁকারের বিভিন্ন মাত্রায় ব্রহ্মের বিভিন্ন পাদের ভাবনার দ্বারা ক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মিথ্যাত্বের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে উপাসকের তুরীয় চৈতন্যে উত্তরণ ঘটে যা প্রপঞ্চের অতিক্রান্তি বা প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ।

অদ্বৈতবাদী শাব্দিক মতে শব্দানুশাসনশাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন হল সাধুশব্দের জ্ঞান। কিন্তু এর পরম প্রয়োজন হল— মোক্ষ বা দুঃখনিবৃত্তি। শব্দ শাস্ত্রসম্মত বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরাবাক্— এই চার স্তরীর বাক্ বা শব্দের আন্তরিক মননের দ্বারা শব্দব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হলে তার দ্বারা দুঃখমুক্তি বা মোক্ষ সম্ভব হয়। শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণগণ শব্দের বিচার করতে গিয়ে সাধু শব্দের সূক্ষ্ম মননের দ্বারা শব্দব্রহ্মের ধারণায় উপনীত হয়েছে। ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর শব্দকৌস্তুভ গ্রন্থে শাব্দিকগণের শব্দবিচারে প্রবৃত্তি থেকে ব্রহ্মতত্ত্বে উত্তরণের ব্যাপারটিকে বরাটিকা (কড়ি) অন্বেষণ করতে গিয়ে মণি পাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।[১০]

উপসংহার : সামগ্রিক আলোচনা থেকে পরিস্ফুট হয় যে পরিদৃশ্যমান জগৎ বা জগৎপ্রপঞ্চের সার হল অদ্বৈতব্রহ্মবস্তু। ভারতীয় অদ্বৈতমূলক অধ্যাত্মশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্রগুলিতে সেই অদ্বৈতব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধির জন্য নানা মার্গ বা পথের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে শব্দাদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ নির্দেশিত মার্গ হল সাধু শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং সেইরূপ সাধু শব্দের ক্রমিক স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পর্যায়ের মনন। আর সাধু শব্দের ব্যাপকতম

ও বিশুদ্ধতম রূপ হল উপনিষদোক্ত ওঁকাররূপ শব্দ যা একই সাথে সর্বশব্দ, সর্বপ্রপঞ্চ এবং সর্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানস্বরূপ পর ও অপর ব্রহ্মের সাথে অবিচ্ছেদ্য বা গূঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট। এই ওঁকারস্ফোটের মূল রহস্যে পৌঁছানোর মধ্য দিয়েই প্রতিভাসরূপ প্রপঞ্চের অতিক্রান্তি এবং মোক্ষফল প্রদ ব্রহ্মাত্মার উপলব্ধি সম্ভব হয়— এটাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়।

তথ্যসূত্র :

১. ভর্তৃহরি, বাক্যপদীয় (প্রথম খণ্ড), বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১

২. ভর্তৃহরি, বাক্যপদীয় (দ্বিতীয় খন্ড), বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৫০

৩. পতঞ্জলি, ব্যাকরণ-মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক), দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম সম্পাদিত, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, কলিকাতা, ১৯২৫ শকাব্দ, পৃ. ৯৫।

৪. রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদূত, ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৯৯।

৫. স্বামী গম্ভীরানন্দ অনুদিত ও সম্পাদিত, উপনিষদ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৪৪, ৪৫।

৬. দুর্গাচরণ সংখ্যা— বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৫।

৭. কালিদাস ভট্টাচার্য, মাণ্ডুক্যোপনিষদের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ. ৫২-৫৪

৮. ঐ, পৃ. ২৫।

৯. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ অনুদিত ও ব্যাখ্যাত, বেদান্ত দর্শনম্ (প্রথম অধ্যায়), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৯৩।

১০. ভট্টোজি দীক্ষিত, শব্দকৌস্তভঃ, গোপাল শাস্ত্রী নেনে এবং মুকুন্দ শাস্ত্রী পুন্টঙ্কর সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৩৩, পৃ. ১০।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়ন

উজ্জ্বল হালদার

সারসংক্ষেপ : আমরা সাধারণতঃ স্বামী বিবেকানন্দকে সন্ন্যাসী রূপে জানি এবং মূলত তিনি তাই। কিন্তু এর বাইরেও তাঁর আর এক পরিচয় হল তিনি মানব প্রেমিক। দেশের মানুষের দুর্দশা, মানুষের দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার তাঁর হৃদয়কে ব্যাকুল করত। দেশের মানুষের কিভাবে উন্নতি করা যায়, সেই ব্যাপারে তাঁর নিরলস চেষ্টার খামতি ছিল না। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। তিনি ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মের বাণী সকলের কাছে তখনই পৌঁছাবে যখন মানুষের মধ্যে অন্নের জন্য হাহাকার থাকবে না, থাকবে না কোন আর্থ-সামাজিক দুর্দশা। এই জন্য তিনি ধর্মের বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকটিও সমানভাবে নজরে রেখেছিলেন। তিনি সবসময় মানব সমাজের উন্নয়ন করতে চাইতেন, তাই ধর্মের বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির কথাও ভেবেছিলেন। মানব সমাজের উন্নয়ন করতে হলে ধর্মের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নও দরকার। তাই তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের কথা বলেছেন। শিল্পোন্নয়নের জন্য যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষা, কৃষির উন্নয়ন, শ্রমিক শ্রেণির উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সমানভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি প্রচলিত অর্থে অর্থনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর 'বাণী ও রচনা' গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পায়নও চোখে পড়ে। আর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে শিল্পায়ন আগে করতে হবে।

সূচক শব্দ : যুব সম্প্রদায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষি উন্নয়ন, শ্রমিক উন্নয়ন, উৎপাদন, বৈদেশিক সাহায্য।

মূল আলোচনা

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য মনীষীদের তুলনায় বিবেকানন্দ অনেকাংশে অগ্রবর্তী ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ, গণশিক্ষা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার রূপ দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক চিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন প্রসঙ্গে সুচিন্তিত যুক্তি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশে কৃষিকার্যের সাথে সাথে শিল্পেরও উন্নয়ন প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষে শিল্পায়ন খুবই জরুরি কিন্তু ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পায়নে বিরোধিতা করবেন, তাই তাঁর এই বিষয়ে চিন্তাভাবনার শেষ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ কুটির শিল্পের চেয়ে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছিলেন, যাকে আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় 'Big Push' বলা হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগের মাত্রা বাড়িয়ে দেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে জোর ধাক্কা দেওয়া; দেশে বড় রকমের বিনিয়োগ হতে পারে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে।[১] গ্রাম থেকে যেসব মানুষ খাদ্য ও কর্মসংস্থানের আশায় শহরে আসবে তাদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য কয়েকজন চিন্তাবিদের মধ্যেও শিল্পায়নের চিন্তা প্রধান্য পায়। দেশের দারিদ্র, পর পর ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষের প্রশ্ন নিয়ে সুশিক্ষিত ভারতবাসীকে সজাগ করে তুলেছিল। তাছাড়া দেখাযায়, সুবিবেচক কোন কোন ইংরেজ প্রসাশকগণ পর্যন্ত এই বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন।

তৎকালীন সময়ে শিক্ষিত মহলে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং তাকে কর্মে পরিণত করার যোগ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় না। কিন্তু এই স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং কর্মে পরিণত করার যোগ্যতা আমরা পাই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। শিল্পোন্নয়নের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দেশের যুবসমাজকে শিক্ষিত ও শক্তিশালী হবার কথা বলেছেন। দেশের যুব সম্প্রদায় শিক্ষিত হলে কর্মে নিযুক্ত হবে, আর এর ফলে অর্থ উপার্জনে সামর্থ হবে, ফলে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করবে। স্বামীজি মনে করতেন 'যে পর্যন্ত না মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠে, যতদিন না তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানে সমর্থ হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। দেশে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের সংখ্যা অসংখ্য হলেও সাধারণের দুঃখভাগী হওয়ার মত ত্যাগ স্বীকার বোধ এখনো আমাদের জাতির মধ্যে দানা বেঁধে ওঠেনি। তাই দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বোধ শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। এই শিক্ষা বহন করে নিয়ে যেতে হবে দেশের প্রতিটি যুবকের গৃহদ্বারে। শিক্ষার মাধ্যমেই যে উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি হয় তা বিবেকানন্দ বুঝতেন এবং বোঝাতে চাইতেন সর্বদা।'[২]

শিল্পের উন্নতির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা আগে শিখতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যা শিখতে না পারলে, দেশের শিল্পায়ন না হলে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই প্রযুক্তির ব্যবহার দেশের অগণিত যুবসম্প্রদায় নিষ্ঠার সঙ্গে করবেন স্বামী বিবেকানন্দ মনে প্রাণে চাইতেন। স্বামীজি চাইতেন ভারতবর্ষ কারিগরি শিক্ষায় উন্নত হোক, তাই তিনি বলেন— "আমার পিতা যদিও উকিল ছিলেন, তবু আমি ইচ্ছা করি না, আমাদের বংশের কেউ উকিল হয়। . . .আমাদের জাতের পক্ষে এখন দরকার সাহস ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। সুতরাং আমার ইচ্ছা (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) তড়িতত্ত্ববিদ হোক। সফল হতে না পারলেও সে যে বড় হবার এবং দেশের যথার্থ উপকারে আসবার চেষ্টা করেছিল— এইটুকু ভেবেই আমি সন্তুষ্ট হব। . . .আমি চাই যে অকুতোভয় ও সাহসী হোক এবং তার নিজের ও স্বজাতির জন্য একটা নূতন পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক।"[৩]

ভারতবর্ষে তখন সবেমাত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের যে কত বেশি প্রয়োজন বিবেকানন্দ তখনই তা অনুধাবন করেছিলেন। যদিও বিবেকানন্দের ঝোঁক ছিল যন্ত্রশিল্পের প্রতি, কুটির শিল্পের প্রতি নয়। কিন্তু তাই বলে তিনি কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য আগ্রহী ছিলেন না, তা নয়। কারণ, তিনি এটা ভাল করেই জানতেন গ্রামের মানুষকে গ্রামীণ শিল্পের উপর নির্ভর করতে হবে। এজন্য তিনি গ্রামীণ কারিগরদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর উপরও জোর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন আমেরিকার যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য তাঁর আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। তাই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন এবং ভারতবর্ষে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্ঠাও করেন। আজ যে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় বিভিন্ন শিল্প বিদ্যাপীঠ পরিচালিত হচ্ছে তা বিবেকানন্দের চিন্তাধারারই ফলশ্রুতি। জাপানে দ্রুত শিল্পায়নের সাফল্য বিবেকানন্দকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিবেকানন্দ যন্ত্রশিল্পের সমর্থক হলেও তিনি কখনোই ক্ষুদ্রশিল্পকে অবহেলা করেননি। তিনি কুটির শিল্পের ওপর নির্ভর করে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বামীজি যে সময় শিল্প উন্নয়নের কথা বলেন যে সময় পাশ্চাত্য দেশে শিল্প মানে ছিল বৃহৎ শিল্প। তাই স্বামীজি যখন পাশ্চাত্য দেশ থেকে শিল্প শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে বৃহৎ শিল্পায়নের কথাই বলেছেন।

বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় যান তখন থেকেই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন সন্ন্যাসীদের দিয়ে ভারতবর্ষে ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল চালানো। তাই ১৮৯৭ সালে ভারতবর্ষে ফিরে এসে যখন সন্ন্যাসী সংঘ গঠন করলেন তখন তিনি তাঁর পূর্বের পরিকল্পনানুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাদর্শের যে দুটি খসড়া রচনা করেন, তা হল— "প্রথমত, এখন

উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে-সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট করিতে হইবে। এইটি প্রথম কর্তব্য, পরে অন্য অবয়ব ক্রমে-ক্রমে যুক্ত হইবে।

দ্বিতীয়ত, মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়— যে-স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে।...মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি শিল্প বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমনই আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে।"[৪] স্বামী বিবেকানন্দ যে দুটি খসড়া রচনা করেছিলেন সেদুটি খসড়ার বাস্তবায়ন হয়েছে। বেলুড়ে 'রামকৃষ্ণমিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' এবং এখানেই আছে 'রামকৃষ্ণমিশন শিল্প মন্দির', তাছাড়া পুরুলিয়া, বেলঘরিয়া প্রভৃতি জায়গায় রামকৃষ্ণমিশন ও মঠের উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্পবিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছে। স্বামীজি মধ্যভারত বা হাজারিবাগ অঞ্চলের খনিজ সমৃদ্ধ হওয়ায় সেখানে কারখানা স্থাপনের কথা বলেছিলেন। তিনি জানতেন দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে আগে প্রয়োজন দেশের মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করা। তাই রামকৃষ্ণ ভক্তগণ এই বিষয়টির প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি চাইতেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শুধু ধর্মচর্চার কেন্দ্রস্থল হিসাবে না থেকে দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, দেশের শিল্প বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য এবং দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নির্দেশের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। তাই তিনি বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথাও বলেন। দেশবাসীর কল্যাণের জন্য বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক চিন্তার যে সমন্বয় করেছিলেন তার বাস্তব রূপায়ন আমরা দেখতে পাই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প বিদ্যাপীঠ ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে।

কারিগরি বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি দরকার। এই জন্য তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অধ্যাত্মবিষয়ক বক্তৃতাদির মধ্যেও বিজ্ঞান-সত্যকে সমর্থক প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনোই ধর্মকে বিজ্ঞান বিরোধী মনে করেন নি, তাঁর কাছে ধর্ম ছিল বৈজ্ঞানিক ধর্ম। তিনি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন নি, তিনি প্রায়োগিক বিজ্ঞানের প্রতি সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৫]

কৃষির উন্নতির জন্য বিবেকানন্দ প্রথমেই জমির উপর কৃষকদের অধিকার মেনে নেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মতভাবে কৃষিকার্যের প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে কৃষকদের পরিচিতি করাতে হবে; এজন্য চাই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার। বর্তমান সময়ে কৃষিব্যবস্থার যে নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ হচ্ছে তার সাফল্য বেশিরভাগই নির্ভর করে কৃষকদের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার উপর। বিবেকানন্দও সেই সময় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করা ও তা প্রয়োগ করার প্রস্তুতি হিসাবেই কৃষকদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। বিদেশে কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কেও বিবেকানন্দের গভীর আগ্রহ ছিল। স্বামীজি বিদেশে শুধু যে বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শেই আসতেন তা নয়, তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণকালে সে দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের সংস্পর্শেও আসতেন, তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। বিদেশে কৃষিকার্যের যে উন্নতি হয়েছিল তা দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষেও যদি প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ প্রয়োগ করা যায় তাহলে ভারতবর্ষেও কৃষিকার্যে উন্নতি ঘটবে। এজন্য তিনি দেশের যুবক দলকে আহ্বান করেছিলেন গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে এবং তাদের শিক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। বিবেকানন্দ কোন কিছুরই অন্ধ অনুকরণ পছন্দ করতেন না, যদিও আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবুও তিনি আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থার আদলে ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি চাননি। কারণ, ভারতবর্ষে কৃষি জোতের আয়তন ছিল খুব ছোট, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি জোত ছিল বৃহদায়াতন। ভারতবর্ষে জমির উপবিভাজন ও বিখন্ডন ছিল একটা ঘটনা এবং তার নিরসন কল্পে উনবিংশ শতাব্দীতে কোনও চেষ্টা চলেনি। তার ফলে কৃষির যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে ক্ষুদ্র আকারের কৃষিজোতের মাধ্যমেই করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজিকে যেরূপে দেখিয়াছি' গ্রন্থে লিখেছেন স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন— "পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয়ে আমি তার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলাম; কিন্তু এখন প্রধানতঃ তার অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতাই দেখতে পাচ্ছি। অপর সকলের মতো আমিও চিন্তা না করে ধরে নিয়েছিলাম যে, যন্ত্রপাতির দ্বারা কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হবে; কিন্তু এখন দেখছি যে, যন্ত্রের দ্বারা আমেরিকার কৃষকের সুবিধা হতে পারে, কারণ তাকে বহু বর্গমাইল চাষ করতে হয়, কিন্তু ভারতীয় চাষীদের ছোট ছোট জমির পক্ষে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। ভারত ও আমেরিকার সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক, অন্ততঃ এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই।"[৬]

কৃষির উন্নতির সারকথা হল উৎপাদন বৃদ্ধি। জমির একর প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করতে হবে এবং উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টাও করতে হবে। কেননা, স্বামীজি

বুঝতে পেরেছিলেন কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে প্রথমে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে কৃষির বাণিজ্যকরণ, কৃষি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ— বিবেকানন্দের এই বিষয়টিতেও নজর এড়ায়নি। আমরা দেখেছি তিনি চাইতেন দেশের কৃষকরা ও বিশেষ করে ছাত্ররা বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে কৃষি ব্যাপারে নানারকম শিক্ষা গ্রহণ করুক। স্বামী বিবেকানন্দের মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে কৃষি, কারিগরি শিক্ষার প্রয়োগ বর্তমানেও লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবধারার সৃষ্টিকর্তা স্বামীজি। তাছাড়া দেখা যায়, এই সকল কেন্দ্রগুলিতে পোলট্রি ফারমিং, ডেয়ারি ফারমিং প্রভৃতিও কৃষি উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে এগুলিরও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শিল্পোন্নয়নে শ্রমিকের শ্রম শিল্প উৎপাদনের চালিকাশক্তি। শিল্পোন্নয়নে শ্রমিক তথা শূদ্র শ্রেণিকে বেশি মর্যাদা দেওয়ার কথা বলেছেন। শ্রমিকের উৎপাদন ছাড়া দেশ ও জাতি চলতে পারে না। ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শ্রমিকের উৎপাদন এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রমিকেরা কলে কারখানায় কাজ করে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে এবং সেটাই নিয়ম হয়ে এসেছে; তাই শ্রমিক শ্রেণিকে রক্ষা করতে হবে, তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।[৭] শ্রমিকশ্রেণি সকল অত্যাচার মুখ বুজে সহে যায়, তবুও তারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনো প্রতিবাদ করে না। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদাই চাইতেন শ্রমিকশ্রেণির প্রতি এই অত্যাচারের অবসান করতে। সমাজে একটি শ্রেণি অপর শ্রেণিকে শোষণ, অত্যাচার করবে সেটা কখনোই চিরদিন চলতে পারে না। একথা ঠিক যে, কলকারখানা হবার ফলে অনেক দ্রব্যই সুলভ হয়েছে কিন্তু তাই বলে যদি কেউ ধনী হবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে শোষণ করে তাহলে কিন্তু সেটা মানা যায় না। এই শোষণের ফলে সকল দরিদ্র মানুষ আরো দরিদ্র হবে ফলে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্য দ্রব্যাদিও পাবে না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন ধনী সম্প্রদায়ের এই স্বার্থপরতার পতন হোক। তিনি যে নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন সেই নতুন ভারতবর্ষে কোন শ্রমিক শোষণ থাকবে না, থাকবে না কোন উঁচু নিচুর ভেদাভেদ।

স্বামীজি যখন চিকাগোর ধর্ম সভায় যাচ্ছিলেন, সেই যাত্রায় সহযাত্রী জামসেদজী টাটাও জাপান থেকে ম্যাচবক্স আমদানির করার জন্য যাচ্ছিলেন। বিবেকানন্দ জাপান থেকে ম্যাচবক্স আমদানির পরিবর্তে টাটাকে দেশেই ম্যাচবক্স তৈরির কথা বলেছিলেন। এরফলে দেশে শিল্প হবে এবং ভারতে কর্মসংস্থান হবে।[৮] সেদিনের আলাপচারিতায় জামসেদজী টাটা ভারতের প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়নের বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে দেশে ইস্পাত কারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। স্বদেশী উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে টাটাকে স্বামীজি পরামর্শ দেন জিনিস কেনাবেচায় কমিশন আছে ঠিকই,

কিন্তু নিজের দেশে কারখানা তৈরি করতে পারলে তুলনায় মুনাফা অনেক বেশি, সেই সঙ্গে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও হবে। জাহাজ যাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপচারিতা জামসেদজী টাটার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল, তাই ১৮৯৮ সালের ২৩ নভেম্বর চিঠি লিখে অনুরোধ করে জানিয়েছিলেন ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রচার পত্র লিখে দিতে। ভারতবর্ষে জামসেদজী বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার ভাবনা চিন্তা করছেন। যদিও পরবর্তীকালে তৎ কালীন ভাইসরয় লর্ডকার্জনের কাছে এই প্রস্তাব গেলে তা বাতিল হয়ে যায়। বিবেকানন্দের মৃত্যুর দুই বছর পর জামসেদজী টাটার মৃত্যু হয়। টাটার পরবর্তী প্রজন্ম ১৯০৭ সালে টাটা গোষ্ঠী জামসেদপুরে স্টীল কারখানা স্থাপন করেন। ১৯০৯ সালে গড়ে ওঠে টাটাদের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। পরবর্তীকালে শিক্ষাক্ষেত্রে টাটা গোষ্ঠীর উদ্যোগে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স (১৯৩০) এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (১৯৪০)-এর মতো গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। তবুও দেখা যায় ভারতবর্ষের কাঁচামালের একটি বড় অংশ বিদেশে চলে যেত; তাছাড়া ভারতবর্ষে তখনও কোন শিল্পায়নের প্রচেষ্টা ছিল না। প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল আর্থিক সম্পদে সমৃদ্ধ। অনাদিকাল থেকেই ভারতবর্ষ উর্বরতায় এবং শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল লাক্ষা, চাল, হীরে, মোতি ইত্যাদির ব্যবহার একশো বছর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হয়ে যেত। ভারতবর্ষের মতো উৎকৃষ্ট রেশমি, পশমিনা, কিংখাব আর কোথাও হতো না। ভারতবর্ষ ছিল লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রি প্রভৃতির মসলার শ্রেষ্ঠ স্থান।[৯] ভারতবর্ষ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনের ফলে ধ্বংসের মুখে চলে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যেটুকু ভারতবর্ষে এখনো আছে সেটুকু দিয়ে দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী করা যাবে।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে কারিগরি সাহায্য নেবার কথা বলেন। এবং তার বিনিময়ে পাশ্চাত্য দেশে দিতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিকতা। বিদেশ থেকে যন্ত্রাদি ভারতবর্ষে আনা এবং বিদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠানোর ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন।[১০] আধুনিক অর্থবৈজ্ঞানিকদের মতেও বিদেশ থেকে যদি কোন সাহায্য না নেওয়া হয় তাহলে কোন অনগ্রসর রাষ্ট্রই শিল্পোন্নত বলে নিজেকে দাবী করতে পারে না। অনগ্রসর দেশকে উন্নতকামী দেশের উপর নির্ভর করতে হবেই। তাই বলে এমন নয় যে, দেশের কাঁচামাল বিদেশী ব্যবসায়ীদের মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে স্বামীজি যন্ত্রশিল্পায়ন সম্পর্কে আগ্রহী হলেও তিনি কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতির সমস্যা বা উন্নতির উপায় নিয়ে আলোচনা করেননি। বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ ছিলেন না, তবুও তাঁর একটি অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল এবং সেই চিন্তা হল কীভাবে দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত করা যায়। যুবকরা নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে, তাই তাদের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর চেষ্টা করার কথা বলেছেন। তাছাড়া দেশের কুটিরশিল্প যে দুর্দশার পথে সেদিকে তার লক্ষ্য এড়ায়নি এবং গ্রামীণ কারিগরদের কাজের উৎকর্ষ বাড়ানোর কথাও বলেন। স্বামীজি যন্ত্রসভ্যতার দোষ জানতেন, তাই তিনি একদিকে যেমন শিল্পায়নের কথা বলেছেন, তেমনি আবার খাদ্যাভাব দূর করা, কৃষির উন্নতি, শ্রমিক শ্রেণির উন্নয়ন প্রভৃতির কথাও বলেছেন। সর্বোপরি ভারতবর্ষে যেটুকু সম্পদ আছে, যেটুকু লোকবল আছে, সেইটুকু দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ দেশে শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস করে গেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. গুপ্ত, সুব্রত, বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড অব কালচার, কোলকাতা, ২০১০, পৃ.-৩৩

২. দাস, ড. মনোরঞ্জন, অর্থনীতিবিদ স্বামী বিবেকানন্দ, মেইনস্ট্রীম, কোলকাতা, ২০১২, পৃ.-৩৬

৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ২০০৭, পৃ.-২০৩

৪. বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, পঞ্চম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ.-২৫৪

৫. গুপ্ত, সুব্রত, বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড অব কালচার, কোলকাতা, ২০২১, পৃ.-৩৯

৬. ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজিকে যেরূপে দেখিয়াছি, অনুবাদক: স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ.-১৩৪-১৩৫

৭. দাস, ড. মনোরঞ্জন, অর্থনীতিবিদ স্বামী বিবেকানন্দ, মেইনস্ট্রীম, কোলকাতা, ২০১২, পৃ.-৩৬

৮. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মহেন্দ্র পাবলিশিং কোম্পানী, কোলকাতা, ১৩৮৪, পৃ.-২

৯. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ২০০৭, পৃ.-৮২

১০. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, সম্পাদনা: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কোলকাতা, ২০১২, পৃ.-৪০৮

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

Covid-19 and migrant Worker Challenges in India

Tapan Kr. Mahata

Abstract

With the unexpected onset of COVID-19 while the world was trying to safeguard and address the socio-economic impact of the pandemic, India was struggling with another unfortunate issue of reverse migration. In Indian, ninety per cent of the workers are employed in the unorganised sector. The outbreak of COVID-19 forced migrant workers to shift from urban areas to their native places. With the declaration of the lockdown, millions of these workers were left unemployed and with no savings. This article is an attempt to analyse the reverse migration issue that occurred because of COVID crisis and its impact on migrant labourers that also led to the loss of livelihood of these migrants. The article also emphasizes India's response to COVID-19, how did India respond to the situation prior to lockdown, and how did Central and State Government respond to challenges faced by the migrant labourers.

Keywords: who, migration, COVID-19, migrant workers, india, lockdown, livelihood , Central and State Government

Introduction

The WHO proclaimed the COVID-19 disease a public health emergency of

global outrage, just after a week declaring that the COVID-19 outbreak is still not a critical situation of global public concern, and that the "lack of evidence" indicates no spread of virus among humans outside of China . With the onset of the COVID-19 pandemic, the global economy was ravaged and, primarily, poor and developing countries were among the worst impacted. Due to COVID crisis, the scenario has been precarious among developing nations, especially in India. In India, every year a considerable number of people migrate to big cities in various states to seek employment opportunities with an eye towards earning bread and butter for their families. However, the most regretful event that occurred during the COVID-19 lockdown was that this crisis triggered unfortunate reverse migration in India. During the COVID19 pandemic lockdown, migrant workers had to suffer from several issues and hardship. Due to non-functioning of economic activities, because of announcement of lockdown on March, 24th 2020, by Prime Minister himself, led around 40 million worker going jobless . Majority of these workers belongs to Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, and Orissa. These migrant workers had to suffer from difficulties like, food, transport, shelter, and societal stigma. Majority of these migrant workers are involved in construction work and MSME sector, and are daily wage earners. Workers involved in these sectors are not provided with appropriate shelter, fooding and healthcare services. Most of these workers depends on the daily wages earned through these activities and have no savings left for future use. Thus, these workers are left with no choice, but to suffer from the hardship.

India's initial response to COVID-19 before the lockdown

Before the COVID-19 crisis took extremely critical form in India, the coronavirus cases spreaded more because of the foreign links rather than the transference with in the country. In India, the very first COVID positive cases were reported on 30th January, 2020, from three students, residents

of Kerala state, pursuing their studies from Wuhan, China . India conducted its first airlift from China on 31st January, and as these citizens returned from China, two more new COVID positive cases were found in Alappuzha and Kasaragod district of Kerala, therefore, Kerala Government, on 3rd February, proclaimed COVID-19 as a 'state calamity'. On 4th February, India revoked the existing visas for all people from foreign who made their visit to China in the last two weeks . Furthermore, two more cases were registered within just a month, on 3rd March, where one patient had travelled to Italy whilst the other had visited Dubai from Hyderabad. Also, on the same day, a couple of other cases were found in Jaipur . And, on the very same day, for the first time PM Modi posted on a social media site regarding COVID-19, stating, "there is no need to panic" as "ministries and states are working together" to screen people]. Howbeit, this turned out to be wrong, since the Ministry of Health and Family Welfare reported 28 new COVID cases just the next day, many of them had a history of recently travelling out of the country . It was March 12, 2020, when India announced its first death due to COVID-19, when a man of age seventy-six from Kalburgi city of Karnataka became the country's very first victim of the novel coronavirus .Furthermore, on this very same day, India restricted foreigners from entering India for one month, and from 13th March to 15th April suspended all visas for travelling to India . A fourteen hour lockdown, 'Janata Curfew', was also declared in India, after fifty days when the virus was reported for the first time in India . The first phase of twenty-one days' lockdown began in India on 24th March, which was imposed till 14th April, later it was extended till 17th May, in different phases.

COVID-19 and the Reverse Migration

As the lockdown declaration news escalated, panicked migrant workers started to arrive at bus stations, railway stations and at highways in huge numbers, trying to reach their native places somehow. The lockdown as a measure to combat COVID-19, when the world was coming to a standstill,

there was almost negligible employment opportunity, imminent fear of unknown financial crisis, and the thousands of underprivileged people, labourers, workers, decided to march back to their homelands, and native places. Though, the purpose of implementing the lockdown was to initiate the 'social distancing' practice in order to avoid the spread of the virus. But these individuals, especially migrant workers and labourers, had no other viable option to fulfil those guidelines with their daily wages and employment.Thousands of workers quit sectors such as retail, manufacturing, textiles, tourism and leather after the lockdown was announced. On 26 March, Surendra Pandey decided to walk 110 kilometres to his home. When the plywood factory was shut down in Lucknow, since there was no transport available . Till this time, India had 600 confirmed COVID positive cases and the death toll was 13 . The most traumatising incident that occurred during this period was the death of sixteen migrant workers, who were trampled to death by a cargo train near Aurangabad in Maharashtra, when they fell asleep after getting tired by walking for miles besides a railway track. In north central India, a telephonic survey of more than 3000 migrant workers conducted by shows that many of these workers were daily wage earners and during the time of lockdown 42 percent were left with no ration, one third were trapped in cities without access to food, water and money, also, 94 percent did not have the their identification card. The absence of transport services during the lockdown led migrant workers and their families, including children, pregnant women and the elderly, march thousands of miles barefoot with no access to food and money to depart to their homeland, and many of these workers were left helpless, and had face starvation and misery, and few of the workers even died before they could arrive at their place of destination . In addition, these migrants were too vulnerable in getting exposed to COVID-19, and could have been the source of spread of the diseases in their destination place, eventually some became also. The degree of this reverse migration

was such that the crisis did not balance even the best of the Government of India's efforts.

Impact of COVID-19 lockdown on Migrant Workers

As per the report by World Bank, many as 40 million domestic migrants were impacted by COVID-19 and about 50,00060,000 people relocated from urban to rural areas in a short span of time . The incident of COVID-19 led to second largest migration in history of India, after the Partition in 1947, where around 14 million individuals were dislocated and migrated to India and Pakistan respectively. The acute threats posed for these migrant workers were food, shelter, no income, risk of being infected and anxiety. As a consequence, thousands of the migrant workers started to move from various cities to their native places. Many migrant workers had to lose their lives either because of road suffering, hunger, accidents or comorbidity, and some even committed suicide . Because of this indignation of the migrant workers, Public Policy scholars defined the lockdown as 'the choice between virus and starvation'. As the lockdown phase continued to extend, migrant workers choose to depart from their places of work to their homes, most to rural areas, since in urban areas, they did not possess the sufficient economic means to sustain and self-isolate themselves. Initially, the Central government to deterred migrant workers from returning to their homes, because it was believed that they might bring the infectious coronavirus to their native places, contributing more to the spread of COVID-19. Thus, these workers were not permitted to leave. However, when enquired by the Supreme Court, Government of India told the Apex Court that one-third of migrant workers could be infected, hence, Supreme Court directed the Union Government to make sure there is provision of food, water and shelter for these migrant workers . Under extremely severe circumstances, when few of the migrants somehow managed to walk for hundreds of kilometres, they were held under isolation within their homes or were kept in quarantine centres in horrendous

conditions. Dashrath Yadav, a migrant worker who had decided to walk from Ahmedabad to his village Banswara in Rajasthan, had to go through continued suspicion from neighbours, in spite of testing negative for COVID-19. Furthermore, the condition of these centres was so dirty and deplorable, with unhygienic rooms and toilets that few people actually ran away from these quarantine centres. In Latehar, a town in Jharkhand, around 100 migrants flew from the quarantine centre to avoid the unhygienic facilities provided. Few migrants, who belonged to under-privileged communities, had to also face the insanitary discrimination. A migrant who returned to his home to a village in Bihar, were not permitted to access their own food stores and have water from the common hand pump and were forced to depend on water used by cattle.

COVID-19, Migration and the loss of Livelihood Migration is a practice of livelihood pursued by millions of individuals in India. Most of the employment and work migration is geared towards urban centres. Around half of the urban populace consists of migrants and among them one-quarter belongs to inter-state migrants. As per the indications from 2011 Census, Migrants coming from rural areas are mainly situated in around fifty-three million urban agglomerations. Migrant workers are the key element, which constitute the foundation of Indian economy. Reverse migration happens when there are no livelihood and work choices for workers and there are hopes of economic progress in the place of origin. In certain situations, they work and remain in urban areas for a longer duration of time, whereas in other situations, the livelihood strategy adopted by the rural poor is temporary migration. The sudden increased occurrence of COVID-19 caused a deprivation of livelihood for all those workers who worked on temporary contracts, or with no contracts. A similar condition was also seen in other industries, like, manufacturing and non-manufacturing, mainly because of declining demand. This led to the decline of the labor market and also generated obstacles for employment. Moreover,

this also made an impact on wages, and late increments. In urban areas, a male casual labour earns between Rs. 314 to Rs. 335 and around Rs. 186 to Rs. 201 for females, by engaging themselves in other works apart from public works. A significant number of migrants and informal sector workers lived only on minimal wages. Also, it has significantly impacted their food and dietary consumption, access to health care, and their children's education. As per the Centre for Monitoring Indian Economy report, India's sudden declaration of the lockdown steered a hike of unemployment rate of 26 per cent from 21 per cent during April, and continuous fall in labour participation . Trade union report indicates, approximately 60,000—70,000 individuals, primarily pursuing domestic service and construction work, moved from Gujarat to their home state, Rajasthan, following the days after the lockdown was announced (Sharma & Khanna, 2020) [38]. Decline in the rate of employment forced several migrant workers to starvation, which also sparked protests in various states. In Gujarat, around 2,500 workers came to the streets of Surat city to demand wages, food and seeking permission to go back to their home states. In addition, a shelter home in Delhi was allegedly set on fire by the migrant workers after having a fight with the staff over food. These migrant workers were severely affected by the Coronavirus pandemic and ensuing lockdown, which led to their further destitution primarily because of the loss of livelihood.

Response of the Central and State Governments

The dissemination of COVID-19 and the following nationwide lockdown to manage and prevent its further proliferation caused chaos in the lives of millions of people who were mainly active in the informal sector. On 26 March 2020, the Government of India announced a Rs. 1.70-lakhcrore package under the Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana, in order to reduce the impact of the lockdown on vulnerable groups . The scheme covered various vulnerable groups, like, economically weaker sections of health workers, MGNREGA workers, farmers, especially senior citizens,

women, and unorganised sector workers, Ujjwala beneficiaries and Jan Dhan account holders. For the duration of next three months, the programme included the provision of an auxiliary 5 kilograms of rice or wheat and 1 kilogran of chosen pulses per month for the eighty-crore beneficiaries. The Central Government also directed State governments to utilise the Rs.52000 crores Building and Construction Workers Welfare Fund through Direct Benefit Transfer (DBT) for the provision of aid to construction workers . Later, the RBI also entered with a dramatic interest rate cut along with a series of unconventional initiatives to grant to besieged firms . It has, however, been argued that all these disbursements were part of regular welfare contributions to eligible groups by central and state governments and therefore do not resolve new catastrophic losses, such as jobs, leading to ongoing survival crises faced by helpless and out-of-work informal migrant workers . These transfers were less than 0.8 percent of GDP and just 5.6 percent of the expected financial expenditure of the central government for 2020-21. Cash transfers to Jan-Dhan accounts amount to less than ‘17 (USD 0.22) per household and ‘4 (USD 0.05) per person per day. In addition to the different welfare policies initiated during the lockdown, the government also introduced an employment and rural public works scheme named Garib Kalyan Rojgar Abhiyan (GKRA) for returning migrants. This emphasized on 125 days’ drive distributed across 116 districts in six states managed to use fifty-sic per cent of the total amount allotted. The government’s failure to invest the set amount allocated to boost rural India’s livelihood opportunities and building a sustainable infrastructure is certainly a matter of concern, particularly with hardly more than a month left for the program to finish.

Observing the seriousness of the circumstances, various states, such as Uttar Pradesh, Bihar, Delhi, Rajasthan, and Karnataka, also made arrangement of special buses to send the migrants and their families back to their respective places. This huge migration resulted in a crisis state

bus stops, train stations, and on national highways, causing misunderstandings between different States. States were approved to use fund in the State Disaster Relief Fund (SDRF) to grant vulnerable people with food, shelter and healthcare treatment, along with migrant workers, stuck because of lockdown and lodged in relief camps and other areas ; Press Trust of India, 2020). However, the lack of appropriate guideline to implement the governments' plans proffered various obstacles for State governments, like, the insufficient time to get prepared for the implementation of those guidelines, therefore various states came up with their own strategies, and took necessary measures to safeguard these workers. Various states like Kerala, Delhi, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh, Karnataka made provision of free foodstuff or ration bags including the distribution of food grain kits . Some states also involved various NGOs and Jail mates to support this attempt. NGOs assisted in crowdfunding in order to help feed people in need and availed them meal and hygienic kits. In Kerala, Centre for Migration and Inclusive Development introduced a mobile testing unit named "Bandhu" to serve the purpose of screening the migrant labourers and to provide them essential medical services .

Recommendations

The lockdown decisions in India had a significant impact on informal workers, causing several of them to migrate back to rural areas. With the unexpected lockdown and suspension of economic activities, the vital relation of migrants to their 'labor' was unexpectedly delinked, and their sole ownership of any 'exchange- entitlement' in the form of 'physical labor' collapsed. This takes us to the insecurity of the lives and conditions of migrant workers. Noticing the size and transmission of the disease, it is suggested that in such situations immediate steps that should be taken, first, migrant should be availed food and other basic amenities at camps by ensuring the provision of better sanitation and hygiene to each one of

them. Secondly, provision of basic and preventive health kits, like, mask, sanitizers, and gloves. Third, ensuring the practice of social distancing among migrants in order to prevent the transmission of the infection. Lastly, migrants who were suffering from anxiety, stress and depression should be provided counselling and psychological support.

Emergency relief and compensation should be granted to migrants for the challenges they faced, on the basis of the estimation of minimum floor level wages, as a direct cash transfer for the duration of at least 3-6 months. In-kind transfer under the Public Distribution System (PDS) should be universalized in order to deal with food insecurity. Doorstep delivery could accelerate the provision of kind and cash transfers such as oldage pensions and maternity benefits where employees and dependents do not have access to bank accounts.

Most of quarantine centres in different states were found to be filthy and unhygienic. However, the government claimed that it is complying with WHO rules, but that was not the case in many of the quarantine centres. For instance, it was found in some quarantine centres that there was no soap, filthy sink, common bucket to bath, dirty sheets and crammed beds . In addition, there was several cases of people fleeing from these quarantine centres because of the unhygienic centres and improper behaviour of the staff. Also, because of these issues many people did not go for testing and were resistant to go to quarantine centres. Therefore, in order to keep the people not to get scared of the quarantine centres and to voluntarily come, it is important to maintain the cleanliness and hygiene of these centres, should be routinely sanitized, and guide the staff to coordinate with people appropriately and once it is achieved, there is a need to remove the stigma about these centres among people.

An initiative of health insurance program for the migrant workers at the destination, in particular during any disease or pandemic, could be beneficial for both the state government and the migrants.

In Kerala, for example, a health insurance program called the 'Awaz Health Insurance Scheme', aims to benefit the migrant workers and also to offer migrants with valid documentation, was helpful.

It also allows the government to Maintains records of migrants and migrant workers also receives the benefits of the health insurance.

Lack of identity proof is yet another constraint among lower class section that leads them to denial of various social security schemes by the government. And this also happened during lockdown, various migrants did not have identity cards, and therefore many of these workers did not the benefit of schemes provided by the government. Therefore, it is suggested government should ensure there is provision of identity cards for all, especially, for the lower class and the marginalised sections of the society.

In addition, the present data on migration is very old and sometimes not available on time either. Therefore, there is also an urgent need to reinforce the database on migration, through Census, National Sample Survey (NSS) and NFHS and Migration Surveys. The efficacious inclusion of migrants in the official statistics and access would help to formulate comprehensive and inclusive policies and programmes in the country, since migration has affected households in almost every aspect of both rural and urban areas.

It is important to understand that it is not possible to neglect the migrant labourers, as an important stakeholder in development, for a long time. At this point of time, it is extremely important to integrate migrant workers with development. The government should take a serious look at the UNESCO-UNICEF guidelines and also on the Working Group on Migration to adopt them as soon as possible.

As Amitabh Kundu, from the Research and Information System for Developing Countries, suggests, in India, there are approximately sixty-five million inter-state migrant workers . In order to protect the rights of these migrant labourers, a robust legal framework is required, while offering

them with the choice to migrate for a livelihood opportunity that guarantees a modest living. Nevertheless, individuals should not be compelled to relocate from rural areas to seek employment that are often vulnerable and insecure, when staying in inhospitable environments. One such solution is developing rural infrastructure and thus livelihoods, by long-term planning instead of vague planning.

Conclusion

Because of the unexpected lockdown, migrants experienced starvation, lack of income and uncertainty of employment. In the past, floods, famines, epidemics, droughts, and regional tension have led to exoduses from rural areas. Basically, at present what is changed now is the rise of this novel phenomenon of the exodus of migrants from their place of work. Migrant workers struggle from the double burden, of being poor and being a migrant. Due to the lack of identification and residential proof, most services planned for the poor do not reach them. The failure of fulfilling migrants' social, economic, and political rights is indeed a significant concern, however, they are qualified citizens but their substantive rights to citizenship are not met. Relevant policies and schemes for migrants have hardly been initiated by urban development and planning in India, since they have not been considered part of the urban population. In India, one of the biggest fault in addressing urban sustainability and pursuing the aims of sustainable development, is the failure to address migrant workers as a stakeholder in urban growth. For the first time, the COVID19 crisis has taken 'invisible' migrants and the migration phenomenon to the centre stage of social security policy concerns. The aftermath of the COVID-19 pandemic lockdown, the catastrophe of migrant workers intensified the need to consolidate the social policy measures of the past decades.

References

1. DW News. WHO Declares Coronavirus A Global Health emergency,

2020. Retrieved from The Wire: https://thewire.in/health/who-declares-coronavirus-aglobal-healthemergency .

2. Mukhra R, Krishan K, Kanchan T. COVID-19 Sets off Mass Migration in India. Archives of Medical Research, 2020. Doi:doi.org/10.1016/j.arcmed.2020. 06.003
3. Patrikara S, Poojary D, Basannar D, Faujdar D, Kunte R. Projections for novel coronavirus (COVID-19) and evaluation of epidemic response strategies for India. Medical Journal Armed Forces India, 2020, 268-275.
4. Sharma NC, Mukherji B. Air India flight leaves for China with medical team to evacuate citizens. Retrieved, 2020. From Live Mint: https://www. Livemint.com/news/india/airindia-flight-leaves-forchina-with-medical-team-to-evacuate-citizens11580489136505.html
5. PTI. Coronavirus: India Cancels Valid Visas to Chinese, Foreigners Who Visited China in Last Two Weeks, 2020. Retrieved from The Wire: https://thewire.in/travel/coronavirusindia-cancels-valid-visasto-chinese-foreigners-who-visited-china-in-last-twoweeks
6. Ojha S. 'No need to panic,' says PM Narendra Modi amid coronavirus fear, 2020. Retrieved from Live Mint: https://www.livemint.com/news/india/-no-need-topanic-sayspm-narendra-modi-amid-coronavirus-fear11583226331189.html
7. Sharma A, Pratap R. India confirms 28 coronavirus cases. Retrieved from CNN: https://edition.cnn. Com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20intl-hnk/h_0565 77aa04d19c35a3417c9e459a63df
8. AFP. Karnataka announces India's first coronavirus death. Retrieved from The Economic Times: https:// health. economictimes. indiatimes. com/news/industry/sta te-ministerannounces-indias-first-corona-virus-death/74604253 #:~: text = A% 2076%2Dyear% 2Dold% 20man,fatality%20from%20the%20global%20pandemi
9. Sharma S, Khanna S. India's migrant workers face long walk home amid coronavirus lockdown. Retrieved, 2020.from Reuters: https://

www.reuters. Com/article/ushealthcoronavirus-india-migrant-labo/ indias-migrant workers-face-long-walkhome-amidcoronavirus-lockdown- idUSKBN21D2O0

10. Banerjee S, Mahale A. 16 migrant workers run over by goods train near Aurangabad in Maharashtra, 2020. Retrieved from The Hindu: https://www.thehindu. Com/news/national/ other-states/16-migrant-workersrun-over-by-goods-train-nearaurangabad-inmaharashtra/ article31531352.ece
11. Jan Sahas. Voices of the Invisible Citizens: A Rapid Assessment on the Impact of COVID-19 Lockdown on Internal Migrant Workers. New Delhi, 2020. Retrieved from https://freedomfund.org/wp-content/ uploads/ Voices-of-Invisible-Citizens.pdf
12. Bhagat R, RS R, Sahoo H, Roy AK, Govil D. The COVID-19, Migration and Livelihood in India. Mumbai: International Institute for Population Sciences, 2020.
13. Chen M. To die from hunger or the virus: An all too real dilemma for the poor in \India and (elsewhere), 2020. Retrieved from UNU-WIDER: https://www. Wider.unu.edu/publication/die-hunger-or-virus
14. Times of India. Covid-19: Why people flee quarantine centres. Retrieved from Times of India, 2020. https://timesofindia. indiatimes.com/india/covid-19-whypeople-fleequarantine-centres/ articleshow/75783193. Cms
15. Agarwal P. Bihar's Migrants Return to Face Stigma, Under-Prepared Medical Facilities. Retrieved from India Spend, 2020. https:// www.indiaspend.com/bihars-migrants-return-toface-stigma-under-preparedmedical-facilities/
16. Ministry of Statistics and Programme Implementation. Annual Report Periodic Labour Force Survey (PLFS), 2017-18. New Delhi: National Statistical Office, Government of India, 2019.
17. Langa M. Lockdown Migrant workers in Surat come out on road demanding salaries. Retrieved from, 2020. The Hindu: https://www.

thehindu. Com/news/national/ lockdownmigrant-workers-come-out-on-roaddemanding-salaries/article31313403.ece

18. Joy, DHNS. Coronavirus: MHA tells states to set up relief camps along highways for migrant, 2020. Retrieved from Deccan herald: https://www.Deccanherald.com/national/national-politics/ corona-virus-mhatellsstates-to-set-up-reliefcampsalong-highways-for-migrant-workers-818637.html
19. Bloomberg Quint. Covid-19: Supreme Court Seeks Report From Government On Steps. Retrieved from Bloomberg Quint, 2020. https://www.bloom bergquint.com/law-andpolicy/covid-19-fear-andpanic-biggerproblem-than-coronavirus-says-sc-seeksreport-fromgovt-on-steps-takentoprevent-migration-ofworkers
20. Inamdar V, Thusoo S. COVID-19 Reverse Migration Calls for Long-Term Rural Development Planning, 2020. Retrieved from The Wire: https://thewire. In/rights/covid19-reverse-migration-long-term-ruraldevelopment-planning
21. Bohra S. Jaipur mirrors Delhi scenes as '30,00040,000' migrants crowd bus stands to get back home, 2020. Retrieved from The Print: https://theprint. In/india/jaipurmirrors-delhi-scenes-as-30000-40000 migrant-scrowdbus-stands-to-get-back-home/390935
22. Kuruvilla A. 1st mobile Covid screening unit begins operation among migrant labourers. Retrieved, 2020. From The New Indian Express: https://www.New indianexpress.com/cities/kochi/2020/apr/03/1st-mobilecovid-screening-unit-beginsoperation-among-migrant-labourers-21250 05.html
23. Ghoshal D, Pal A. Flooded toilets, dirty sheets: South Asia quarantine centers worry experts. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-healthcoronavirussouthasia-quaranti/flooded-toilets-dirtysheets-south-asia-quarantine-centers-worryexpertsid UKKBN2152CP

Impact of covid19 on fundamental rights of Indian constitution (Special Reference of article 21)

Purnima Mahato

Abstract :

The outbreak of COVID19 has affected all segments of the population. The constitution in his Part III guaranteed fundamental rights with article 21 of the Indian Constitution. It provides that, ''No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law.'' In 1992, the Supreme Court declared that the Indians at all levels shall be given this new 'Right to education'. This new right has been held to be a part of the Fundamental Right to life under Article 21 of the Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Due to this pandemic, our right to life and liberty has effected a lot, for example right to privacy, Right to livelihood, and right to education. During Lockdown students are unable to attend their school and colleges. They did not get quality of education. Online classes are going on but it could not run effectively in the remotest area or village. With the inception of the lockdown public discourse was shaped three major rights. These were the right to life, the right to health, and the right to food. During this pandemic our government has assured food for all & right to health to all individuals.

Despite these effort limited healthcare facilities and interruption in regular immunizations in hospitals leading to anxiety and fear among the population. Inadequate infrastructures, leading to illequipped healthcare employees who are fighting endlessly to treat patients and protect themselves from infection at the same time are all quite visible that their right to life and liberty are in danger. These days our right life and liberty have badly affected by COVID 19. It is the duty of the government to take major steps towards protection of this right. we cannot enjoy other rights without article 21.

Keywords: health, education, government, food, privacy

1. Introduction

The global corona virus has radically impact on the people of India. Corona virus disease is a very infectious disease. It is characterized as a pandemic by the WHO which attack society at their core. It is originated from Wuhan city of china on 31st December 2019. In India, the first case came on 30th January 2020 in Kerala. It has affected millions of people around the globe. As we know every event has a cause like this COVID19 is caused by SARS-COV2 is of unprecedented global public health concern severe acute respiratory syndrome. 11 February 2020 WHO announced a name for the new corona virus disease COVID19 ON March 11, 2020, WHO declared COVID19 a pandemic. It is global but its effect is local in the era of globalization India has also come in the influence of COVID19.

The outbreak of COVID19 has affected all segments of the population. This is probably the first instant in the history of India where infectious disease is testing itself. The constitution in his part III guaranteed fundamental rights with article 21 of the Indian Constitution. It provides that, ''No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law.'' It corresponds to the Magna Carta of 1215, the 5th Amendment to the American Constitution,

and article 31 of the constitution of Japan, 1946. This article is available to every citizen or alien, thus even a foreigner can claim this right. It does not entitle and reside and settle in India, as mention in article 19(1) e. Article 21 has got a constitutional value of supreme importance in India. In 1992, the Supreme Court declared

Indians at all levels shall be given this new 'Right to education'. This new right has been held to be a part of the Fundamental Right to life under Article 21 of the Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Due to this pandemic, our right to life and liberty has affected a lot, for example, right to privacy, Right to livelihood, and right to education. During Lockdown students are unable to attend their school and colleges. They did not get the quality of education. Online classes are going on but they could not run effectively in the remotest area or village. With the inception of the lockdown public discourse was shaped three major rights. These were the right to life, the right to health, and the right to food. During this pandemic, our government has assured food for all & right to health to all individuals. Despite these efforts limited healthcare facilities and interruption in regular immunizations in hospitals leading to anxiety and fear among the population. Inadequate infrastructures, leading to ill-equipped healthcare employees who are fighting endlessly to treat patients and protect themselves from infection at the same time are all quite visible that their right to life and liberty are in danger. These days our right life and liberty have badly affected by COVID 19. It is the duty of the government to take major steps towards protection of this right. we cannot enjoy other rights without article 21.

Objective

Time to time the country has faces many types of calamities. In these situations, the government has played a very vital role to maintain a balance between individual liberty and law & order. In the current situation we are facing pandemic. It is global in nature along with its effect is local. During

this pandemic, the fundamental rights of Indian citizens are adversely affected. So the aim of this paper to explain the effect of COVID19 on our fundamental rights and what a major step was taken by the government to protect our fundamental rights especially article 21 which is the basis of all rights. Democratic philosophy considers some of the individual rights as basic or fundamental to a better and happier life and people clamored and struggled for them everywhere and always. Fundamental rights have been rightly regarded as the soul of the constitution.

Methodology

I have chosen a secondary method to collect my data from magazines, books, newspapers, the internet, Wikipedia, Shodhganga, live-law, Supreme Court, and High court judgments etc.

Meaning of Fundamental Rights

The fundamental right is the main features of the Indian constitution. It is called fundamental because it has mentioned in our constitution and it is essential for the development of personality. It is justiciable. According to D.D. Basu "A fundamental right is one which is protected and guaranteed by the written constitution of the state." It can be altered only by the process of the constitutional amendment. No organ of state can act in contravention of such right H.J.Laski said "there can be no liberty without rights. A state is known by the rights it maintains."1 The conflict between man and the state always exists in human society. Though attempts have been made for centenary to bring about a proper adjustment between the competing claim of the state and the individual, the solution seems to be still off. It is clear neither individual are allowed to have absolute freedom of speech and action nor the state can be given absolute power to determine the extent of personal liberty. Hence the main problem is how to make a fitting adjustment between individual freedom and government power. In a democratic society, the government pays special attention to maintain the balance between life and liberty of the individuals and security of the

state itself. Our executive and legislative authorities have ensured to protect our fundamental rights which are given by our constitution.

Importance of fundamental rights

Democratic philosophy considers some of the individual rights as basic or fundamental to a better and happier life and people clamored and struggled for them everywhere and always. Fundamental rights have been rightly regarded as the soul of the constitution. In Indian democracy, such rights are mentions in the constitution. The framers of our constitution were especially influenced by the bill of rights of the American constitution. The framers of our constitution did not fallow the British constitution in this respect rather they have followed the American constitution. Fundamental rights are safeguard individual liberty and directive principle of state policy to ensure social, economic, and political justice for every citizen. Fundamental rights try to adjust between the competing claim of the state and the individual. It regarded as the MAGNA CART of the essential liberties of the Indian people.

Classification of Fundamental Rights

Initially, We Have Seven Fundamental Rights but AT Present we have six fundamental rights because in 1978 by 44th amendment right to property has omitted and now it is legal right. These fundamental rights are as follow;

- Article 14 to 18 - Right to Equality
- Article 19 - Right to freedom
- Article 20 - Protection in respect of conviction for offences
- Article21 - Protection of life and personal liberty
- Article 22 - Protection against arrest and detention in certain cases
- Article 23-24 - Right against exploitation

- ❒ Article 25-28 - Right to freedom of religion
- ❒ Article 29-30 - Cultural and educational rights
- ❒ Article 32 - Constitutional Remedies

1. Right To Equality: (from article 14 to article 18)

- ❒ Equality before the law. (Article 14)
- ❒ Prohibition against discrimination. The state shall not discriminate on the ground of sex, religion, race place of birth, or any of them. (Article 15)
- ❒ There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. There shall be no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth residence. (Article 16)
- ❒ Abolition of untouchability. Untouchability is an offense punishable in accordance with the law. (Article17)
- ❒ Abolition of titles. (Article18)

2. Right To Freedom:(From articles 19 to 22)

According to M.Y.PYLEE, "Personal liberty is the most fundamental of fundamental rights. Articles 19 to 22 deal with different aspects of these basic rights. Taken together, these four articles form a charter of personal liberties, which provide the backbone of the charter and fundamental Rights"1. These are popularly known as the "seven freedoms" under our constitution. In the original constitution there were seven freedoms in Article19 (1) but that one of them" The Right to property" has been omitted by the constitution 44th amendment Act 1978, leaving only six freedom in that article.

1. All citizens have the right to A. Freedom of speech and expression.
   - ❒ Freedom of assembly.

- ❒ Freedom of association
- ❒ Freedom of Movement.
- ❒ Freedom of residence and settlement.
- ❒ To Practice of profession, occupation, trade, or business.
- ❒ Protection in respect of conviction for offences.(Article 20)
- ❒ Protection of life and property (Article 21)
- ❒ Protection against arrest and detention. (Article 22)

3. Right against Exploitation.(From article 23-24)

It deals right against exploitation. Exploitation means

Misuse of services of others with the help of force. in pre- Independence India, this type of exploitation was prevalent in many parts of the country. The constitution has, therefore, rightly abolished such practice. It includes Traffic in human beings is prohibited; Beggar and other similar forms of forced labor are prohibited. Any contravention of this provision is punishable in accordance with the law. No child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines or engaged in hazardous employment.

4. Right to freedom of religion:(From articles 25 to 28)

- ❒ All citizens have freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.
- ❒ Freedom to manage religious affairs.
- ❒ Every religious section has freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.
- ❒ No religious instruction shall be provided in educational institutions maintained by government.

5. Cultural and educational rights: (From article 29 and 30)

Article 29 and 30 of the constitution provides that minorities shall have the right to conserve its own language, script, literature, and culture.

6. Right to constitutional remedies: (From article 32 to 35)

- Enforcement of fundamental rights by the Supreme Court.
- Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc.
- Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area.
- Legislation to give effect to the provisions of this Part.

Meaning of Article 21 (Protection of life and personal liberty)

Article 21 of the Indian Constitution provides, ''No person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to the procedure established by the law.'' In 1978 by the 44th amendment had declared the Right to life and liberty inviolate emergency or no emergency? The fundamental right of life and liberty must continue all circumstances. Article 21 was thus made an exception to the general rule let down in article 359 that the President has the power to suspend the enforcement of any or all of the fundamental rights during an emergency. Supreme Court of India has held a remarkable decision on March, 8, 2018 that the right to die with dignity is a fundamental right. The bench also held that passive euthanasia and living will be also legally valid. The court has issued detailed guidelines in regard. The court has expanded the spectrum of article 21 to include within it the right to leave with dignity as a component of the right to life and liberty.

In 1992, the Supreme Court declared that the Indians at all levels shall be given this new 'right to education'. This new right has been held to be a part of the Fundamental Right to life under Article 21 of the Constitution. Justice Kuldeep Singh and R.M Sahai have given this new a gift to the

citizens of India in Miss Mohini Jain, verses the State of Karnataka by states that, "The right to life and the dignity of an individual's cannot be assured unless it is given the right to education." With a single judgment, the judges have converted the non-enforceable right to education in the Directive Principle of the Constitution into an enforceable Fundamental Right. By the 86th Constitutional Amendment Act of 2002, the following Article has been inserted after Article 21 of the Indian Constitution. India has also started historic law making education of fundamental right of every child coming into force. The act of compulsory education will directly benefit children who do not go to school at present. According to this act the appointment of teachers through academic qualifications.

Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh announced the implementation of the act. Children, who were not going to school or dropped out of schools, will get elementary education and the state and local government to ensure that all children in the 6–14 age groups get schooling. According to this act, 25 percent of seats in all private educational institutions should reserve for the children of weaker sections of society. For the implementation of this act, the center and the states share the financial burden fixed in the ratio of 55:45. In 2005 under Article 19(1) of the Constitution Right to Information (RTI) which gives any citizen of India may get information from a "public authority. A nine-judge bench of the Supreme Court on August 24, 2017, has ruled that Indians enjoy the Fundamental Right to privacy that it is intrinsic to life and liberty and thus comes under Article 21 of the Indian Constitution in page 547 judgment that declares privacy to be a Fundamental Right. In Article 21 of the Constitution, privacy is a fundamental right that emerges primarily from the guarantee of life and personal liberty. Elements of privacy also arise in varying contexts from the other facts of freedom and dignity recognized and guaranteed by the Fundamental Rights. Contained in part III-like other rights which form part of the fundamental freedom, protected by part III,

including the right to life personal liberty under Article 21, privacy is not an absolute right. The Supreme Court had recognized the right to privacy in the Puttaswamy case. It was recognized by the Apex Court as early as in 1998, in the case of Mr.Xv.Hospital Z. The Court opined in this case that patients had the right to confidentiality and privacy as regards their personal details. However, this right was not absolute and could be overlooked when there was a larger public interest. Further, Regulation 2.2 of the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, reads as "defects in the disposition or character of patients observed during medical attendance should never be revealed unless their revelation is required by the law"

In fundamental right the law which encroaches upon privacy is permissible restriction. In the context of Article 21, an invasion of privacy must be justified on the basis of a law that stipulates the procedure which is fair just and reasonable. The law protects the inner sphere of an individual from the government and permitted citizens to make autonomous life choices. On 24 August 2017 the Supreme Court of India ruled that: "Right to Privacy is an integral part of Right to Life and Personal Liberty guaranteed in Article 21 of the Constitution," The right to live includes the right to live with human dignity and all that goes along with it viz the bare necessities to life such as adequate nutrition, clothing, and shelter over the head and facilities for reading writing and expressing oneself in diverse from freely moving about and mixing and mingling with fellow human beings and must include the right to basic necessities of life and also the right to carry on function and activities as to constitute the bare minimum expression of the human self. These dimensions are given by the Supreme Court in Maneka Gandhi vs. union of India case and held that the right to live is not merely a physical right but includes the right to live with human dignity. Right against sexual harassment, at the workplace article 21 guarantees the right to life with dignity. The court in this context has observed that

the meaning and content of fundamental right guaranteed in the constitution of India are of sufficient amplitude to encompass all facts of gender equality including protection of sexual harassment or abuse. Appropriate work condition should be provided in respect of work, leisure health, and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards the woman at the workplace and no employee woman should have reasonable ground to believe that she is disadvantaged in connection with her employment.

Article 21 includes the right to Reputation and right to livelihood, right to social security and protection of the family, right against honor killing, right to health, right to medical care, no right to die and also right to get pollutionfree water and air in Subhas kumar v state of Bihar it has held that public interest litigation is maintainable for insuring to get pollution-free water and air which is included in the right to live under article 21 and also the right to clean environment.

The court in India has mandated that some of these rights are applicable to non-human entities which have been given the status of the legal person and human has the legal duty to act as loco parents towards animals' welfare like a parent has towards the minor children. Punjab and Haryana high court in 2018 cow smuggling case. Deity as a legal person is entitled to right S.C. in 2018 the entry of women to Sabarimala granted Lord Ayyappan right to privacy. River are legal person U.K. high court mandated that the river Ganga and Yamuna have right to protect against pollution caused by a human. The right to open trail. This scope of the right of life and liberty has been extended even to innocent hostages detained by militants.

Impact of COVID19 on Article 21: Right to life and liberty

During pandemic, Indians have started to follow the guideline which is passed by WHO. In this regard, the first lockdown was imposed on 22nd march, 2020. During the lockdown, all the activities of human societies

were restricted except essential goods and services. During this period people have faced so many problems like losing jobs, lack of medical facilities, lack of education, restriction on transportation, harvesting of crops, etc.

During lockdown all the industries, tourism, hotel, construction work were shut down. Due to this, an estimated 140 million people lost their employment while many suffered from diminution of their salaries. Among them, about 20 million people did not have money to buy grain and bread two times. They were suffering from hunger. This affects their right to life. They were unable to enjoy their article 21. There is a restricted movement of people with reduced consumption of all sorts of goods and services except certain essential commodities and services. Such a situation poses a serious threat to the survival of daily wage workers, roadside vendors petty traders act because of no cash in hand people cannot carry on with their usual jobs or occupation. The existing situation of unemployment worsens with the weakling of the socioeconomic system, a large number of people losing their usual jobs or occupation. Livelihood is in danger of irreversible. This is a crucial period for everyone and to act socially more responsible for our society.

According to article 19 citizens of India has the right to move any part of the country. But during lockdown people did not enjoy their right to movement. During pandemic those who lost their jobs in cities, they started to move their villages for the survival of their lives. But they were facing lots of problems reaching their native because of government-imposed restrictions on movement. It is also a violation of article 21. Social stress caused by the lockdown has many faces and reasons resulting from traveling restrictions and disruption of cultural celebrations, limited healthcare facilities and interruption in regular immunizations in hospitals leading to anxiety and fear among the population, social distancing with friends and family, closure of places of entertainment and leisure, unplanned

closure of schools and colleges affecting both students and parents regarding the academic year and the loss of quality education. Inadequate infrastructures, leading to ill-equipped healthcare employees who are fighting endlessly to treat patients and protect themselves from infection at the same time are all quite visible. To use of Disaster Management Act if a person gets affected by COVID19, he or she is totally boycotted by society and even by their family. This affects their physical as well as mental health. According to this act, patients were treated without their consent.

Another new trend seems to be a breach of personal information in the grab of COVID19 tracing there have been several instances where the government has released personal data of people who have been quarantined. The data includes names, passport numbers, residential addresses, and phone numbers. This release of personal data has become a privacy concern and has a stated as a gross violation of the legitimate exception of privacy.

On the health care front the government suffers from availing adequate testing kits to check patient with COVID19 the situation is worse for government healthcare workers who had not been provided with adequate personal protective equipment. They are making the lack of PPE are a grave violation of the fundamental right of the health care worker. During the lockdown unplanned closure of schools and colleges affecting both students and parents are regarding the academic year and the loss of quality education. Children did not attend their classes. Most of the examinations were canceled. Our right to education is also badly affected by this pandemic. With the inception of the lockdown public discourse was shaped around three major rights these were right to life, right to health, and right to food. Many state governments like Delhi, Uttar Pradesh, and Punjab in an unprecedented move acknowledged the need for unemployment wages to ensure self-substance for the poor. The migrant

did not get ration by the government because they did not have BPL card due to the lack of permanent address in a particular state. Similarly, some other state governments attempt to guarantee the right to health for all individuals. For that, they have converted major government hospitals into COVIE19 hospitals. The Government also assured the availability of food to Ration shops. Despite these afford state struggle to enforce the fundamental rights which were guaranteed by the constitution. Recent report shows that migrants who were not able to leave the city struggled to get food and shelter.

The Shelter homes in Delhi were overcrowded with social distancing becoming impossible. The situation is worse for health care workers who had not been provided with adequate PPE kit. The scheme to unemployment wages provided by the state to the workers is plagued with a major issue. The employees' state insurance scheme is available only to those who are in the organized sector.

The Important judgment of courts to protect our article 21 during this period

During pandemic in a PIL interim order passed by the Supreme Court to direct the government to ensure that testing for COVID19 is conducted free of charge in all private lab. The Supreme Court has kept the issue of reimbursement of the private labs by government open being considered in the further hearing. In other case, the Supreme Court stated that "Right to Life Can't be Taken Away Due to Lockdown, Judgment during Emergency Retrograde". The court has ordered that right to life and personal liberty could not be affected adversely on the ground of the lockdown and hence, delay by police to file a charge sheet will entitle an accused to bail.

Telangana HC Points Out Loopholes in Police Claims on Brutality During Lockdown. Hearing a Public Interest Litigation (PIL) regarding police brutality during the lockdown, the Telangana high court pointed out a series of discrepancies in the police's counter-affidavit, asking the

state police "to submit the injury reports of the injured persons, their statements, if any recorded by the police, and further to inform this court with regard to the progress made in the departmental inquiries, which have been initiated against the delinquent police personnel". (The order was passed by a bench of Chief Justice Raghvendra Singh Chauhan and Justice B. Vijaysen Reddy.) The supreme court in its landmark judgment of consumer education and research center and other vs. union of India and ors.

While enforcing the right to health of the workers working in the hazardous industries held that "the compelling necessity to work in industries exposed to health hazard due to indigence to bread winning for himself and his dependents should not be at the cost of health and the vigor of health care worker falls under the contours let down in the judgment there making the lack of PPE to grave violation of the fundamental rights of the health care worker. A PIL was filed in the Supreme Court for the "payment of minimum wages to migrant workers whether employed by establishments, contractors, or self-employed." Supreme Court ordered to States/UTs to releasing prisoners on parole/bail to protect them from Corona virus. Supreme Court directed each State/Union Territory to constitute a High Powered Committee to determine which class of prisoners can be released on parole or an interim bail and also provide medical facilities to ill prisoners and maintain social distancing among them.

Major steps were taken by the government to protect art 21 during COVID19

The government has introduced the Aarogya Setu mobile application to educate citizens about the novel Corona Virus and help them make informed decisions amid the crisis. The government provided 5 kg cooking gas cylinder to the poor families and also extend Ujjwala scheme is providing free LPG refills for the next three months. During the lockdown government provided food for poor people and also provided "one nation one ration

card" for BPL families. Under this announcement, the government will provide 5 kg grain per family till November 2020. The government is providing free testing and treatment of patients of COVID19. All government hospitals change into COVID hospitals. The Government has also provided proper food and medical facilities to the quarantine people. To the protection of the healthcare worker, doctors, nurses provide PPE kit by government. During the pandemic government providing medical insurance cover of Rs. 50 lakh per person for health workers. He gave the permission to local kirana store for providing essential goods. He also permitted vegetables, fruit, milk & bread to open their shops during the lockdown.

The Government encouraged online classes for the continuation of education. The government started to telecast classes on television. It also decided to promote the students to continue his session. Jharkhand government took initiative to continue the study of students to start a concept of a return to the village.

Due to COVID19 those who migrate from town to village government has decided to the provided job under the MGNREGA. Wages also hiked to Rs. 202 from Rs 182. For lower-income groups, the government permitted that individuals could now withdraw three months' salary from E.P.F. Under the National Social Assistance Program, Rs 1,400 crore has been disbursed for old age people, widows, and disabled people. For construction workers, the relief government released Rs 3,066 crore under the Building and Construction Workers' Fund. For poor women Jan Dhan account holders received Rs 500 each in their account. The Government started sharmik special train for the migrant workers.

These are the above major steps taken by the government to protect the citizens' right to life and liberty during the pandemic.

Conclusion

From the above discussion, we come to the conclusion that fundamental rights are essential for the overall development of the individuals. In the Indian constitution chapter-III there are 6 fundamental rights enjoyed by Indians. Among them, article 21 right to life and liberty in the heart of all rights. As we know we are facing a pandemic of COVID19 and due to this our right is also affected by it. About 20 million people did not have money to buy grain and bread for two times. They were suffering from hunger. This affects their right to life. There is a restricted movement of people with reduced consumption of all sorts of goods and services. Except for certain essential commodities and services. Livelihood is in danger of irreversible. Our education and medical facilities are also adversely effected during the pandemic. The government has taken major steps to protect our right to life and liberty. Judiciary has also played a vital role during this period like the judgment for medical facilities, regarding salaries, migrant workers, people's privacy, etc. We have learned that we should prepare to combat this type of pandemic our medical system should be sound and our small scale industries should also be well established. Each and every village should be selfreliant for their basic needs. Along with education, all the administrative parts should be digital. At last, people should be aware of their rights which are helpful for the establishment of a better democratic country.

References

- Avasthi AP. "Indian Government and politics." Agra, Lakshmi Narayan Agarwal, 2009-10.
- Basu DD. "Introduction to the Constitution of India" New Delhi, Lexis Nexis, 2019.
- Fadia BL. "Indian Government and politics." Agra, SBPD Publication, 2018.

- Johari JC. "Political Science" Agra, SBPD Publication, 2018.
- Kashyap Subha. "The Constitution of India" New Delhi, Vitasta Publication Pvt. Ltd, 2019.
- The Constitution of India [As on 1st April, 2019] Government of India, Ministry Of Law and Justice, Legislative Department, 2019.
- In Re: Contagion of COVID19 Virus in Prisons, 2020 SCC Online SC 344, order, 2020.

Formation of copper oxide film by thermal oxidation of copper film and their photoresponse

Chinmoy Rajak

Abstract

In this article, we report the synthesis of mixed phase samples of Cu, Cu_2O and CuO by air ambient thermal annealing of DC sputter deposited Cu thin films. Electrical characterization, namely, the I-V characteristics of the oxidized films have been done. It is found that one of the samples, when exposed closely to different low cost and easily available light sources such as different coloured LEDs, smartphone flashlights etc., shows a wide change in the resistance value, thereby proving that the electrical property of the above mentioned sample is photo-sensitive even with easily available light sources.

Keywords: Cu oxide, Nanocrystals, Oxidation, Photoresponse

1. Introduction

Copper has two stable oxide phases: Cu_2O and CuO. Both the oxides offer a wide range of applicability in different areas. CuO can act as a burning rate catalyst in rocket propellent [1]. It can also be used as an inexpensive and efficient catalyst for many purposes [2-3]. It has also been reported

that it can act as a transmission based opto-electronic humidity sensor [4]. On the other hand, Cu_2O is a largely successful material in the photovoltaic applications [5]. It is a promising material to be used in glucose sensing with high stability and repeatability [6]. Most importantly all copper oxide based thin film materials are good candidate forapplications in solar cells [7].

A lot of methods have been used to synthesize these two materials, their nano-structures and composites. Those include sol-gel spin coating [8-9], thermal evaporation method [10], thermal oxidation of copper thin films synthesized by thermal evaporation [11] etc. But there are very less reports on the synthesis of mixed phase samples of Cu, Cu_2O and CuOby air ambient annealing of sputter deposited Cu thin films. Although the electrical properties of the mixed copper oxide phases with CuO and $Cu_{64}O$ has been reported [12], there are not many reports on the electrical properties of the copper oxides with mixed phases of Cu, CuO and Cu_2O. Also, since the corresponding wavelength of the band gap of both the oxide compounds fall in the visible range[13-14], it will be very interesting to study the variation of the electrical properties with ambient light and in darkness. All these factors together serve as the motivation for the present work. Here, we report the successful fabrication of mixed phases of copper oxides by annealing the copper film in air at relatively low temperatures (300 ^{0}C). These mixed phases are found to be very much sensitive to light showing enhanced photo-response. Such an enhancement of photo-response of copper oxides can make it possible to these as photodetector.

2. Experimental

Cu thin films were deposited on glass substrates using the DC/FR magnetron sputtering system (Excel Instruments) from a Cu target of 2 inch diameter with purity of more than 99.9%. Prior to deposition of the films, the chamber was evacuated to a base pressure of 5.6×10^{-6} mbar using a turbomolecular pump with backing pump.Then ultra pureArgon

gas was purged into the deposition chamber at a rate of 20.00 standard cubic centimeter per minute (sccm) which decreased the base pressure to ~2.5×10^{-3}mbar which was maintained throughout the deposition process.Adirect current (DC) voltage supply (ADL 50 Watt power supply)was used to provide the necessary voltage to the gun used for sputtering the Cu. The value of DC power was slowly increased (1 Watt per minute) to 30 Watt and kept fixed at this value. In this condition, the plasma of Cu was produced inside the deposition chamber and was visible from the windows of the sputtering system. A shutter infront of the glass substrate was used to prohibit the deposition of Cu atoms. After removing the shutter, deposition of Cu film started with a rate of 0.83+!/sec (according to the quartz crystal thickness monitor) and film deposition was continued for about 10 min. On completion of deposition process, the samples were carefully taken out of the chamber and they were annealed in a muffle furnace for three different temperatures viz 100, 200, and 300°C for duration of 2 hours in ambient air. Annealing in air is expected to produce oxide phases (Cu_2O and/or CuO) of Cu. For this study, four of the samples (one as-grown and three annealed) were used.

All the four samples were characterized using X-ray diffraction (XRD) technique with theAXRD benchtop powder diffraction system (PROTO Manufacturing Co.) with Cu-$K_á$radiation (ë = 0.154 nm) in the scan range [angle, 2è] from 20° to 80° at a power of 600 Watt (voltage: 40kV and current: 15mA) with the step of 0.02°. For carrying out the electrical measurements, two spots were made on each of the films using silver paste at the extreme ends along the length of the sample and very thin copper wires of negligible resistance were attached as leads to the spots. The current-voltage (I-V) measurements were carried out using the probe station from EVERBEING and the SMU with required software from KEYSIGHT in the range of voltage from 0 V to 10 V. The I-V measurements were also carried out for different lighting conditions viz in dark, green,

blue and white light etc. For green and blue lights, we have used commercial light emitting diodes (1.5 Watt), and for white light we have used the flashlight of smartphone (Samsung Galaxy M21 smartphone flashlight with level 5 intensity). While carrying out the measurement the sample was closely exposed to these lights.

3. Results and Discussion

Figure 1 shows the XRD patterns for all the Cu films deposited on glass before and after annealing in air.For the as-deposited film, two XRD peaks at 43.40° and 50.38° positions for 2è values are seen. These peaks are identified as the (111) and (200) planes of the face centered cubic structuredCu crystal [15]. The peak intensity of (111) plan is seen to be very strong as compared to that of (200) plan. This indicates that the Cu film is preferentially grown in the (111) direction during its deposition. Such preferential growth of the Cu film is due to the free energy of this minimum compared to other planes [16]. It is to mention that the traces of other impurities including oxide phases of Cu are not found in the XRD pattern of the as-deposited film. The average grain/crystallite size, D, of the Cu film can be estimated using the Debye-Scherrer formula

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (1)$$

Where D is the crystallite size, K is the shape factor (usually taken to be 0.9 for spherical particles), ë is the wavelength of the X-ray used in the XRD process (1.54 +! in our case), â is the full width half maxima (FWHM) of the corresponding XRD peak and è is the Bragg angle. To estimate to grain size, it is required to correct the FWHM for the instrumental broadening which is $\hat{a}_0$ = 0.103 for the XRD machine used. This way estimated grain size of the as-deposited Cu film is 6.51nm.

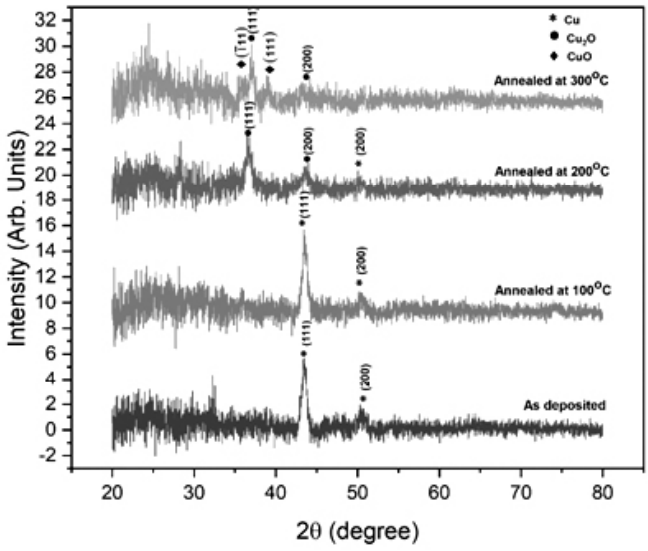

Figure 1 : XRD pattern for the as-deposited sample as well as the annealed samples plotted together

After annealing the as-grown Cu film at 100 ^{0}C, the intensity of both the XRD peaks corresponding to (111) and (200) planes of Cu are found to increase without any new phase formation. Such increase of peak intensity is indicative of grain-growth of Cu film due to thermal energy supplied at elevated temperature viz 100 ^{0}C. The peaks in the XRD pattern for the sample annealed at 200 ^{0}C have changed except the peak corresponding to (200) plane of Cu. The positions of these new peaks are at 36.69° and 43.69° of 2è values. These peaks are identified as the (111) and (200) crystalline planes of Cu_2O crystal [17]. So Cu_2O phase is seen to form in the annealed at 200° C film. Although, the trace of Cu is present in this sample, most of the Cu got converted to Cu_2O. Such phase formation on annealing the Cu film at 200 ^{0}C is due to the oxidation of Cu in presence of

atmospheric oxygen which got migrated in the Cu film at elevated temperature and formed the Cu_2O. For this sample also we have calculated the grain sizes using eq. (1) and estimated as10.19nm. However, annealing at 300 0C, a mixed phase of Cu_2O and CuO are found in the XRD pattern with peaks at 35.97°, 37.07°, 39.08° and 43.21° positions of 2è values.

The first and third peaks correspond to the ($\bar{1}$11) and (111) planes of CuO crystal [18] whereas other two peaks are for Cu_2O crystals discussed above.These data are consistence with the previously reported results [17].Temperature induced thermal diffusion process of Oxygen leads to the formation of oxide phases, within the limit of chemical activation energy [19]. The average grain sizeof CuOcrystals in the sample annealed at 300 °C is11.50 nm. Table 1 shows the summary of phases formed in Cu films.

Table 1: Different phase formation annealing the Cu films at different temperatures in air

Sample	**Phase**
As-grown	Cu crystals
Annealed at 100 ^{0}C	Cu crystals
Annealed at 200 ^{0}C	Cu and Cu_2O crystals
Annealed at 300 ^{0}C	Cu_2O and CuO crystals

Figure 2 shows the current-voltage relationship for both the oxidized samples. Both the samples show Ohmic I-V characteristics. Although the dominant phase at 200^{o}C is Cu_2O and that at 300^{o}C is CuO and the former oxide is more resistive than the later [20-21], It is clearly observed that the sample annealed at higher temperature is more resistive than the other one.. This may be attributed to the fact that at higher temperature more surface layers of the film are oxidized and therefore resistivity increases.

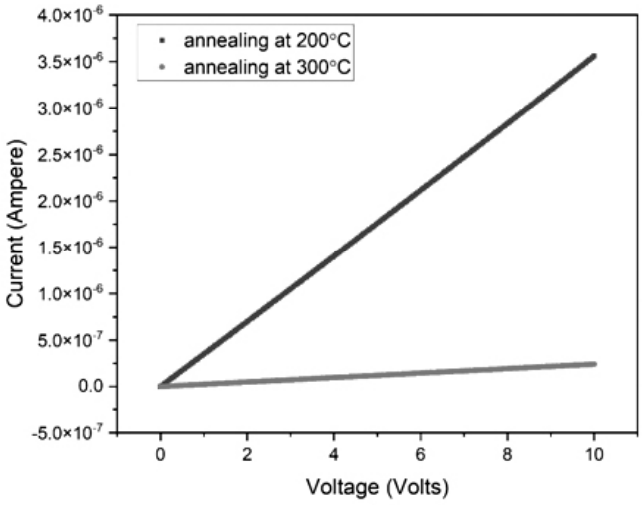

Figure 2 : I-V plot for the oxidized samples

The values of the resistances of the samples were measured by calculating the inverse of the slope of the I-V straight line fitted graph and the sheet resistance was calculated from the standard formula are 2.82 M&! and 41.7 M&! for the films annealed at 200°C and that at 300°C, respectively.

Figure 3 shows the I-V data for the sample annealed at 200°C for different lighting conditions which are created by very low cost and easily available light sources. The plot shows a distinct change in current for different lights. This is attributed to the fact that the equivalent wavelength of the band gap of both the oxides fall in the visible region (2.17 eV)and therefore when visible light with different wavelength (energy) falls on the sample, some of the electrons in the valence band get sufficient energy to cross the band gap and they contribute to the electricity conduction. This proves that the I-V characteristics of the sample is highly sensitive to light

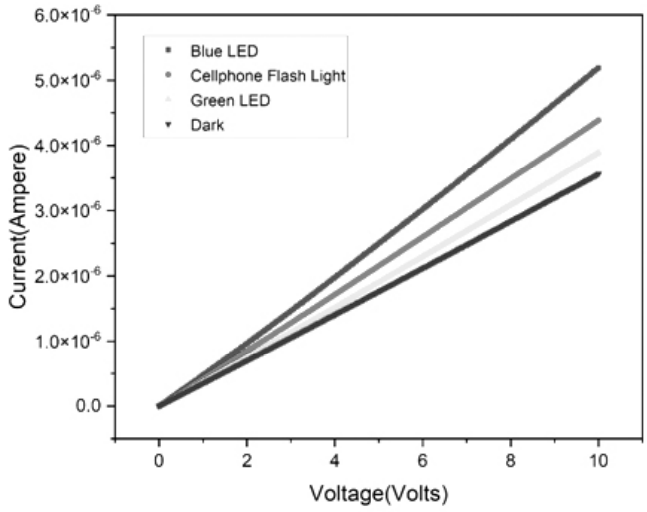

Figure 3 : I-V data for the sample annealed at 200°C for different lighting conditions

(energy) and therefore it is a good candidate material for light sensing devices.

Table 2 : Resistance, sheet resistance, and resistivity values in different lighting conditions for the sample annealed at 200°C

Lighting Condition	**Resistance (MΩ)**	**Sheet Resistance(MΩ)**	**Resistivity (&Ω)**
Dark	2.82	4.09	61.29
Green LED	2.57	3.74	56.07
Mobile Flashlight	2.28	3.31	49.71
Blue LED	1.92	2.79	41.10

Table 2 shows the values of the resistance, sheet resistance and resistivity at different lighting conditions for the sample annealed at 200°C. In this sample the Cu_2O phase is dominating but the resistive values are different (lesser) than those available in the literature [20-21]. This may be attributed to two facts. Firstly, the I-V characteristics shown here are the characteristics of both the thin film as well as the substrate together and also at 200°C the sample is not fully oxidized, only some upper layer is oxidized. This result is supported by the XRD data.

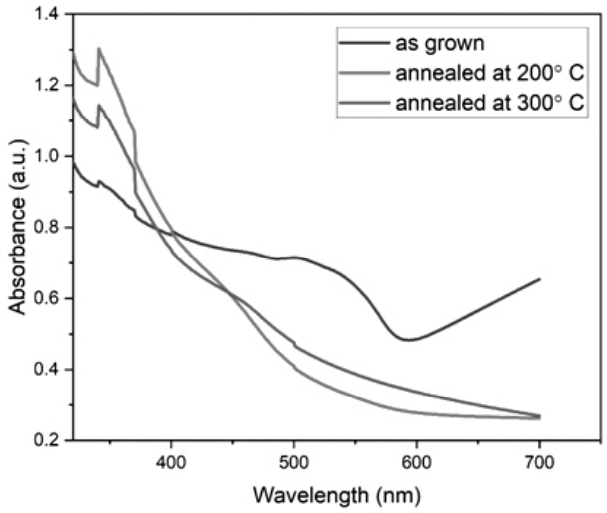

Figure 4 represents the UV-Visible absorption spectra of the samples. The as grown sample shows a hump from 500 to 600 nm wavelength range. The broadening of this peak may be due to the crystallite size variation of the sample [22]. The other two samples, namely the samples annealed at 200°and 300°C show a peak at about 350 nm which confirms the existence of oxide phases of copper [23]. This peak is also present in the as grown sample with lesser intensity which indicate partial oxidation of the sample.

4. Conclusions

The electrical property of one of themixed phase copper oxide and copper thin film sample, namely the sample prepared by air ambient thermal annealing at 200^0C for one hour after being sputter deposited by Cu on glass is highly photo-sensitive. It showsa large changein the sheet resistance value when measured in presence of lights of different light sources. Even for sources which low cost and easily available like different colored LEDs, mobile phone flashlight, etc., the sample showed a change of about 9×10^5&! in the sheet resistance value. This property makes nanocrystalline Cu_2O an excellent candidate material for light sensing devices.

Acknowledgements

I would like to acknowledge Sandip Das, SaikatSantra, Rajesh Mandal,Arka Mandal and SubhamayPramanik for their help during the film deposition and characterization of the samples. I would like to thank Probodh Kumar Kuiri for fruitful discussions.

References

[1] Singh J, Kaur G, Rawat M. "A Brief Review on Synthesis and Characterization of Copper Oxide Nanoparticles and its Applications". J BioelectronNanotechnology1(1) (2016)

[2] Raju Poreddy, ChristianEngelbrektAndersRiisager, Catal. Sci. Technol., "Copper oxide as efficient catalyst for oxidative dehydrogenation of alcohols with air", 5 (2015)

[3] Zhang et al., "Copper oxide–graphene oxide nanocomposite: efcient catalyst for hydrogenation of nitroaromatics in water", Nano Convergence 6(6) (2019)

[4] B. C. Yadav , Samiksha Sikarwar, AbhisiktaBhaduri and Praveen Kumar, "Synthesis, Characterization and Development of Opto-Electronic

Humidity Sensor using Copper Oxide Thin Film", International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 2(11)(2015)

[5] Zhigang Zang, Atsushi Nakamura andJiroTemmyo, "Single cuprous oxide films synthesized by radical oxidation at low temperature for PV application", Opt. Express 27, 30449-30449 (2019)

[6] Pagare, P.K., Torane, A.P., "Band gap varied cuprous oxide (Cu2O) thin films as a tool for glucose sensing", Microchim Acta 183, 2983–2989 (2016)

[7] Terence K. S. Wong , SiarheiZhuk, SaeidMasudy-Panah and Goutam K. Dalapati, "Current Status and Future Prospects of Copper Oxide Heterojunction Solar Cells", Materials, 9(4), 271 (2016)

[8] D. S. C. Halin, Talib, R. Daud, and M. A. A. Hamid, "Characterizations of Cuprous Oxide Thin Films Prepared by Sol-Gel Spin Coating Technique with Different Additives for the Photoelectrochemical Solar Cell", Photovoltaic Materials and Devices 2014 Article ID 352156

[9] Naoual Al Armouzi et al., "Effect of annealing temperature on physical characteristics of CuO films deposited by sol-gel spin coating", Mater. Res. Express 6 116405 (2019)

[10] L.S. Huang, S.G. Yang, T. Lia, B.X. Gu , Y.W. Du, Y.N. Lu, S.Z. Shi, "Preparation of large-scale cupric oxide nanowires by thermal evaporation method", Journal of Crystal Growth 260 (2004),130–135

[11] Ahalapitiya H. Jayatissa, K. Guo, Ambalangodage C., Jayasuriya, "Fabrication of cuprous and cupric oxide thin films by heat treatment", Applied Surface Science 255, 9474–9479 (2009)

[12] Mohammed S.Alqahtani, S.H.Mohamed, "Effect of oxidation time on structural, optical and electrical properties of mixed copper oxides nanocrystallites", Optik,173, 101-109 (2018)

[13] Yue Chen et al., "Band gap manipulation and physical properties of preferred orientation CuO thin films with nano wheatear array", Ceramics International, 44(1), 1134-1141 (2018)

[14] Y. Wang, P. Miska, D. Pilloud, D. Horwat, F. Mücklich, and J. F. Pierson, "Transmittance enhancement and optical band gap widening of Cu2O thin films after air annealing", Journal of Applied Physics 115, 073505 (2014)

[15] W. Lawrence Bragg, "The crystalline structure of copper", The London Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 28 (165) –(1914)

[16] Ik-Jae Lee et al., "Epitaxial growth and characterization of Cu thin films deposited on Al_2O_3(0001) substrates by magnetron sputtering", Material Letters, 229 (2021) 130119

[17] Wenzhong Wang et al., "Synthesis and Characterization of Cu2O Nanowires by a Novel Reduction Route", Advanced Materials, 14 (1) (2002)

[18] CH. Ashok et al., "StructuralanalysisofCuOnanomaterialspreparedby novel microwave assisted method", J. Atoms and Molecules/ 4(5); / 803–806 (2014)

[19] Sumita Choudhary, J. V. N. Sarma, Surojit Pande, et al., "Oxidation mechanism of thin Cu films: A gateway towards the formation of single oxide phase", AIP Advances 8, 055114 (2018)

[20] V. Figueiredo et al., "Effect of post-annealing on the properties of copper oxide thin films obtained from the oxidation of evaporated metallic copper", Applied Surface Science 254 (2008) 3949–3954

[21] Flora M. Li et al., "Low temperature (<100 °C) deposited P-type cuprous oxide thin films: Importance of controlled oxygen and deposition energy", Thin Solid Films 520 (2011) 1278-1284

[22] Jayaraman Ramyadevi et al., "Copper nanoparticles synthesized by polyol process used to control hematophagous parasites", Parasitol Res (2011) 109:1403–1415

[23] D. Berra et al., "Green synthesis of copper oxide nanoparticles by Pheonix Dactylifera L leaves extract", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 13(4) (2018) 1231-1238

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

Occupational Diversification in India a Theoretical Explanation

Mrinmoy Kumar Pal

Abstract

Indian labour markets are in a process of sound transformation. An important element of this transformation is the twin-process of de-industrialization and growing of non-standard work. Among the employed workers, up to the 1990s, important Indian states were characterized by high shares of industrial employment and relatively standardized working conditions. This employment model, as if often argued, was characterized by stable career patterns in internal or occupational labor markets and relatively homogeneous wage levels. While there are numerous factors which will influence employers' hiring choices in reality, the human resource literature typically highlights a key set of factors, which we argue can be summarized in two main elements: the replaceability of workers and the flexibility of hiring practices.

Key words: Labour, occupation, employment, reparability, flexibility

Jel Classification: J2, J3, J5,J7

Introduction

However, it is safe to say that in the era of dominant public sectors, Indian

labor markets tended to produce more egalitarian labour market outcomes than we observe them today. Starting in the 1970s and 1980s, the decline of industrial employment. However, with growing shares of service sector employment, most Indian labour markets seemingly lost the ability to ensure standardisation of employment relationships. The symptoms in the form of growing wage inequality and non-standard employment have been described in the literature extensively (e.g. Barbieri, 2009; Boeri and Garibaldi, 2009; Bosch et al., 2009; Palier and Thelen, 2010). An important mechanism linking deindustrialization to growing inequality is the famous Baumol Effect: in labor-intensive service jobs, productivity cannot be increased easily. As opposed to the virtuous circle in the industrial era, in which productivity gains led to higher wages and increasing demand, the expansion of the service sector requires a wage structure mirroring productivity (Esping-Andersen, 1993; Iversen and Wren, 1998). If wages are, however, rigid countries may not respond with greater wage dispersion but with an increasing differentiation by employment contract, i.e. "dualisation" between permanent and temporary work (DiPrete, et al., 2006; Maurin and Postel-Vinay, 2005; King and Rueda, 2008).

This research paper states finds that, first, deindustrialisation and service sector growth are important factors driving changes towards more unequal labour market outcomes and that, second, we can expect to observe marked differences in the growth of 'bad' or 'cheap' jobs across sectors and occupations within parts of the countries. This insight may appear trivial, as a reference to deindustrialization is commonly made when labor market change is discussed academically. We content, however, that its implications have so far not been fully reflected upon in existing research.

Literature Survey

In the comparative welfare and labor market literature, the discussion of change (i.e. the growth of non-standard employment and wage dispersion) strongly focuses on the development of national averages over time. As

we argue, this dominant approach focusing on national data tends to neglect crucial differences in labor market patterns across sectors and occupations. Although various contributions have shed light on developments in selected low-skill occupations, we still lack a systematic research agenda for the study of within-country variation in the process of labor market change. A similar point can be made regarding cross-country differences in patterns of labour market inequality. In the comparative literature, cross-country variance in inequality and nonstandard work are mainly attributed to institutional differences.

To study within-country variation in employment patterns, it is crucial to go beyond popular dichotomies like industry vs. service sector or skilled vs. unskilled labor. A simple sectoral distinction is unlikely to capture the diverging labor market trends within countries. The same holds for skill divides. Whereas education used to be translated into a favourable labour market position, this mechanism is weakened in postliberalised societies. However, such occupational differences are under-theorized and underresearched and we have little systematic knowledge about why bad jobs are distributed unequally across occupations.

Research Questions

This research tries to answer why does the share of flexible and/or cheap employment differ across occupations? The unequal incidence of non standard work is a good starting point for our occupational model explaining the use of non-standard work is understanding employer preferences for different types of employment when making a hiring decision. Hence, we need to ask how employers seek to optimize the use of labor within a given institutional framework.

Methodology and Analysis

Generally, we assume that employers try to establish employment relationships with "the lowest bill for a given set of technological choices

and labor market conditions" (Osterman, 1987: 54). Such choices and conditions vary across occupations. In general, we could assume that employers facing uncertainty always try to maximize flexibility. So why don't they give temporary contracts to all workers? It is important to acknowledge that flexibility has costs for employers as well. In particular permanent contracts are agued to be key in nurturing a psychological contract, i.e. "a set of unwritten reciprocal expectations between an individual employee and the organization" (Schein, 1978: 24). This contract can be desirable from an employers' perspective as it commits workers to the goals of an organization and leads to extra effort and productivity. Temporary workers, however, are found to have a more limited psychological contract. In other words, temporary workers invest less in building an employment relationship going beyond a short term economic transaction. This certainly is undesirable for employers having an interest in reducing staff turnover. Whether lower organisational commitment also leads to lower productivity is disputed in the literature. This arguably depends strongly on the nature of the temporary job (e.g. its duration) and prospects for making a transition into a permanent contract within the firm. If the current job is seen as a stepping stone in an internal career ladder, temporary workers should be even extra motivated and productive. The findings by De Cuyper et al. (2009) support this intuition. One important additional source of 'flexibility costs' for employers is that the extensive use of non-standard work may have a negative effect on work relations with permanent staff. Guest and Clinton (2009) find that there is a negative relationship between the share of temporary staff in a firm and workers' trust in the management as well as with perceptions of organisational fairness and fulfillment of psychological contracts. This can, for instance, lead to increased turnover intentions among permanent workers. Hence, employment flexibility has potential costs for employers and it is important to understand under which conditions they prevail over its advantages. While there are numerous factors which will influence employers' hiring

choices in reality, the human resource literature typically highlights a key set of factors, which we argue can be summarized in two main elements: the replaceability of workers and the flexibility of hiring practices. Replaceability refers to the costs of the employer in case he needs to replace a worker by recruiting from the external labour market. The higher these costs, the more we expect employers to offer favorable working conditions which bind workers to the firm. This would include permanent contracts, working time corresponding to the worker's preferences and decent wages. The second aspect is the flexibility of hiring practices, i.e. the absence of restrictions on the management's prerogative to hire and fire at will or to freely negotiate wage levels. However, such restrictions may also encourage employers to exploit loopholes to regain their flexibility as long as workers can be replaced. The important point for our argument is that both the replaceability of workers and the flexibility of hiring practices are not homogeneous within the institutional setting of a national labour market. Rather, they differ across sectors, occupations and individuals. For the purpose of our analysis four causal factors are deemed relevant here:

1. labour supply and demand conditions,
2. the type of skills mainly required,
3. the power of unions expressed by collective bargaining and co-determination,
4. the extent to which labor market institutions constrain management decisions,

The first two points affect the replaceability of workers, while the latter two affect the flexibility of hiring practices. The first factor explaining occupational heterogeneity is the balance of labour supply and demand. The link to the costs of replacing a worker is straightforward. If there is a shortage in the supply of a particular type of work, recruitment costs go

up. This should encourage more stability-oriented human resource practices in the respective occupation. Beyond this general point, labour supply can constrain employers in other ways. For instance, a production model based on part-time work is only feasible if a sufficient number of people are willing to accept such work. Hence, whether employers can rely on flexible work depends on whether there is a sufficient supply of labour in the respective occupation. In practical terms, this means the availability of typical 'risk groups' such as the young, women, or migrants (Kahn, 2007). The second factor influencing the replaceability of workers is the prevailing skill profile in an occupation. First and foremost, this refers to the skill level, i.e. the marginal productivity of a typical worker in the occupation. The lower this is, the higher the incentives to offer (and the pressure to accept) atypical contracts or low wages. Usually, low skilled workers are easier to replace than medium and highly skilled people, since no or little training investments are necessary. At the same time, many jobs requiring limited and basic skills can also be replaced by higher capital intensity or off shoring. This limits both employer demand for low skilled workers and the bargaining power of such workers. Moreover, the type of skill (general vs. firm-specific) should matter. The concept of skill specificity has been used in very different ways (Streeck, 2012). Here, specific skills simply refer to qualifications which are more valuable in one firm than in another. Since such qualifications cannot be 'bought' in the market, but have to be developed within the firm, employers cannot easily replace specifically qualified workers. To the extent that jobs involve specific skills, employers should be interested in stable employment relationships rather than temporary contracts (Autor, 2003). In contrast, generally skilled workers are by definition easier to replace since there are sunk costs of specific training investments. Skill specificity confines the use of temporary workers to support or peripheral tasks within the company as they cannot be integrated effectively into core activities (Lautsch, 2002; Lepak and Snell, 1999). Hence, the role of flexible employment is expected to be smaller

in occupations which are strongly characterised by firm-specific skills. It is noteworthy that skill specificity may explain why some academic occupations feature high shares of flexible work as well (e.g. Polavieja, 2005). Arguably, in highly individualized and autonomous service sector jobs, in which the personal interaction with the client dominates, firm-specific knowledge is relatively scarce. However, a big chunk of service sector jobs is located in large companies with idiosyncratic organizational procedures, products and technologies. Marx (2011) argues that this leads to rather specific skills in service occupations for instance in banking, insurance and the public sector. To the extent that service sector employers rely on firm-specific knowledge, employment patterns should converge to those of specifically trained workers in manufacturing. Replaceability of workers is not the only relevant factor. As a second step constraints on employers' flexibility (as imposed by industrial relations and legal requirements) are included into our framework. The diverging patterns of industrial relations across occupations are an obvious explanation for heterogeneity in labour market outcomes. High unionisation and collective bargaining coverage are the historical foundation of relatively standardised employment models which typically developed around manufacturing and the public sector. While unions are often still strong in this segment, in many countries they have difficulties in gaining ground in the service sector. The most extreme form of individualization is freelance work which is frequently performed in a quasi-dependent manner. In such a work setting, effective interest representation is difficult to achieve. Therefore, working conditions are expected to be more standardised in occupations in which workers are organized effectively. Collective bargaining coverage (or the lack thereof) should have an effect on wage compression and the scope of low-wage employment. The absence of either collective agreements in certain sectors or statutory minimum wages tends to be associated with higher wage dispersion and larger segments of low pay. Here, only statutory minimum wages or the extension of collective

agreements can set a generally applicable wage floor. Industrial relations are also important in monitoring compliance to labour market regulation. Where unions are weak on the firm level, employers have more leeway to bend existing regulation. Such a behavior can cover exploiting legal grey areas or bold breach of regulation, e.g. in the case of "dependent" self-employment. In any case, the strength of unions and the related enforceability of labour market regulation are important to understand employment patterns on the occupational level. Labour market regulation, finally, do not only vary in the extent to which they can be enforced. In principle they should apply to the entire economy and they are often used to explain cross-national differences in employment outcomes. However, also the de jure coverage of labour market institutions is not complete. First the public and the private sector usually differ with regard to the regulation of dismissals and remuneration. But also in the private sector, co-determination via works councils and statutory dismissal protection are a cases in point. Strict dismissal protection makes redundancies of workers on open-ended contracts costly and arguably makes employers reluctant to hire on a permanent basis (Bentolila and Bertola, 1990). Strong plant-level co-determination further strengthens the role of 'insiders'. However, in most countries the coverage of dismissal protection and co-determination is not universal. If an occupation is characterised by small-batch production, there may, for instance, be no obligation to accept a works council, which could constrain management's prerogative to hire on atypical contracts. The same is true for dismissal protection, which typically only applies to firms above a size threshold (Boeri and Jimeno, 2005). Hence, incentives for the use of fixed-term contracts or agency work should be significantly stronger in occupations characterised by larger firm size.

Table 1: The interplay of replaceability and flexibility

		Replacebility	
Flexibility		High	Low
	High	Unreliable Jobs	Good Jobs
	Low	Good Jobs	Best Jobs

The interplay of replaceability and flexibility is summarized in Table 1. Assuming that both dimensions

can be either high or low we create a 2x2 table with different combinations of the two dimensions. What are the consequences for job quality (good jobs are loosely defined here as those with wages contract type and working time in line with workers' preferences)? Generally, as explained above low replaceability should be to the advantage of workers. Under this condition, we would expect relatively good jobs irrespective of labour market regulation and industrial relations (i.e. flexibility). Here, working conditions are merely explained by employers' incentive structure as it can be derived from labour market conditions and skill requirements. If replaceability is however high (i.e. if required skills are either low or highly general and if there is a sufficient supply of these skills in the external labour market) flexibility matters. In such a case, the employer faces no incentives to curb his or her desire for flexible employment arrangement. In order to provide good jobs, external constraints in the form of unions or state regulations have to be imposed. One should note that such constraints are seen as the source of negative externalities which affect job seekers (in the form of lower employment opportunities) or future generations (in the form of higher accumulated debt) (Iversen and Wren, 1998). The framework presented in Table-1 can be applied as a heuristic tool to capture both within country differences across occupations and changes of specific

occupations over time. Skilled manufacturing jobs are typically assumed to feature high levels of skill specificity and remain a stronghold of unions (Palier and Thelen 2010). Accordingly, they should be stably located in the upper right quadrant of the table. Other jobs have moved over time.

Descriptive examples are auxiliary services such as catering or cleaning which used to be integrated into large industrial organizations. Outsourcing has significantly limited the possibility for unions to affect working conditions in these services, implying a shift from the lower to the upper left quadrant. Finally, it should be noted that there is at least one important occupational characteristic determining the use of non-standard and cheap labour which we have not touched upon so far, namely product market conditions. If occupations are exposed to demand fluctuations or pressure for price-competitiveness, incentives for employers to rely on non-standard/cheap jobs should increase. Within out framework, both product market conditions can be conceived of as moderators for the importance of replaceability and flexibility.

Conclusion

It can be said that low replaceability should be to the advantage of workers. Under such condition, we would expect relatively good jobs irrespective of labour market regulation and industrial relations. Here, working conditions are merely explained by employers' incentive structure as it can be derived from labour market conditions and skill requirements. If replaceability is however high flexibility matters. In such a case, the employer faces no incentives to curb his or her desire for flexible employment arrangement.

References

Addison JT, Schnabel C, and Wagner J (2007) The (parlous) state of German unions. Journal of Labor Research 28(1): 3-18.

Autor, D. H. (2003) Outsourcing at will: the contributions of unjust dismissal doctrine to the growth of employment outsourcing. Journal of Labor Economics 21(1): 1-42.

Barbieri, P. (2009). Flexible employment and inequality in Europe. European Sociological Review, 25, 621-628.

Boeri, T. and Garibaldi, P. (2009). Beyond Eurosclerosis. Economic Policy, 24, 409-461.

Boeri, T and Jimeno, J. F. (2005). The effects of employment protection: Learning from variable enforcement. European Economic ReviewVolume, 49(8), 2057–2077.

Brady, D. (2007): Institutional, Economic, or Solidaristic?: Assessing Explanations for Unionization Across Affluent Democracies, Work and Occupations, 34, 67-101.

Cahuc P, Postel-Vinay F. Temporary Jobs, Employment Protection and Labor Market Performance. Laabour Economics 2002; 9(1); 63–91.

De Cuyper N; et al. Literature Review of Theory and Research on the Psychological Impact of Temporary Employment: Towards a Conceptual Model. International Journal of Management Reviews 2008; 10(1); 25–51.

Emmenegger, P. (2009). Specificity versus replaceability: The relationship between skills and preferences for job security regulations. Socio-Economic Review, 7, 407-430.

Esping-Andersen, G. (1996): Welfare States in Transition: Social Security in the New Global Economy, London: Sage.

Freeman, R. B. (2007): Labor Market Institutions around the World, MBER Working Paper No. 13242. Goldthorpe.

J. H. (2000): On Sociology: Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory. Oxford, Oxford University Press. Guest, D. E. and Clinton.

Iversen, T. and Wren, A. (1998). Equality, employment, and budgetary

restraint: The trilemma of the service economy. World Politics, 50, 507-546.

Kahn, L. M. (2007). The impact of employment protection mandates on demographic temporary employment patterns: International microeconomic evidence. Economic Journal, 117, 333-356. King, D. and Rueda.

D. (2008). Cheap labor: The new politics of "Bread and Roses" in industrial democracies. Perspectives on Politics, 6, 279-297.

Marx, P. (2011): The Unequal Incidence of Non-Standard Employment across Occupational Groups: An Empirical Analysis of Post-Industrial Labour Markets in Germany and Europe, APSA 2011 Annual Meeting Paper.

Osterman P (1987) Choice of employment systems in internal labor markets. Indus-trial Relations 26(1): 46-67.

Palier B, Thelen K (2010) Institutionalizing dualism: complementarities and change in France and Germany. Politics & Society 38(1): 119-148.

Polavieja JG (2005) Flexibility or polarisation? Temporary employment and job tasks in Spain. Socio- Economic Review 3(2): 233-258.

Rousseau, D (1995): Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements, Thousand Oaks, Sage.

Streeck, W. (2012): Skills and Politics: General and Specific. In: Busemeyer, M. R. and Trampusch,C. (eds.): The Political Economy of Collective Skill Formation. Oxford, Oxford University Press, 317-352.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

TetMe-IBX: A Reactive Modified IBX

Kalyan Senapati

IBX has been being explored as a versatile oxidizing reagent in the field of organic synthesis since last three decayed.[1] IBX can be easily synthesized by using oxidizing agent Oxone or $KBrO_3$ in a laboratory form 2-iodo benzoic acid.[2] Although IBX have huge advantages in oxidative transformations in organic synthesis it has limitations i.e., i) IBX is insoluble in common organic solvents ii) IBX is explosive in nature and iii) in many cases excess amount of IBX needs to be used for a synthetic transformation making the methodology useless in industrial scale reactions.[3] In last couples of years several attempts have been made to modify IBX in order to overcome the limitations of parent IBX.

In 2005, Goddard III et al. proposed that modification of IBX via o-methyl substitution may increase the efficiency of alcohol oxidation by lowering the activation energy in rate-limiting step in the so-called "hypervalent twisting",[4] The latter is a coordinated motion of the ligands of IBX-alcohol intermediate to generate a stable, planar iodine (III) species, which is the byproduct of IBX in oxidations, that is IBA (Figure 1). It was predicted that in the case of o-methyl substituted IBX, the twisting increases the rate by 100 fold such that ligand-exchange becomes the rate determining step of the overall oxidation.

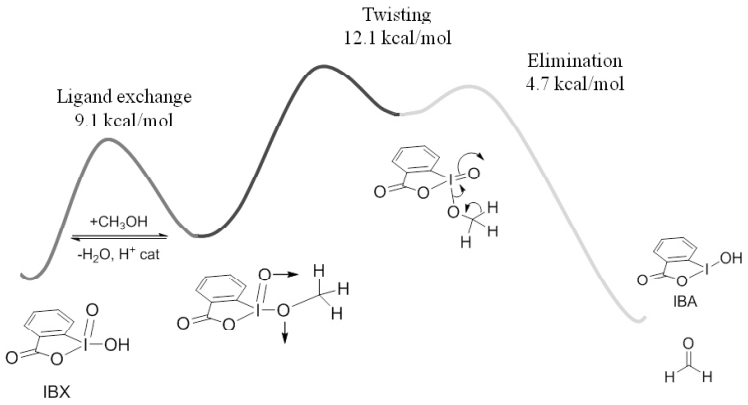

Figure 1. The mechanism of alcohol (methanol) oxidation with IBX and associated energy barriers as shown by Goddard III et al.

Moorthy et al. later synthesized a series of ortho methyl substituted modified IBX (Chart 1).[5] Out of all such kind of modified IBXs the most effective Modified IBX is TetMe-IBX. TetMe-IBX was synthesized from durene effectively in overall five steps (Scheme 1).

Chart 1

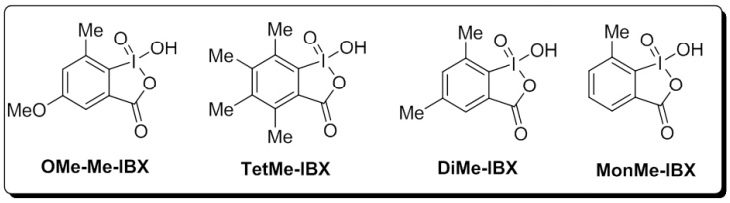

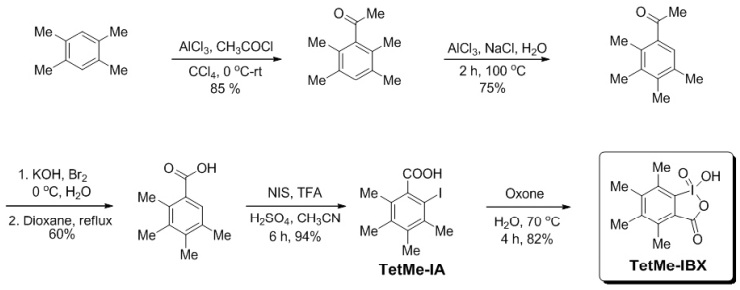

Scheme 1: Synthesis of TetMe-IBX from Durene

They reported that TetMe-IBX is capable to oxidize various kinds of alcohol in common organic solvents like Acetonitrile, Ethyl acetate, Acetone, DCM, Chloroform, etc. at room temperature within 10 min to 2 hours time duration. TetMe-IBX is also efficient to oxidize a series of Sulfides to Sulfoxides in DCM at rt (Scheme 2).

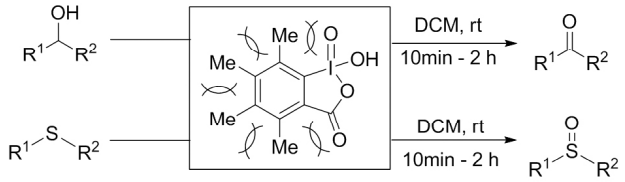

Scheme 2: Oxidation of alcohols and sulfides by TetMe-IBX at rt

The catalytic activity of 3,4,5,6-tetramethyl-2-iodobenzoic acid was further reported by Moorthy et.al. in presence of co-oxidant oxone. A series of alcohols was oxidized catalytically that is using 10 mol % of

3,4,5,6-tetramethyl-2-iodobenzoic acid and 1 equiv. oxone in Acetonitrile Water (1:1) medium, where primary alcohols oxidized to carboxylic acid and secondary alcohols oxidized to ketones with in the 2.8 -15 h. A selective oxidation of primary alcohols to aldehydes is also reported using same reaction condition in Ishihara medium[6] that is in nitromethane reaction medium instead of Acetonitrile- Water mixture within 6-18 h at rt (Scheme 3).

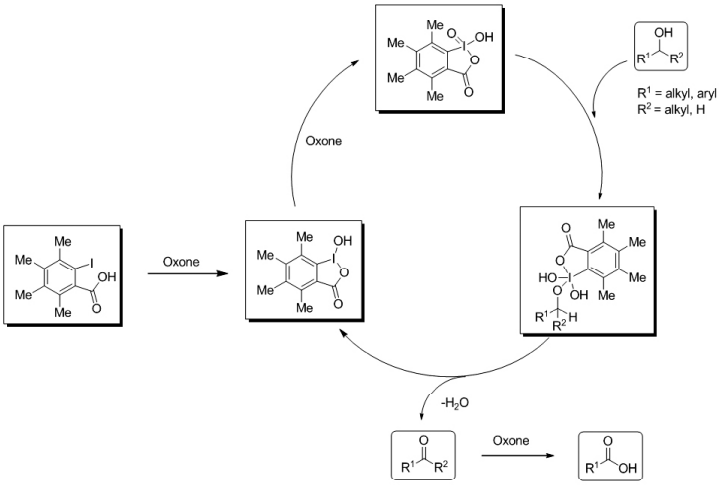

Scheme 3: Catalytic cycle for the oxidation of primary and secondary alcohols using 3,4,5,6-tetramethyl-2-iodobenzoic acid as catalyst

In 2014 Moorthy et al. reported the synthesis of lactones from diols using TetMe-IA as a catalyst.[7] They showed that in this catalytic oxidization diol is first converted to the corresponding lactole which again undergoes catalytic oxidation to the final product that is lactol (Scheme 4). This oxidation reaction occurs in situ generation of TetMe-IBX from TetMe-IA in presence of co-oxidant oxone in acetonitrile-water medium at rt.

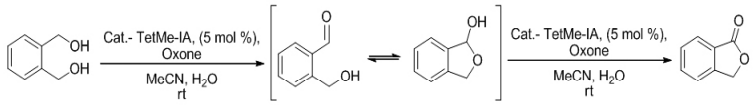

Scheme 4: Catalytic oxidation of diol by using TetMe-IA as catalyst

They also developed one-pot protocol for the synthesis of α-azidoketones starting from olefins.[8] In this transformation catalytic oxidation of the intermediary bromohydrins with in-situ generated TetMe-IBX from TetMe-IA in presence of co-oxidant oxone at rt is the key step (Scheme 5). The reaction has been performed by the formation of bromohydrine from olefin followed by catalytic oxidation of bromohydrine and treatment of $NaHCO_3$/NaN_3 in same pot to get the α-azidoketones.

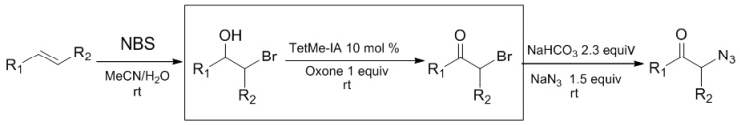

Scheme 5: Synthesis of α-azidoketones from olefins using TetMe-IA as Catalyst

Conclusion

Despite the fact that IBX is highly versatile oxidizing agent in organic synthesis, several attempts have been made for the synthesis of modified IBX in last couple of years. Undoubtedly TetMe-IBX is one of the most promising modified IBX come out with a lot of effective synthetic transformations, reviewed in this article. Further there are a lot of scope to explore the catalytic use of TetMe-IA and TetMe-IBX as a reagent in organic synthesis.

References

1. Yoshimura, A.; Viktor V. Zhdankin, V.V. Chem. Rev. 2016, 116(5), 3328.
2. a) Boeckman, R. K., Jr.; Shao, P.; Mullins, J. J. Org. Synth. 77, 141. b) Frigerio, M.; Santagostino, M.; Sputore, S. J. Org. Chem. 1999, 64(12), 4537.
3. Dess, D. B.; Martin, J. C.; J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 7277..
4. Su, J. T.; Goddard III, W. A. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 14146.
5. a) Moorthy, J. N.; Singhal, N., Senapati, K. Tetrahedron Letter 2008, 49, 80. b) Moorthy, J.N.; Senapati, K.; Parida, K. N.; Jhulki S.; Sooraj, K.; Nair, N. N. J. Org. Chem. 2011, 76(12), 9593.
6. Uyanik, M.; Akakura, M.; Ishihara, K. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131(1), 251.
7. Jhulki, S.; Seth, S.; Mondal, M.; Moorthy, J. N. Tetrahedron 2014, 70(13), 2286.
8. Chandra, A.; Parida, K. N.; Moorthy, J. N. Tetrahedron, 2017, 73(40), 5827.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

A couple of examples wherein computer programming leads to easy and better understanding and visualization of physical-mathematical concepts

Chinmoy Rajak

Corresponding author Sandip Das

Introduction

It won't be much of an exaggeration if we say that we are surrounded with computers today. Forget about large institutions, it's hard to find even a small office that runs without a computer. We have seen sectors where need of manpower has considerably decreased for the fact that a large portion of the process has been automated with the help of computers. The banking sector is an example of that. There are many more such examples that can be cited here. So, in a way, computers have become an integral part of our lives today. In many areas, our workload has been reduced due to computers programming and the field of scientific research is not an exception too. In the field of scientific research in Physics and Mathematics, computer programming plays a big role. It creates virtual environments that are similar to practical experimental conditions and yields predictive results. All experimental conditions are not easy to achieve and

also not easy to work with practically. Computer programming and simulation plays a big role in virtually achieving those conditions.

It turns out that topics of Physics and Mathematics can be represented to students in a very lucid form if we make them visualize the phenomena with the help of computer programs. In this article, two such examples are given where visualization of the results of an event/ concept leads to easy and better understanding of the concept.

1. An infinite series representing a function :

During our undergraduate Physics or mathematics courses we all have studied about infinite series that represent a function. Taylor series, Laurent series, Fourier series are such examples. But one might ask the question, 'How does an infinite series represent a well-defined function?'. After all an infinite series is the sum (or combination) of an infinite number of terms and infinity is something which is not defined. Nobody can claim that this number is equivalent to infinity or so.

It turns out that the series representing the function is an approximation to the function and it depends on how many terms (of the series) you are considering on how accurate you reach towards the function. The more terms you consider, you get closer and closer to the function. This can be shown very easily and very explicitly using a simple code in Python. Let us consider an example. Periodic functions can be represented as an infinite series of sines and cosines and this type of series is known as Fourier series. The Fourier series of a function is given by :

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Where f(x) is a periodic function with a period of 2L and a_0, a_n and b_n are coefficients that can be evaluated from the following realtions :

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$$

When asked to find the Fourier series of a periodic function, one just needs to calculate these coefficients and then right down the series in terms of sines and cosines. Let us now consider a square wave given by :

$$f(x) = -1 \text{ for } -3 \le x \le 0$$
$$= 1 \text{ for } \quad 0 \le x \le 3$$

This is a periodic function with a period of 6, i.e., the function repeats itself in exactly the same way after an interval of 6 units along the x axis. Now, the Fourier series of this function is given by

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{n=1,3,5\ldots}^{\infty} \frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{3}$$

Which is an infinite series. Now, it is going to be much easier for students to understand how the function is approximated by the series if they get a visual representation of the approximation. Figure 1 shows a plot of the function and the Fourier series of the function together. It

clearly shows that as we take more and more terms, the plot of the Fourier series of the function becomes closer and closer to the function itself. In the first figure in the top left corner, titled "n=2" contains only one term (as a_0 is Zero in this case) Now, as we move from one term to more terms, it is very clearly seen that how both the plots merge with each other gradually.

.

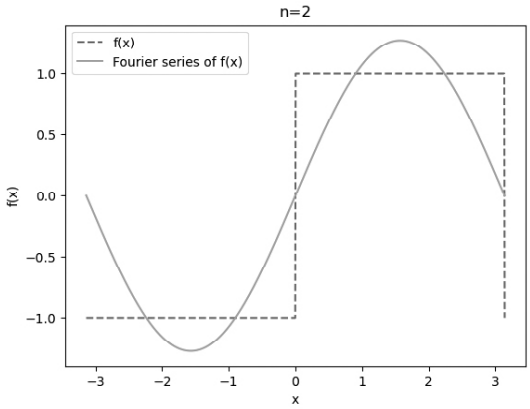

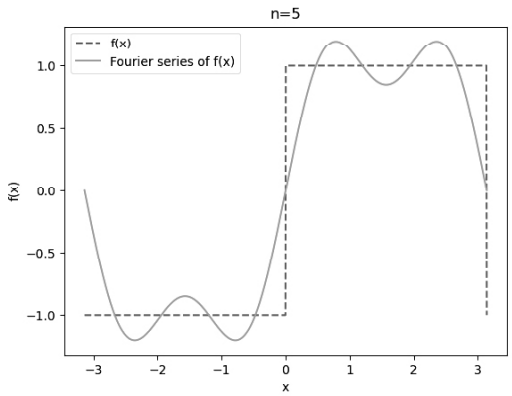

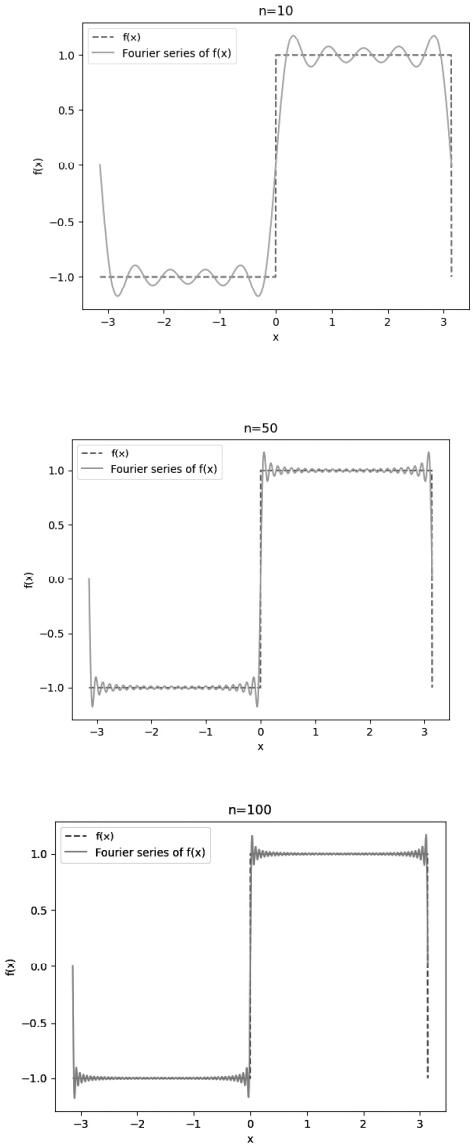

Figure 1 : Plot of a function with the series representing the function

2. Understanding the meaning of the value of probability of an event :

We all have studied probability theory in our high school mathematics but have hardly wondered the meaning of the value of probability of an event. Let us consider the common example of the tossing of a fair (unbiased) coin. We all have studied that the value of the probability for the event of occurrence of 'Heads' is 12 and so is the probability for occurrence of 'Tails'. But what does this value actually mean? Well, it certainly doesn't mean that if we toss the coin twice, once it will fall Heads and once tails. Roughly what it means is higher the value of the probability higher is the chance of occurrence of that particular event with 0 and 1 indicating absolute impossibility and absolute certainty respectively. But how to get to this value 12? It turns out that if we toss the coin a large number of times then the fraction of cases when heads (or equivalently tails) occur, i.e., the ratio of the number of instances when heads occurred and the total number of instances of tossing the coin becomes nearly equal to 12. Mathematically

$$\lim_{N\to\infty} \frac{H}{N} = \frac{1}{2}$$

Where H is the number of instances where heads have occurred and 5ØAÜ is the total number of instances of tossing of the coin.

This can be very easily visualized through simple code in python. Using the random number generator in python, an array of random numbers containing 0s and 1s only has been generated like the following:

[1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,….]

And then the value 1 is assigned to heads and the value 0 to tails (there is no harm in doing it the other way). Now if we take the sum of the array then we get the value of the total number of heads and if we count the total number of elements in the array then this gives us the total number of instances of tossing the coin. Taking the ratio of these two quantities we

can calculate . It can be clearly observed from figure 2 that this quantity always fluctuates around the value 12. Increasing the total number of elements in the array is equivalent to increasing the total number of instances of tossing the coin. As we increase the total number of trials the fluctuation of the probability value decreases and it comes more and more closer to.

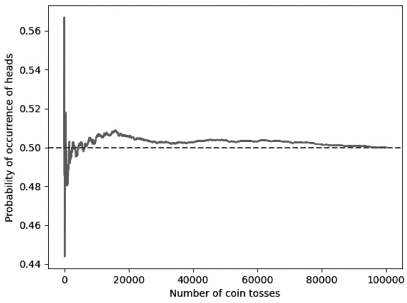

Figure 2 : Plot of the probability of 'heads' for different number of trials

Conclusions

In the above two examples, we have seen that how representing physical-mathematical concepts with computer programming leads to easy and better understanding. It goes to prove that if this type of representation is extended to other courses or topics then they can will appear more lucid to students thereby developing more interest and passion towards the subject.

References

[1] Mary L. Boas (1959, 1980), "Mathematical methods in the Physical Sciences", Wiley, ISBN : 978-81-265-0810-5

[2] Abhijit K. Gupta (2018), "Scientific computing in Python", Techno World, ISBN : 978-81-936788-8-6

[3] B. S. Grewal (2011), "Higher Engineering Mathematics", Khanna Publishers, ISBN : 81-7409-195-5

Peace and Value Education: Need of the Hour

Dr. Sanghamitra Roy

Abstract

The world has witnessed several challenges due to dreadful corona virus. Change is the essence of time and we need to realize to strengthen our basics to counter future challenges efficiently and effectively. The present age needs to see develop true human beings who could create peace, harmony and a progressive world. It is felt that the current educational trends must integrate peace and value education in curriculum at all levels. Good education will not only build character, enable learners to be ethical, rational and compassionate, but also it will prepare them for the future. Peace and value based education can be considered as the only enduring resolution in guiding and developing the students skills so that they are able to lead a purposeful life.

Key Words : Peace education, Value-education, Corona Virus, Resolution, Compassionate.

Introduction

The world has been facing an unparalleled, unforeseen and challenging times since the outbreak of COVID 19. This has wreaked havoc across the

whole world and like all the sectors, education has been hit hard. Due to this outbreak all kinds of institutions, and offices got shut down which resulted in difficult living situation for people. These lock downs and different restrictions keeping in mind the spreading of COVID 19, have resulted in an unknown fear about the virus and people have become skeptical about the moment when they will get rid of this virus forever. Remaining locked inside the four walls out of fear for the dreadful virus has caused mental diseases to people. The schools, colleges and universities were closed for several months and the students remained inside their houses, away from their peer groups and their teachers. These resulted in a deep impact in the teaching learning situation. As per the United Nations educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), more than 800 million learners across the world have been found affected due to the situation. People remained inside their houses which resulted in several economic, social and personal problems. In spite of prevailing of such a situation the teaching learning process did not stop. The birth of virtual class room could be realized by all involved in this teaching learning process.

COVID 19: the catalyst for digital classroom:

In spite of several problems and numerous constraints, these virtual class rooms came up as a whole new Universe. The education sector in India, has been witnessing a massive transformation with the changed scenario of educational platforms. Thus this acting of COVID 19 as a catalyst for digital adoption in school, college and university education has proved to be boon to the society. After the opening of the schools, it was felt that a careful strategy should be built in to smoothen the transition of students back to school after several months of home based learning. This was needed to be done keeping in mind the learning losses which resulted for the several months as well as the positive and futuristic approach which could build a strong resilient system to withstand any further future shocks.

Times of India (5th September 2020) reports that 'students have been learning on virtual platforms despite numerous constraints. Virtual class rooms are a whole new universe and bring very different social and learning challenges. Those who don't teach can only imagine a meeting call while staying at home – the difficulty of making students understand the lesson thorough the patchy networks, the disruptive power, a few unmuted mic and the tumult of many (TOI). Several social, economic, personal and societal problems brought about a chaos in the lives of people. These could be lessened or kept under control if the education system could embrace the human resources involved in it with values.

Education for constructive qualities:

This cannot be denied that education is considered to be the vehicle of knowledge, self-perseverance and success. Education provides the platform for acquiring the wisdom of social conduct, enhancing strength, polishing character and elevating self-respect. The set of values include the simple difference between the right and wrong, and understanding the importance of hard work and self-respect. When the world wrestles with poverty, malnutrition, terrorism, apartheid policies, insurgency, violence etc., the need of inculcating suitable habits and conducts is felt for the development of constructive qualities. Due to these reasons it is felt that enlightening the significance of peace and value education is the need of the hour. This can be a very significant task if peace and value education could be integrated with the curriculum across various disciplines.

Value education can be considered as an education based on values and the inculcation of values. It includes developing the appropriate sensibilities like moral, cultural, spiritual and societal. This can be considers as a 'man making' and 'character building' necessity. These values are desirable and are appreciated in high esteemed as they act as the guiding principles in the critical life situations. This is actually a wide gamut of learning and activities ranging from training in physical health, mental

hygiene, etiquettes and manners, appropriate social behavior, civil rights and duties, aesthetic and religious training.

Integrating peace in curriculum:

Change is the essence of time and so we need to realize the necessity of strengthening our basics to counter future challenges efficiently and effectively. In the 21st century it is needed that peace, harmony and a progressive world is created. Moral development of a child results automatically from the social life of the school and value education plays a colossus role in the process of making the child ready for adjusting himself to different adverse situations. The teachers, too, have a great role in generating new knowledge among his new students by nurturing good human values within them, thereby creating human wealth developed with good ethics, moral values, and a sense of care for everyone equally without any discrimination. These traits of his character would help him become innovators and researcher, creating new pathways for their successor in education. Thus, the need of integrating the peace of value education in curriculum at all levels of education is felt to prepare the future citizens for unknown pathways in jobs and carriers. To provide a meaningful preparation and development of students for largely unknown futures, an approach towards co-operative and collaborative participation, team work should be encouraged. This might result in inducing strength, patience, tolerance and resilience to deal with the several ups and downs people are facing presently. Moreover, the need for a sensitive society is also felt where people get inclined towards meaningful dialogue and deliberations regarding ethical, moral, professional development and growth of students, faculty, professionals and administrators through integrating peace and value education compulsorily in the class room to enable all these human resources to become agents guiding changes needful in the present scenario.

Other than the situation resulting from the outbreak of COVID 19, the

advancement in the field of Science and Technology has also created an almost aggressive surge for an ever higher standard of living. This has given a severe blow to human values and has led to the disregard of traditional beliefs, family values and spirituality. Despite all the comforts, higher standards of living, different forms of entertainment, advancements in Science and Technology, inner peace and a sense of purposeful living continue to elude majority of humanity. Moral values are disappearing from both public and private spheres. Every society is suffering from major issues like Juvenile Truancy, drug addiction, crime, suicide and declining mora; standards. Every society is, therefore, looking for solutions to free and save itself from its own ignorance and excesses. The existing education system sometimes comes out as a mere tool to equip a student with a technical skill to enable him to simply earn a livelihood in a competitive world and therefore, it fails to meet the deeper inner needs, fostering creativity and generation of wisdom. In turn, the students fail to realize the capacity of love, peace, harmony and well-being that he could spread. All such factors result in the realization of inculcating and integrating value education programme into the school curriculum. By doing this, the society can take a major leap towards the initiative at beating its menaces. Planning, grading and sequencing these value based materials should be initiated to uplift the moral and spiritual development.

The world has been suffering from various unaffordable natural calamities as a result of the man-made conflicts, pursuit to dominate and potent globally, and the idea of expanding its territories. If these situations are not addressed properly today, they may lead to catastrophe and destruction of mankind and the materialistic world along with the vast natural resources. Peace and value based education is only the enduring solution to develop students guide and help them in acquiring life skills to shape their future thereby, leading a purposeful life. This will empower them to realize their incredible talent and immense potential to become

more responsible, sensible and peaceful while emphasizing on values and character building. As is stated in National education Policy (NEP), 2020,

> 'Pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible and of course, enjoyable. The curriculum must include basic arts, crafts, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture and values in addition to science and mathematics, to develop all aspects of learners' brains and make education more well-rounded, useful and fulfilling to the ;earner. Education must build characters, enable learners to be ethical, rational, compassionate and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment (NEP: 2020)'

Peace education for utopian global community:

The 21st century has brought us to the platform where team work, sharing ideas and problems and achievements become the foundation for the advancements of 21st century skills like creativity, critical thinking, communication, collaboration knowledge and decision making. The United Nations Charter very rightly declares, 'Wars start in the minds of men.' Therefore it is clear that peace is a state of mind and the mind can be molded by the right type of value education. Peace has become extremely a crucial issue in present day world. Without restoring peace the entire humanity may face a consequence of total annihilation. No doubt, promotion of democratic principles, human rights awareness, development of moral education and training for conflict resolution definitely helps human being to establish a society without violence. Peace encourages attitudes that lead to a preference for constructive and non-violent resolution of conflict. It respects the diversities and disparities of culture at National and International level. One of the major thrust areas of peace education is to raise awareness of human rights in order to build a peaceful and Utopian

Global community.

According to Gandhi's views on peace, it is the absence of tensions, conflicts and all forms of violence including terrorism and war. It is the capacity to live together in harmony and calls for non-violent ways for resolving conflicts. It also emphasized the conservation resources and satisfaction of mind which begins with the individual and spreads to the world at large. Peace education, thus, refers to the pedagogical efforts in giving rise to a better world which would teach compassion, reverence for all, non-violence and love. According to him peace is not just the state of mind but a philosophy which encompasses understanding, tolerance and love for everything which surrounds us.

According to Koutsouikis, 2009,

> 'Values are an ideal guiding that provides the formation of people's behavior and decision. In this way, the right and wrong can be distinguished. Values provide a framework on how to steer the life of the individual. However, it is known that the people that have anti-social behaviors are devoid of many values. In this contest, teaching values to the children provides effective strategies that will provide them to orient themselves to the correct behaviors, thus they have a successful and happy life.

Values are considered as the socially approved drives and goals which get internalized through the process of conditioning learning or socialization and which becomes subjective preferences, standards and aspirations. Peace and value education has a great importance at the formative stages of our life. The great thinkers besides Gandhi, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, Radhakrishnan and so on had advocated the value education to the students to develop in them the intrinsic traits to become true human beings. Swami Vivekananda argued that we need man making and nation building education to build a strong nation that will lead the world to peace and harmony. Furthermore, the

academic institutions need to redefine their roles to build values, attitudes and moral standards. The students are the future of the Nation who should be taught to be moral citizens exhibiting human superiority over inhumane actions because the countries across the world are racing to be at the top on economic growth and military front that has led to an erosion of human values. Today this can be witnessed that this erosion and lack of human values result in the utmost sufferance of the students and the youth from anger, frustration, loneliness, depression, helplessness, anxiety and exhaustion amidst the cut throat the competition for acquiring a worrisome carrier. The ancient mantra 'Loka Samatha Sukhino Vabantu' is much related to this and needed for universal welfare.

Regardless of how good the curriculum content is, the effectiveness of the educational process rests in the ability of the teachers to present the material in an interesting and meaningful way. When our whole society will be well educated and mainly focusing on moral values, ethics, character strengths and virtues, only then the whole world will be endowed in peace and happiness. Value education encourages sovereign thinking, and it opens doors to new thought and new ideas. Educated persons draw their own conclusions instead of blindly following the opinion of others. The Human Rights resolutions declare:

> Education must prepare a child for responsible life and effective participation in a free society with the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes and friendships among all peoples belonging to different ethnic, national and religious groups of indigenous origin.'

Therefore, a student can learn and acquire the quality of empathy and acceptance towards those who are different from them. And they may be more accommodating of others and less likely to solve problems with violence if they get quality education. The teachers, therefore, should take up this daunting task not only to teach text books but also to

understand the intention of each part of these text books it cannot be denied that the whole system fundamentally envisages the topics and content on the moral and spiritual foundations of students in developing their future.

Teachers rule in inculcating the desired morale:

The prevailing pandemic and several otter tensions remind us the necessity of the implementation of such values in the curriculum so as to accelerate the progress of peace and value education in academics. Keeping in mind the gravity of the challenges people are facing in the contemporary period, adopting peace and value in education has become a must call to be exercised in a regular teaching learning situations. As mentioned earlier, the role of the teacher plays a crucial elevated degree. The students should be taught to accept their teachers as role models on whose shoulders lay the responsibility and the daring challenge of bringing about a positive transformation. The teachers may follow certain strategies in inculcating the spirit of harmony and peace.

It is necessary that the teachers introduce the concept of peace and values in the class room under pinning its relevance in personal and civic life. It can be well supported and supplemented by narrating good works and thoughts of illustrious personalities in the respective realms. The teachers are expected to amalgamate the topics judiciously by introducing peace and moral values into the contexts for better comprehension of concepts. In this way, the teaching and the learning can spread out of the class room to create a conductive and respectful environment in family and peace in society.

A well planned lesson couples with the stuffing of value education. Education for peace helps to maintain a constant balance between critical reflection and action. It is necessary that it plays a rightful role in building a more peaceful, noble and just environment.it should be implemented on real life without remaining just on paper. This issue may rightly be

considered as the burning need of the present society and therefore, comes the need for peace and conflict resolution to prosper. A critical reorientation of curriculum across all disciplines and all education levels should be indulged so as to inculcate within oneself the wisdom of tackling the conflicts in a peaceful manner, thereby, contributing to the betterment of the society.

References

1. Page, J. (2008). Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations, Information Age Publishing, USA
2. Basha and Ramanna (2018). Value Education: Importance and its Need, International Journal of Academic Research and Development, Vol. 3
3. Aggarwal, J. C (2008). Philosophical and Sociological Perspective of Education, Shipra Publication, New Delhi
4. Arulsami, S. (2010) Peace and Value Education, Neelkamal Publication Pvt. Ltd., Hyderabad
5. Education for Values in Schools– A Framework, Document Prepared by the Department of Educational Psychology and Foundation of Education, NCERT: (2012)

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

Professional Skills and Competencies development among teachers: Issues and Challenges

Smt. Basana Das

Corresponding author Soma Lohar

1. Introduction:

Competence and Skill are twin words used to denote the same meaning that relates capability of individual to work efficiently, effectively to execute the particular operation.

Competency can be defined as understanding, knowledge, skills and attitude essential to achieve predefined objectives or goals. competency is often defined as the underlying attribute and mental ability that govern how an individual interact with the world. Competency enables individuals to contribute positively to their organizations and the library profession

Competence is a wide concept which embodies the ability to transfer skills and knowledge to new situations within the occupational area. It encompasses organisation and planning of work, innovation and coping with non-routine activities. It includes those qualities of personal effectiveness that are required in the workplace to deal with co-workers, managers and customers. (Training Agency UK, 1989). Thus competence

is more useful in modern ICT profession.

Skills are required for carrying a job efficiently and effectively. Skill is practical ability, a facility in carrying out an action

Skills are specific in its purpose and it is the knowledge of using technologies. Competency is theability of the professional to use these tools in accomplishing their professional task.

2. Professional Development of Academic Staffs:

In education, the term professional development may be used in reference to a widevariety of specialized training, formal education, or advanced professional learningintended to help administrators, teachers, and other educators improve their professional knowledge, competence, skill, and effectiveness. When the term is used in education contexts without qualification, specific examples, or additional explanation, however, it may be difficult to determine precisely what "professional development" is referring to. "Professional development is defined as development in an individual's skills, knowledge, expertise and other characteristics to perform the professional duties in a better manner. For a teacher or academic staff, the definition recognizes thatdevelopment can be provided in many ways, ranging from the formal to the informal. It can be made available through external expertise in the form of courses, workshopsor formal qualification programs, through collaboration between institutions or teachers.These are the part of Continous professional development .CPD is a planned, continuous and lifelong process whereby teachers try to develop their personal and professional qualities, and to improve their knowledge, skills and practice, leading to their empowerment, the improvement of their agency and the development of their organization and their pupils. However, in India MHRD and State education ministries organize various short-term courses and bridge courses for continuous professional development of various levels in-service teacher's. Here only Refresher Course and Orientation program detailed discuss and their contribution to

professional development of in-service teachers in higher education.

3. History:

The National Education Policy 1986 had recommended a comprehensive program me for professional development of teacher in Higher Education System for quality improvement and it was in 1986-87that the University Grants Commission (UGC) accepted the recommendations of the NPE(1986)and the consequent Programme of Action (1992), which outlined very clearly the need ,process and administrative dimensions of faculty development (MHRD 1992).Subsequently 48 Academic Staff Colleges have been established in VII Plan by UGC in universities for faculty development , through in-service training programmes. The current number is 66.

Historically landmark events for Indian's Skill Development landscape

Year	Event
1964	Indian Education Commission (Kothari Commission)
1968	First National Policy for Education (NEP)
1986	New National Policy on Education
1992	Modified Policy on Education
2020	The National Education Policy 2020 has brought an ambitious perspective of Knowledge, Skills and Skill based Knowledge

The Academic Staff Colleges established are conducting specially designed orientation programmes for newly appointed lecturers and refresher courses for in service teachers. The Orientation programme is intended to inculcate in the young lecturers the quality of self- reliance through awareness of the social, intellectual and moral environment as well as to discover self-potential and confidence. The orientation programmes contributes to the teacher awareness of the problems of the Indian society and the role of education, higher education leaders and

educators in the resolution of these problems to achieve desired goals in national development.

Number and Percentage of Teachers Who have undergone Faculty Training from 2010 to 2013

Year	Total Number of Faculty	Number of Faculty Trained	Percentage of Faculty Trained
2010-11	7,65,349	40,000	2.09
2011-12	12,47,453	26,420	2.11
2012-13	13,08,571	27,460	5.22

The total number of new teachers who have undergone training since inception of the ASCs is about 1, 04,000 for orientation programmes and 2, 57,000 for refresher courses (UGC Annual Report, 2009). The current teacher strength in higher education institution in the country isnearly 6 lakh after the inclusion of private college teachers.

It was believed in the past that a college/university teacher learnt the 'art' of teaching on the job by emulating outstanding models such as his/her own teachers or senior colleagues. The stock-in-trade of the college/university teacher has always motivated the students. Today, it is no longer adequate to expect a newly appointed teacher to acquire the 'art' of teaching by emulating his/her peers.

There are five kinds of programme offered by the Academic Staff Colleges:

i) Orientation programmes of 4 weeks duration, for all new entrants at the level of lecturers.

ii) Refresher courses of 3 weeks duration for serving teachers and teacher fellows, research scholars and post-doctoral fellows.

iii) Interaction programme of 3-4 weeks for Doctoral and Post-Doctoral and other research scholars.

iv) Short term courses of 6 day duration for professional development of academic administrators like HoD's, Deans, college principals and senior faculty viz., professor and associate professor/ reader.

v) Non-teaching staff trainingprogramme of 6 days duration for categories A, B & C including those of UGC staff

The Orientation Programme will be of four weeks duration, with minimum of 24 working days (excluding Sundays) and 144 contact hours (six hours a day).

The refresher course will be of three weeks duration, with minimum of 18 working days (excluding Sundays) and 108 contact hours (six hours a day). If a participant fails to complete the requisite contact hours in a programme, he may be permitted to make up for the backlog hours at own cost in another programme by the ASC concerned.

The duration of the Orientation course has been reduced from four weeks to three weeks and that of Refresher course from three weeks to two weeks (UGC 2019)

Orientation Programme (OP): University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (4th Amendment), Regulations, 2016 stated that Teachers in Universities and Colleges and Physical Education Cadres and Librarian cadre in Universities and Colleges need to go through one Orientation Programme (OP) for the promotion from Assistant Professor / equivalent cadres from Stage 1 to Stage 2.

Refresher Course (RC): University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards

in Higher Education) (4th Amendment), Regulations, 2016 stated that Teachers in Universities and Colleges and Physical Education Cadres and Librarian cadre in Universities and Colleges need to go through one RC at stage-1, one RC at stage-2 (for Assistant Professor and Physical Education Cadres), two RC (for Librarian Cadres) and at stage-3 one RC (for Teachers and Librarians) and no RC for Physical Education Cadres.

Details of Requirement in Stage 1: Teachers in Universities and Colleges and Physical Education Cadres and Librarian cadre in Universities and Colleges Assistant Professor/equivalent cadres from Stage 1 to Stage 2 promotion one Refresher/Research Methodology Course of 2/3 weeks duration is needed.

Details of Requirement in Stage 2: Teachers in Universities and Colleges and Physical Education Cadres Assistant Professor/equivalent cadres from Stage 2 to Stage 3 promotion one course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of 2/3 week duration is needed.

The Librarian cadre in Universities and Colleges need to go through two refresher courses, for a minimum period of 3 to 4 week duration to have been undergone during the assessment period.

Details of Requirement in Stage 3: Teachers in Universities and Colleges Assistant Professor (Stage 3) to Associate Professor (Stage 4) need to do one course/programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration.

Physical Education Cadres need not to do any orientation programme.

The Librarian cadre in Universities and Colleges need to go through

one course/training under the categories of Library automation / Analytical tool Development for academic documentation.

4. Need

The teacher plays a key role in the development of the education system as a whole. In teaching profession, a teacher always learns at all stages of teaching. Learning does not stop. An extra-ordinary literary genius R.N. Tagore says, "A lamp can never light another lamp unless if continues to burn its own flame; a teacher can never truly teach unless he is still learning himself". The teacher has to be engaged in self-study and has to carry on self-learning in order to keep himself/herself of abreast with the latest trends in his/her subjects. This aspect is emphasized in teaching profession which ultimately leads to growth of a teacher while in service. However, in-service training is a path finder for the growth of professionalism of teachers. With all these characteristics, teaching has become a noble profession with the prime motive of rendering multi-furious services to society.The quality of education is primarily determined by the competencies, skills, abilities and motivation of teachers. In the present day context, teachers have to play an enabling role in the development of the student. This involves not only imparting knowledge and skills, but also counseling, developing critical and innovative thinking, research, consultancy and extension work, preparing instructional materials with the aid of educational and information technologies and use of modern methods of management of the educational institutions. It is therefore, necessary to update periodically their skills, knowledge and efficiency. In this context, staff development and training play a very crucial role. The in-service programmes offered by UGC arethe only opportunities for the teachers to improve themselves. Thus, it is necessary to studythe impact of orientation programmes offered by Academic Staff Colleges on professional development of the academic staff.Today, there are 66 Academic Staff Colleges spread over 26 States. Andhra Pradesh has the maximum number

i.e. 6, followed by Maharashtra and Uttar Pradesh having five each. Tripura and Nagaland are the only two States without Academic Staff Colleges. Academic Staff Colleges have been contributing significantly to the improvement of quality of teaching in higher education institutions in India by enhancing the competencies of the teachers. The total number of new teachers who have undergone training since inception of the ASCs is about 1,04,000 for orientation programmes and 2,57,000 for refresher courses (UGC Annual Report, 2009).

5. Challenges faced by faculty

i. It is a place for exchanging ideas and experience in the same subject area with peers through groupstudy.Traditional face-to-face learning implies contact with instructors and communication with peers.Group involvement helps us to became expert.

ii. A teacher turns student for that limitedperiod. His listening ability and fluency in subject enhances. He/She have to complete all the given task in class, thus it helps to be creative in thought and action.Attentive nature also increases in this way.

iii A teacher attends lectures by eminent resource personsof various fields of specializationin anenliving conversationand teaching learningambience ,fully aware about the latest developments, new methods and techniques of imparting knowledge.

iv. Teachersbenefitted by learning micro-teaching and its uses, the development of teaching-learning material, comprehensive and effective lesson planning, Bloom's taxonomy, and theconstructivist teaching approach.

v. The special orientation programme in IT is to literate and awareteachers aout latest development of computers.The new entrants as well as in-service teachers are made familiar with use of software tools irrespective of the subject/discipline they are teaching.

Acquisition of knowledge is a two-way process between the teachers and the resource person, therefore, collectively they must advance to the frontiers of knowledge.

vi. Hands on training of advanced analytical instruments in the application areas of interdisciplinary sciences is possbile only in offline classes.

vi. Alots of opportunity for questioning and instant feedback is the main interesting part of live lectures in a classroom.

vii. Visiting a documentation-centre-cum-library for reference and source materials necessary for the courses

viii. Lecturers enhance the quality of self-reliance through awareness of the social, intellectual and moral environment.

ix. Collect specially designed material required for effective implementation of the courses;

x. Create a culture of learning and self-improvement among teachers so that it becomes an integral part of the educational system at the tertiary level.

xi. Enjoy opportunities in service to exchange experience with our peers and to mutually learn from each other;

xii. Accessa forum to abreast of the latest advances in various subjects;

xiii. Teachersget opportunities to further widen their knowledge and to pursue research studies;

xiv. Teachersaware/learn new methods and innovations in higher education so that they can in turn develop their own innovative methods of instruction;

6. Issues faced -by faculty

i) Mother-baby : Mother teacher educators' participation in the in-service training courses is very minimal.A mother educator have tolook after her baby and household works side by side of her work.She faced

many barriers such as location of training sites, lack of security in training centers, and also family pressure not to attend the training courses. Very few training center provides accommodation for the caretaker of babay in training centers, so for the tenure of training, mother educator have to arrange different accommodation outside HRDC, maintenance of both is quite a tough job for a mother.

ii) **Geographical distance:**Teacherscann't attend the course for geographical distance in time. Due to long distance sometimes it is not possible to attend a training, though seems interesting and eminent resource persons.

iii) **Institutional problems:** Sometimes institute also became a strand to pursue a training. Senior teachers gets priviledge and teachers are not given no ojection in due time, thus teachers fails to join a course.

iv) **Single male member of family:** They have lots of responsibility. If hebecame absent in his family for a long period suffer different problems. Household works, different official works etc

v) **Limited seats:** as our training center has limited seats, sometimes interested participants have to wait for a long time to get chance in a nearer HRDC, Sometime teacher do not get chance to attend the course in propertime.

vi) **Age:** So aged teacher suffer different problesin travelling and sitting long duration in class room.

vi) **Inappropriate Course Time:** Some time the schedule of Course is not appropriate

vii) **Shortage of leave:** College do not provide extra leave . So teacher can not attend the course outside the state. Only 2 days are given as ondutyefore and after the tenure of course. So, teachers have to take leave from his own account to attend a outstate training

ix) High Course Fee with travelling cost also include accommodation

cost if the institute is outside the state.

7. In pandemic situation school and colleges are closed near about 2 years whose bad effect expression have been shown from both teachers and students. Both urban and rural students as well as teachers have faced various problem specially the rural teachers and students have suffered more.

Maximum teachers have no good knowledge regarding application of new technologies. They were not well equipped and trained in online teaching. They needtraining in conducting online teaching. Many institutions instructed teachers to teach online without any training on open-source software, They were not acquainted with online teaching platforms, they tried the open-source platform but were not confident. They had insufficient knowledge of online teaching, but because of the lockdown, they used open sources for online teaching.As a result, they have to give effort to learn it and after that they can teach to the learners.

7.1. Meeting the issues faced by faculty

The above issues can be solved by technology enabled flexible learning system (TeFL). The TeFL system because of its inbuilt learner friendly feature and flexibility has the potential to enable the learners to deal with the challenging and difficult task of acquiring skills. Through flexible learning methodology and with the help of Information and Communication Technology (ITC), virtual laboratory and virtual workshop a large number of persons can be trained / retrained with a specific skill. The existing work force can also take advantage of re- training or upskilling through the TeFL.

Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT), 2015

Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT) is a Central Scheme with all India-coveraged, launched

by the Ministry of Human Resource Development, Government of India in March 2015. The new schemes is an umbrella scheme which will create synergies among the various ongoing initiatives on teachers and teaching under the union ministry of HRD and other autonomous onstitutions. The Mission would focus on the whole sector of education without grogmenting the programmes based on levels and sector as school,higher, technical etc.The proposed Mission is envisaged to address comprehensively all issues related to teachers,teaching,teacher preparation and professional development.

The Scheme of Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching has the following goals:

- To ensure a coordinated approach so as to holistically address the various shortcomings relating to teachers and teaching across the educational spectrum ranging from school education to higher education including technical education; using the best international practices for excellence.
- To create and strengthen the institutional mechanisms (Schools of Education, Institutes of Academic leadership and Education Management, Subject based networks, Teaching-learning Centres etc.) at the Centre & in the States, for augmenting training and discipline-wise capacity building of faculty and their periodic assessment for excellence.
- To empower teachers and faculty during through training, re-training, refresher and orientation programmes in generic skills, pedagogic skills, discipline specific content upgradation, ICT and technology enabled training and other appropriate interventions.

The Mission would address:

a) Current and urgent issues such as supply of qualified teachers,attracting talent into teaching profession and raising the

quality of teaching in school and colleges.

b) It is also envisaged that the Teacher Mission would pursue long term goal of uilding a strong professional cadre of teachers by setting performance standards and creating top class institutional facilities for innovative teaching and prosessional development of teachers.

Faculty Induction Programme

UGC has developed Faculty Induction Programme (FIP) for all the newly recruited teachers. The objectives of the FIP is to familiarise the teachers with the structure, functioning, rules, regulations etc; understand their roles and responsibilities; explore pedagogical processes and recognise the importance of self-development and nurturing ethics and values in higher education. For this purpose, UGC has prepared a Framework on Faculty Induction Programme and will be uploaded on website shortly. UGC has organised workshops Training of Teachers (ToT) at Pune, Ahmedabad, Pondicherry and Sonepat. About 640 teachers have been trained for imparting the Teacher Induction Programme. Guidelines for Teacher Induction Programme ''Guru Dakshta'' were launched by Hon'ble Minister of Human Resource Development on 26.12.2019.

Guru Dakshta-Faculty Induction Programme (FIP) One of the mandates set by the University Grants Commission is the development and implementation of a high quality Faculty Induction programme (FIP) for newly recruited faculty to improve their teaching and management skills, adjust to the culture of higher education institutions and better understand their professional responsibilities in higher education institutions. The Commission has thus, designed a formal systematic Faculty Induction Programme (FIP)-Guru Dakshta for transition of newly recruited faculty into the teaching profession. As per the guidelines, it is mandatory for all newly recruited faculty members to go through the FIP within one year of their joining service and implementing the FIP will be the responsibility of the UGCHuman Resource Development Centres (HRDCs). HRDCs at

present are conducting Orientation Programmes for teachers to achieve desired goals of imparting basic skills and sensitivities which a teacher needs for effective class-room teaching and making himself/herself sufficient and keeping abreast of new knowledge. The entry-level Assistant Professors (Level 10) is eligible for promotion under the Career Advancement Scheme (CAS) through two successive levels (Level 11 and Level 12), provided they have; i. Attended one Orientation Course of 21 days' duration on teaching methodology; and ii. Completed one Refresher/Research Methodology Course.

No. of Beneficiaries under Guru Dakshta-Faculty Induction Programme for 2019-20, 2020-21

Number of Universities	Beneficiaries	
	2019-20	2020-21
33	12580	3818

Annual Refresher Progamme in Teaching (ARPIT) A unique initiative of online professional development of in-service teachers' of higher education' using MOOCs platform SWAYAM-Annual Refresher Progamme in Teaching (ARPIT) was launched by MHRD on 13th November, 2018. The ARPIT is 40 hour programme with 20 hours of video content offered in a highly flexible format which can be done at one's own pace and time. The progrmme has built-in assessment exercises and activities as part of the academic progression in the course. At the end of the course, there is a provision for terminal assessment which can be either online of written examination. It has been decided by the UGC that successful completion of the courses offered under the ARPIT programme with 40 hour of instruction material with a proctored examination will be treated as equivalent to one Refresher Course for the purposes of career Advancemen

The latest development in the field is the massive open online courses

(MOOCs), offered by the ministry of Human Resource Development as the Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT), for professional development. The UGC notified the equivalence of ARPIT as a refresher course for career advancement of faculty. It was claimed that 15 lakh higher education faculty would be trained using the MOOCs platform- the SWAYAM portal. In the first phase, 71 discipline- specific universities and institutes were notified as national resource centres (NRCs) and were tasked to prepare online training material with a focus on latest developments in the discipline, new and emerging trends, pedagogical improvements and methodologies for transacting the revised curriculum (MHRD 2019). The training materials were uploaded and made available to any in- service teacher, irrespective of their subject and seniority on registration. More than 50,000 teachers registered in these courses but only 5,478 appeared in the terminal assessment (Banchariya 2019),which is about 10% of the total.

To call these programmes MOOCs would be a misnomer, since the core features of MOOCs, such as mentorship, discussion board, assignments, standalone exams/quizzes, are not available in the NRC courses. Only the content is online in the form of video lectures, PowerPoint presentations and text. Training is different from knowledge gathering in many aspects. This point has been missed by ARPIT. The feedback of faculty who had attended both on site- and off-site training programmes revels that the online programmes are not engaging enough, and the advantages of on-site courses, such as brainstorming debates, exposure to fresh ideas and peer networking are not compensated by the MOOCs. The experiment of leveraging information and communication technology to train a massive number of faculty in one go still needs a lot of refinement. The professional development scene is chaotic, thinly spread and directionless at the moments, in spite of large investments of money, efforts and time. Professionally socialized faculty, trained in the scientific methods

of pedagogy and well versed with the challenging domain of teaching learning, go on to become agents of quality regulation in higher education. A sound, well-though-out, and visionary professional development policy is urgently needed, followed by the establishment of or enrichment of dedicated nodal centres of faculty development.

Conclusion

In the twenty first century higher education has under gone the speedy changes. Teaching process may not be static. Teachers are supposed to excel in every related aspects of Higher education including class room teaching practice. Role of higher education teachers has become diversified: teacher, curriculum developer and researcher. Except all these, a teacher has to perform as a counsellor, administrator, policy makers and so on. So teacher has to perform dynamic role and this can be possible when he/she is Continued professional development satisfied with his work.Digital learning would be a new normal in the present age.Digital platform facilitates self learning,personalized learning, peer learning to clear doubts or to solve a problem.A person may access a well designed online academic content to increase his/her skill and /or knowledge at any time and any where, most of the limitations are manageable and can be mitigated if taken into account carefully .The in service faculty may take the opportunities to re-skill/re-learn through digital learning.

References

Dhawan, R. 2000. Impact of Academic Staff College's Programmes on Teachers and Education. University News, 38(16): 14-15.

Dutta, Jayanti 2021."Professional Development of Higher Education Faculty in India: framework and fault lines". EPW, VolLVI, No14, pp 39-43

(2015b): "Scheme of Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Trainning(PMMMNMTT) Guidelines.

Avalos B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years, Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20.

Ashcroft, L. (2004). Developing competencies, critical analysis, and personal transferable skills in future information professionals. LibraryReview, 53(2), 82-88.

www.ugc.ac.in

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

Voices of the Margin are Heard: A Study in the Concept of Nation in the Light of Swami Vivekananda

Parthasarathi Mandal

Abstract

Swami Vivekananda (1863-1902) was a towering personality of the 19th century, who redefined our outlook to human nature and society. Swamiji's electrifing speeches and letters were a source of optimism and inspiration for the advance of human prosperity and emancipation. Long before the publication Spivak's time winning easy "Can the Subaltern Speak?"(1985) asserts that through socialism ,the 'Shudras',the lowest class will come to power and in democracy the distribution of physical comforts and education will give voices to the masses. Ania Loomba in her Colonialism / Post Colonialism" refers to Jean Baudriliard who remarks that "the masses" are The Leitmotif of every discourse, they are the obsession of every social project' which claims to make the oppressed speak (1983:48-49)."(Loomba, 232).Vivekananda in his analysis of the course of world history viewed that four castes: 'Brahamin', 'Kshatriya, 'Vaishya'and 'Shudra' would rule the world alternatively. He believed in the elevation of masses keeping consonance with the religious sentiment as it can be achieved through the platform of conduct, character and spirituality. The

unrepresented will be represented with their prosperity and emancipation and their journey from the margin to the centre will automatically be made possible and consequently their voices will be heard when the nation state will be built as Swamiji viewed. In this paper an attempt has been made to find out how the voices of the margin are heard in a nation when it is built as per Swamiji's ideal.

KeyWords: subaltern; socialism; masses; representation; spirituality; Nation–state

'Socialism' the very term refuses to be defined though it is a western concept and generally Marx's name is intimately associated with it. But it owes its origin to Robert Owen who in 1853 established "Association of All classes in All Nations. However, Marx put this concept in the ground of science and made it more vibrant. Marx thought that a state is a machine of oppression by one class against the other and this oppression is executed through two tools one by 'religion' and another by 'state' and he hoped when communism will be established, the state will have no class, state and religion will vanish automatically. He says:

> The cohesive force of civilized society is the state which in all typical periods is exclusively the state of the ruling class, and in all cases remains essentially a machine for keeping down the oppressed, exploited class. (323)

Socialistic nation is a kind of nation where the means of production, distribution, and exchange should be regulated or owned by the community and this type of nation will do away with special privilege for a particular class of people is a synthesis of all the good qualities of different communities. Here we may quote Marx to substantiate his view on the socialistic pattern of nation:

As soon as the distribution of labour comes into being, each

> man has a particular, exclusive sphere of activity, which is hunter, a fisherman , a shepherd, or a critical critic, and must remain so if he does not want to lose his means of livelihood; while in communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd or critic'. (44 - 45)

This is what Marx thought of a society where there is no oppression and repression. Mankind is ever tree and ever happy. Vivekananda also advocated a type a society free from oppression and repression. He says in a letter on 1.11.1896, "I am a socialist, not because it is a perfect system, but because I believe that half a loaf is better than no bread" (381)

Vivekananda also voiced forth his views on the oppressive nature of the state. To him individuality is the backbone of any good nation. He discarded the Hegelian concept of state when he says "The state is the man in his fullness and perfection of development" (71 - 72). Vivekananda says that the people of the country are the source of all power. Intact, his vedantic philosophy supports the importance of individuality. He exhorts:

> Fortunately for us Hegelianism was nipped in the bud and not allowed to sprout and cast its harmful shoots over this motherland of ours (342).

However through his understanding of history, he came to know how state has been utilized to oppress one class by the other. Vivekananda has explained, through analogy, how oppression takes place in a state, the farmer gets nothing, the king and the merchant class get the maximum benefit but the producer finds satisfaction only in chanting 'Hai Bhagaban'. In fact 'the people', as Swamiji says, "will certainly want the satisfaction

of their material needs, less work, no oppression, no war, more food." (202). In this context we find similarity between Swamiji and Marx. But if we go deep into the matter that they are poles asunder. Bhupendra Nath Dutta pointed out that in the context of the nature of state there is a similarity. (foreword). Now let us discuss, what is unique in Marx. In a letter Marx has pointed out;

What I did that was new was to prove:

1) That the existence of classes is only bound up with particular historical phases in the development of production,
2) That the class struggle necessarily leads who the dictatorship of the proletariat.
3) That this dictatorship itself only constitutes the transition to the abolition of all classes and to a classless society. (662)

In fact, Marx wants the abolition of individuality in the alter of community or communism. Vivekananda never supports this; his concept of nation was man centric. Swami Someswarananda in his essay "Nutun Prithibir Sandhane; Karl Marx and Swami Vekananda " has pointed out that thinking for man is the life blood of Vivekananda's thought and motivation western philosophers like Bentham , Kontz , Mill wanted to turn man to the highest level of perfection Swamiji wanted to establish man in his own self that his known as "Narayan" the pinacle of perfection. Dr. Ashit Bandhyapadhya very significantly points out, "Western Humanity has turned iron cage into golden cage but Vivekananda's humanism is based on the free floor the basis of which is found in Vedanta (183)" but the similarity between Marx and Vivekananda is found here in the context of humanism. Both wanted to see humanity in a place where machinery of oppression will not show its naked claws. In this context we may quote Prof. Pascal:

It is his ideal of human emancipation, of "humanism", that

> inspires him. He hates the fetters that prevent the practical and spiritual like of men and drives steadily forward to a definition of the barrier that lie in the way of the achievement of human society or social humanity " – socialism , this passionate belief in the dignity of man was is abiding inspiration of work . (22)

Adam Saf in his book "A Philosophy of Man", has proved that humanism is the centre of focus in Marx. Dr: Bhupendra Nath Dutta calls Vivekananda a 'patriot and prophet' and says:

> … The desideratum according to him is to raise the masses, to educate them and to elevate them in the scale of advanced humanity" (2 - 3)

Vivekananda wanted such a socialistic nation where every human being finds his own freedom.Swamiji boldly proclaims;

> Freedom is the watch word, Be free! A free body, a free mind, and a free soul! That is what I have felt all my life: I would rather be doing evil freely than be doing good under bondage. (516).

The subaltern class will take the lead. Marx says in favour of the dictatorship of the proletariat. Vivekananda says the leadership of the 'sudras.' He pointed out that this will start either in Russia or in China. "You take it from me, this rising of the sudras will take place first in Russia, and then in China" (335)

Like Marx, Vivekananda never wants to sacrifice the individual feature of human being and for that matter of the nation. The development of the state is possible if the individuality is stressed and plans are formulated according to its own characteristic feature. Vivekananda says that every nation has its own ideal- and they are their backbone, to some nations it is politics, to some it is social development, to some it is mental development or something else. In a lecture at Lahore Vivekananda put stress on the individuality of a particular race.

> Thus everyone born in to this world has a bent, a direction towards which he must go, through which he must live, and what is true of the individual is equally true of the race. Each race, similarly, has a peculiar bent, each race has a peculiar raison d'être, each race has a peculiar mission to fulfill in the life of the world. (108)

In this context Marx is silent, though he has pointed out four types of pre-capitalist formations like– Asiatic, Slavonic, Ancient classical and Germanic, (95) though he mentioned the process of development of different nations, but individuality of any particular nation is not mentioned in his writings . But what Swamiji mentioned earlier, is found to be operative in the later

Marxists like AntoniGramsi and Palmiro Togliati of Italy, Kimi-Ul-Sung of North Koria have put stress on the individual characteristic feature of their own nation. In this context we may quote from the "Letter to Soviet Leaders" by Alexander Solzhenitsyn:

> To run a country like Russia you need to have a national policy and to feel constantly at your back all the even hundred years of its history, not but the last fifty–five–five percent' (58)

In fact, at present we see, every country even communist China has formulated its own policy based on their demands. Moa- Tse-Tung has explained the nature of Marxian democracy in the following words:

> This new democratic republic will be different from the old European American form of capitalist republic. …On the other hand, it will also be different from the socialist republic of the Soviet type under the dictatorship of the proletariat which is … in the U.S.S.R. …for a certain historical period, this form (I.E., Soviet type) is not suitable for the …colonial and semi - colonial countries …therefore, a third form of state must be adopted in …

all colonial and semi-colonial countries, namely, the new–democratic republic. ' (350)

In the present day world, we find that the people are in favour of democratic socialism which Vivekananda thought to be the best form of government. He says that in a good government the rulers and the ruled will drive to the same objective. i.e. to do good for the masses. John Stuart Mill in his famous book "Representative Government" has said the same thing. He said that a good government is no substitute for self government. Vivekananda has also pointed out its draw backs both from the ruler and the ruled.

He thinks that socialistic pattern of a nation must provide liberty to people and this concept of liberty is from his Vendantic philosophy here life is thought to be ever free and in the words of Tagore it is the 'heaven of freedom". Swamiji wanted to have a nation where development of individuality is to be given priority and the creation of state will be fruitful when this ideal will be achieved, Vivekananda believed that man has created this society not to sacrifice his individuality but rather to nourish his individuality.

In fact Vivekananda concept of socialism is bounded on practical Vedanta and therefore more pragmatic and in the present day world we see, democratic socialism is given due importance and the communists countries are found to follow democratic ideals combined with socialism. Now a days in China the demand for individual rights is gaining ground. Vivekananda exhorts:

I consider that the great national sin is the neglect of the masses and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well-fed and well cared for. (222 - 23)

Thus we may conclude that highest form of socialistic nation is

possible when the 'masses' are given due care and attention and their ever free soul is recognized. Intact, a socialistic nation will run successfully when it will recognize as Vivekananda says:

> You are free, free, and free! oh blessed am I ! Freedom am I! I am infinite! In my soul I can find no beginning and no end. All is myself! In its essence, it is free, unbounded, holy pure and perfect. No books, no scriptures, no science can ever imagine the glory of the self they appear as man, the most glorious God that ever existed, exists, or ever will exist. (250)

In fact, Swami Vivekananda , as said earlier, speaks in favour of leveling up i.e. the upliftment of human beings on the other hand Marx speaks in favour of leveling down i.e classless society. Through upliftment the marginalized section will come to the fore front. Today nations across the world have taken different welfare scheme to bring the weaker section of the society to the centre this idea was visualized by Swamiji as it will smoother the process of leveling up and that will lead us to the land of our heart's desire.

Works Cited

Bandhyapadhyaya, Asit kr. "Vivekananda in the light of Humanism". Swami Vivekananda Smarak Book, Kolkata: Ramakrishna Vedanta Math. 1964.

Dutta, Bhupendranath. Swami Vivekananda: Patriot Prophet. Kolkata: Nababharat publishers, 1954.

Garner J.W. Political Science and Government, Kolkata: The world press ltd, 1951.

Solzhenitsyn, Alexander. "Letter to Soviet leaders". London: June, 1974.

Loomba, Ania. Colonialism/ PostColonialism. London: Routlege. 2001.

Ericttbsbawn, Edited. Pre-capitalist Economic Formations– Karl Marx, trans. Jack Cohen, London, 1964.

Mao, Tse, Tung. Selected works of Mao–Tse–Tung. Vol iii, Foreign Language House, Perking, 1977.

Karl Marx and Frederick Engel. Selected works of Karl Marx and Frederick Engels, Moscow Foreign Languages Publishing House, 1955.

Vivekananda, Swami. The complete works of Swami Vivekananda vol II , vol III, vol V, Kolkata: Advaita Asharm, Ninth Edition, 1964.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

Secularism in the Indian Context

Sk Mustafa Md N Ehsanul Hoque

Abstract

In today's world, the concept of 'secularism' is passionately debated. In India, this debate concerns whether this concept fits with Indian culture and whether this concept is better than the Indian idea of sarva-dharma-samavaba. There are many critics for and against secularism, and this article touches on their arguments and tries to contextualise this debate in the broader idea of liberal democracy along with the Indian debate.

Keywords: Secularism, India, sarva-dharma-samavaba, liberal democracy

Let us approach the concept of secularism unconventionally, and instead of finding its root in some Latin word and then explaining its etymological development in ancient Greece, let us approach it by asking what it performs in our world and its relevance today. Secularism is a political and social approach whose sole aim is avoiding religious discrimination in the affairs of the State. There are many ways to achieve this non-discrimination. So there are many types of secularism practised by countries. On the one side, some argue that as State should be neutral in the matters of religion, it had better adopt no religion, support none and interfere into the affairs of none. On the other hand, there are some states who adopt the role of a paternalistic interventionist one which does not

adopt any particular religion but takes care of every religion with equal respect and bestows privilege upon all religions. These two form two extreme of the scale and in between come many more secularisms.

Secularism arose as an inherent component of democracy. The concept of democracy evolved as a replacement for monarchy and state monopoly. The early democracy was confined within the bourgeoisie and aristocrats as they were afraid that if all the people participate in the democracy then the poor masses would craft the state policies in such a way that would give undue and illegal favour to the masses and would deprive this elite bourgeoisie and aristocrats. Then came the mechanisms for separating the powers of the State among the executive, judiciary and legislature in order to achieve the effect of check and balance. Then, as the democratic institution came to encompass a larger section of the masses, the concept of several inalienable rights sought to protect the citizens from majoritarian dictatorship. The concept of secularism, which originated earlier, found a suitable place to continue. Like these rights secularism also serves the purpose of protecting religious minorities from any possible majoritarian religious imposition and dictatorship.

Looking at this concept from this angle the objections by critics of secularism like T N Madan, who argue that as the concept of secularism arose in Europe it is proper for Europe only, seem an ungrounded fear of secularism. But if we give a closer look at his critique of secularism we will find that by secularism he is considering the concept in its Indian narrow sense. For him, secularism means a concept which advocates separation between State and the religious establishment and confining religion to the private sphere, developed in Europe. When discussing secularism, he fails to dissociate from secularism its western origin and fails to appreciate it as a concept that humanity feels needed in a given historical time and place.

AshisNandy too considers the existence of only one type of secularism

when he writes a critique of secularism in his An Anti-Secularist Manifestoand The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Toleration. Although he is right when discussing Indian secularism that secularism has itself become a doctrine which attempts to replace religion which advocates of secularism like D E Smith propagates.But he fails to consider the fact that there are many modes of secularism, and this form of repressive secularism is one of them. Marc Galanter highlights the same issue when he discusses the problem of excessive interference by the Indian State and judiciary. But he argues that, given the deeply religious environment of India, a different approach towards secularism with less State and judicial interference is possible and appropriate for India. T N Madan also considers the issue of cultural difference between the West and India and thus he rejects secularism straightaway as a foreign concept but Galanter seeks to improve upon it.

Ashis Nandy is right when he fears that secularism has become a doctrine that seeks to replace religion. It is true that the state policy of secularism curtails the boundary of religion and in a secular society religion can only exist subordinate to secularism and remain within the boundary and limitations set out by the secular authority. Thus, a believer's concept of ideal religion never finds full expression in a democratic society. This is an ongoing battle between the State on the one hand and religions on the other hand over the possession of the individual and his/her life. The State demands full allegiance from the individual and wants the individual to follow the constitution and rule of law while the religions want individual believers to follow their path to achieve the ultimate goal. When the State and religions fight with each other over possession of the individual, the crisis of secularism emerges. When the State becomes too involved in the citizens' religious affairs and tries to shape religions according to the ideals of secularism, the citizens become concerned about the survival of their religion and hence their identity.

AshisNandy feels concerned about the motive of secularism because of the State's excessive interference in religion, attempt to regulate religious affairs and try to homogenise religions. He feels the emergence of religious communalism is because of this dominance of secularism, which is anti-religious in nature. Both Nandy and Madan express their concern that the kind of secularism practised in India has unfortunately associated secularism with modernism and religiosity with backwardness. This implies that there is something wrong with the Indian mode of secularism. Nandycategorises four types of individuals possible in modern India based on their religious practice. He finds them arranged in their descending order of importance in our modern society. In the first category came those who are not believers in religion, neither in private nor in public life, e. g. Jawaharlal Nehru. In the second strata comes those who are believers in religion in private but not in public, e. g. Indira Gandhi. The third strata consist of those who are not a believer in private but make a public display of religion, e. g. Jinnah and Savarkar. And in the last strata comes those who believe in religion in private and public, e. g. M K Gandhi. He deplores the fact that our society positions the Father of Our nation and people like him at that strata. Hence Madan says:

> "…the only way secularism in South Asia, understood as interreligious understanding, may succeed would be for us to take both religion and secularism seriously and not reject the former as superstition and reduce the latter to a mask for communalism or mere expediency. Secularism would have to imply that those who profess no religion have a place in society equal to that of others, not higher or lower." (Madan 314)

Michael J Sandel in his "Religious Liberty: Freedom of Choice or Freedom of Conscience" approaches the question from a liberalist point of view and argues that individual belief should not be subject to coercion. He builds his theory on the agreement that "Religious beliefs are 'worthy

of respect', not in virtue of what they are beliefs in, but rather in virtue of being 'the product of free and voluntary choice', in virtue of being beliefs of a self unencumbered by convictions antecedent to choice." (Sandel 84) He considers this belief as a voluntarist, as an individual's participation in religion is purely voluntary. Without discarding his belief in the individual's right, he stretches the argument further and finds that this voluntarist idea is insufficient to describe the religious experience fully because sometimes religious practices are sometimes obligations which an individual is powerless to disobey.

To sum up, we have here discussed so far the arguments for secularism which can be classified into two- the first one argues that secularism is a mark of modern society, and in a democratic nation, uniformity is a must to strengthen the nation. Here, secularism can effectively remove the bewildering religious diversity, which is an obstacle to this unification. The second argument is critical of the first one as it argues that the former argument talks about modernity but forgets that individual liberty and autonomy are the essences of modernism. This latter argument argues for secularism because it thinks that secularism respects an individual's right to make choices and decisions. We have also discussed arguments against secularism which can also be divided into two- the first argument is that secularism is foreign in India and so it cannot work in India; the second argument is that the state interference, curtailment and imposition of secularisation attempt to establish homogeneity through the country and propagate and establish secularism as a doctrine and as a replacement of conventional religion.

Whatever be the argument against or for secularism in India one argument may be made for secularism is that in a democratic nation or society secularism has validity because of two fundamental reasons associated with democracy itself. The first argument is related to the second argument for secularism. It is our democratic nation is built on adult franchise

and this adult franchise is based on the liberal modern notion of the individual's right and capability of making independent decisions which we all should respect whether we agree or not. So we cannot deny the same individual right in the sphere of religion. The second argument can be made from the perspective of religious minorities. It argues that democracy is considered the best possible mode of government- not the best mode of government- because of many factors. One of them is the possibility of becoming a dictatorship or the whim of the majority. In order to prevent the State from becoming such a tool at the hands of the majority, there are rights enshrined in the constitution that are inalienable. One's right to practice, profess and propagate one's religion comes under such rights.

Works Cited

Madan, T N. "Secularism in Its Place." Bhargava, Rajeev. Secularism and its Critics. New Delhi: Oxfrod India Paperback, 1999. 297-320.

Sandel, Michael J. "Religious Liberty: Freedom of Choice or Freedom of Conscience." Bhargava, Rajeev. Secularism and its Critics. New Delhi: Oxford India Paperback, 1999. 73-93. Print.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 14. October, 2022

The Different Voices of A Feminist: A Cogitation on Mary Wollstonecraft

Anasuya Adhikari

Corresponding author Dr. Birbal Saha

Abstract

One of Mary Wollstonecraft's more accomplished essays that have received the least attention is An Historical and Moral View of the French Revolution. In this essay, we argue that the text's avoidance of the characteristics we connect with Wollstonecraft's writings – specifically, those characteristics that appear to support or establish a figure of Wollstonecraft-the-feminist – may be the cause of its under-appreciation in Wollstonecraft studies. An Historical and Moral View of the French Revolution, albeit Wollstonecraft's longest and most careful book, seems awkwardly positioned in comparison to her more well-known Vindications and novels. We provide an interpretation of this text and connections to the impersonal and detached writing style, the lack of a female voice. We argue that An Historical and Moral View of the French Revolution presents a rich and suggestive artifact for the study of women's past writing because it appears to record the woman writer's struggle with definitions of femininity at the time of writing.

Keywords: Mary Wollstonecraft, An Historical and Moral View of the

French Revolution, French Revolution, 18th Century Feminist, Women Writer

An Historical and Moral View of the French Revolution(1794), Wollstonecraft's second published contribution to the revolution debate. Her A Vindication of the Rights of Men (1790) was 'an impassioned letter' addressed to Edmund Burke at a time when debates were more centered on theoretical and practical breakthroughs in British political thought than on the actual or hypothetical events occurring in France. At the time, speculation surrounded the revolution's outcome. Her An Historical and Moral View of the French Revolutionis written with knowledge of the intervening political events, including the September Massacres of 1792, Louis XVI's execution in 1793, and the suspension of Habeas Corpus in Britain in 1793.It was a time when Britain and revolutionary France were at war. Her A Vindication of the Rights of Menis concerned to dispel Burke's fears of an obviously growing radical tendency in British political culture.

In some significant ways, one may argue that Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Men was influenced by her engagement with and opposition to certain facets of patriarchal politics and thought. Burke's Reflections on the Revolution in France manipulates what Carole Pateman has referred to as the reader's interest in "traditional patriarchal thought" which "assimilates all power relations to paternal rule"(p.22). This character is highlighted in Burke's Reflections on the Revolution in France in chapters that discuss patrilineage and defend 'the family' from the irrational Revolutionary crowd. In response, Wollstonecraft questioned inheritance rules and the requirement for marriage and, in accordance with other radical literature of the time, proposed that 'virtue' be used in place of or in addition to property as a measure of social and political value (p. 474). An Historical and Moral View of the French Revolution, written as it is after the amputation of what Lynn Hunt has referred to as 'the political father,' might also be placed in relation to Wollstonecraft's sensitivity to features of patriarchalism (p. 67).In contrast to more overt claims of Wollstonecraft's

liberal feminism, this discussion does not assume that she is theoretically familiar with the term patriarchalism. Instead, it brings up a point from her An Historical and Moral View of the French Revolution. For instance, it is noteworthy that the main anti-patriarchal action has not taken place since she first discussed the French Revolution, only six weeks after her emergence in Paris, and after she saw the King personally being led through the streets to be convicted of treason, but is kept outside the confines both chronological and thematic, of her assessment of that Revolution.

Consequently, we can also contend that this ostensibly insignificant act of situating her An Historical and Moral View of the French Revolution presents us with a more substantial absence than what it initially appears to be. Her An Historical and Moral View of the French Revolution is made possible by the deceased King's absence, in both meanings of the word. The An Historical and Moral View of the French Revolution does not immediately display the gender-consciousness that permeates Wollstonecraft's mature writings and for which she is remembered. This gender-consciousness can be summed up as her insistence on a 'manly' style, idea of a 'revolution in female manners,' preoccupation with peculiarly female suffering and its causes, and meditations on the role of women.This in and of itself is intriguing. As it raises concerns about her 'feminist' ideology and deviates from the popular perception of Wollstonecraft as a feminist, it gives a justification for the work's secondary standing in editions and commentaries on Wollstonecraft. The author of An Historical and Moral View of the French Revolution does not explicitly state her gender during the course of the tale, in contrast to the narrative voices found in the works cited above, which make such assertions. What we are examining here is the nature and consequences of the dual repression that seems to be at play when two big absences occur simultaneously. Why would Wollstonecraft close the story in 1792, just before she arrived in Paris, avoiding any mention of the King's execution while also changing

the tone of her writing to avoid any suggestion of the author's femininity or to make claims on behalf of that femininity, as is a hallmark of her earlier and later writings? A Vindication of the Rights of Men's epistolary format suggested that Wollstonecraft, the author was at her desk, Burke's Reflections on the Revolution in France opened in front of her.

Similar to Burke's Reflections on the Revolution in France, this A Vindication of the Rights of Men takes the form of a Letter to the Right Honourable Edmund Burke and depends on the creation of a first-person figure for rhetorical persuasion. This character begs, contends, does not patronise, reverences, and is not intimidated in the opening paragraph of the letter. She also refuses to apologise and does not mask her feelings by using truncated sentences or period-twisting. A Vindication of the Rights of Woman often and explicitly alludes to the narrator's gender, bases defenses on "because I am a woman," and engages in gallant discourse with a presumed female audience: "My own sex, I hope, will excuse me if I treat them like rational creatures"(p.10-11).

The narrator in the An Historical and Moral View of the French Revolution is noticeably aloof, primarily interested in pointing out and elaborating on the impersonal forces shaping history. Because it uses the third person and is an abstract topic of inquiry, it is already two steps away from the dialogic intimacy of A Vindication of the Rights of Men and A Vindication of the Rights of Woman in its opening statement, "When we contemplate the infancy of man."An Historical and Moral View of the French Revolution stays in the third person up until the author arrives in Versailles, when a sensitive figure is seen reflected in the Palace's mirrors. An Historical and Moral View of the French Revolution then quickly switches back to the third person. The political climate in which Wollstonecraft wrote may help to explain why she created a representative, ungendered narrator whose account of the Revolution could not be associated with her own personal experience of that Revolution. In a letter

to her sister Everina, Wollstonecraft claims that Helen Maria Williams advised her to 'burn' the book because she feared for her life if it had been 'found' in the midst of Jacobin animosity against British 'spies' (Collected Letters, p. 250). Wollstonecraft added the following post-script to a letter to Eliza Bishop dated June 24th, 1793, which she sent from her home outside of Paris: "Do not touch on politics" (p. 233). A potential justification for keeping the story inside the less sensitive historical period of 1789 – 1792 is a sense of personal peril in a dangerous and unpredictable time.

In her A Vindication of the Rights of Woman, Wollstonecraft is concerned with arguing and proving that women are just as capable as men of "drawing comprehensive conclusions from individual observations". This was a significant claim since it demanded intellectual equality in terms of how women could attain the greatest levels of thinking. She cites John Locke's 'definition of liberty' in the first chapter of An Historical and Moral View of the French Revolution as an origin of "The Elements of the Declaration of the Rights of Man," and both her Vindications and her early work, Thoughts on the Education of Daughters, acknowledge her use of his writings. Her phrase, 'the power of generalising ideas,' evokes some powerful sources, in itself a claim by Wollstonecraft to "that [which] really deserves the name of knowledge." The capacity to think abstractly and to reach broad conclusions is seen by Locke in his Essay Concerning Human Understanding (1689) as a defining quality of the human: "If it may be doubted, Whether Beasts compound and enlarge their Ideas that way, to any degree: This, I think, I may be positive in, That the power of Abstracting is not at all in them; and that the having of general Ideas, is that which puts a perfect distinction betwixt Man and Brutes; and is an Excellency which the Faculties of Brutes do by no means attain to" (p.159). This context explains why her comment was made with such passion: "How grossly do they insult us who advise us only to render ourselves gentle, domestic brutes!" (A Vindication of the Rights of

Woman, p. 22)

The sex-based hierarchy of minds in Rousseau's Emile (1762), which Wollstonecraft had read in-depth for her A Vindication of the Rights of Woman, preoccupied her throughout. In Emile, Rousseau calls female reason the 'practical' counterpart to male reason. Women are seen as the complimentary opposite of masculine reason because they are skilled in 'detail' but unable to 'discover principles,' and the complementarily is imagined as "a moral person of which woman is the eye and man the hand"(p.340).He focuses on the effects of sexual difference on the mind and morals of the female relative to the male in Book V, as demonstrated by anatomy in "the union of the sexes." He bases his case on the idea that 'gender' follows 'sex' as a logical consequence of observed biology, making the former seem to follow in the footsteps of the latter. It is Book V of Emile that Wollstonecraft perceived to be a 'sensuous' flaw in Rousseau's otherwise admirable philosophy – an error that required a reasonable woman to address – likely after reading Catherine Macaulay's Letters on Education. Her text parodies Rousseau's idea that a husband and wife form 'one moral being' by rewriting his description of sexed reason. She deflates the image's seductive symmetry by identifying the polarisation of reasoning between the sexes as one that attributes 'abstract reason' to the man and 'practical reason' to the female: ''he may be generalising his ideas as he bets away his fortune, leaving all the minutiae of education to his helpmate, or to chance" (A Vindication of the Rights of Woman, p. 100-101).

When he says that a woman is always a woman, Rousseau is clear about what he means. "the performance of her functions requires a special constitution" (Emile, p. 324). These 'functions' include 'pregnancy,' childbirth, caring for and educating her offspring, as well as promoting the father-child bond. He specifically refutes the idea that women might not devote their entire lives to childbirth and maternal care, calling it "a poor sort of logic to quote isolated exceptions against laws so firmly established"

and rejecting the particular in the face of general laws (p. 325). Even when not actively engaged in childbearing, women are subject to the 'general laws of nature" that determine how they behave,"a woman's business to be a mother". And even if we 'assume',"long intervals ...between the periods of pregnancy" this primary 'business' still governs a woman's 'functions' (p. 325). This is for this reason, "the search for abstract and speculative truths, for principles and axioms in science, for all that tends to wide generalisation, is beyond a woman's grasp" and "woman observes, man reasons" (p. 349).

In the third chapter of A Vindication of the Rights of Woman, Wollstonecraft openly addresses Rousseau's assertion. This chapter's introduction focuses on 'bodily strength'. She adds this to her comment:"bodily strength seems to give man a natural superiority over woman; and this is the only solid basis on which the superiority of the sex can be built" after she has insisted that "not only the virtue but the knowledge of the two sexes should be the same in nature, if not in degree" (A Vindication of the Rights of Woman, p. 44). In case the reader missed the point, she fully reproduces Rousseau's description of "the proper province of women," excluding "abstract and speculative truths," in a footnote (p. 44).

Wollstonecraft primarily references Catherine Macaulay's Letters on Education in her response to this collection of thoughts. Macaulay contains "a power of generalising and combining its ideas, in such a manner as to apprehend truths of the most abstract kind" as an essential faculty in "the economy of the human mind" (p. 382-3). Wollstonecraftsays that the "notion of a positive inferiority in the intellectual powers of the female mind"as a 'prejudice' in a defense of gender-based education that uses distinction (p. 48). Rousseau is one of "the most strenuous asserters of a sexual difference in character," according to Macaulay, and her debate in Emile is specifically focused on refuting Rousseau's concept of feminine nature (p. 205).

In a conversation which highlights"much false speculation on the natural qualities of the female mind" Macaulay speaks against the "doctrine of innate ideas, and innate affections" as having been "in a great measure exploded by the learned" (p.203). She continues by citing the persistence of bias, which portrays the female intellect as inferior, as an illustration of how uncommon it is for any mind to be free from prejudice,"reason so closely, and so accurately on abstract subjects as, through a long chain of deductions, to bring forth a conclusion which in no respect militates with their premises". Macaulay's argument demonstrates his capacity for "reason ...on abstract subjects" (p. 203). Here Wollstonecraft finds Macaulay as "an example of intellectual acquirements supposed to be incompatible with the weakness of her sex." Macaulay's 'style of writing' is applauded as one in which 'no sex appears' (A Vindication of the Rights of Woman, p. 118). When Wollstonecraft reconsiders her earlier review of Macaulay, in which she had characterised her as 'active, reasoned, and virtuous,' she starts to shift away from a straightforward invocation of 'masculine' to designate a positive, energetic, and virtue-driven viewpoint,"a masculine and fervid writer"(Analytical Review,p.309). Here, she asserts that using the term 'masculine' to describe a collection of concepts, such as sound comprehension, discernment, profound thought, penetration, understanding, sober vigour, argumentative closeness, sympathy, and goodness, reinforces the masculine sex's "arrogant assumption of reason" (A Vindication of the Rights of Woman, p. 118-9).

We are trying to make multiple attempts in this conversation. We are mostly been presenting a technique to read one of Wollstonecraft's more developed writings that, if successful, might save it from extinction. In this debate, we have accounted for its position as the result of our attempts to explain some of the causes for its relative absence from Wollstonecraft studies,"the least interesting and important of Mary's works". Wollstonecraft's experience as a mother may be used to partially explain

the style of An Historical and Moral View of the French Revolution. We have run into a more general problem about what we do when we read as feminists and what we do when we read the works of women in the past, especially in the case of someone like Mary Wollstonecraft.

Our concern regarding the practise of reading Wollstonecraft as a feminist – by which we mean both what takes place when we approach her as feminist readers and what occurs when we are engaged in a claim for her feminism—was sparked by our uneasiness with the essentialist implications of this argument. Our discussion of the An Historical and Moral View of the French Revolution focuses on the places where it records feminine concerns as corporealism rather than just as historical oddities open to theorising. This is a claim to resituating femininity as an embodiment of the woman writer, or, more precisely, as the shadow cast by the writing subject in the act of realising her embodiment. It is not a return to anatomy as destiny. An Historical and Moral View of the French Revolution is transformed into a rich and insightful artifact for the study of women's historical writing in this setting, rather than a book doomed to collect dust on a bookcase.

References

1. Analytical Review, 8 (November 1790) review of Macaulay's Letters on Education (Works of Mary Wollstonecraft, vol. 7).
2. Botting, E. H. (2013). Wollstonecraft in Europe, 1792–1904: A Revisionist Reception History, History of European Ideas 39:4.
3. Burke, E. (1790) [2018]. Reflections on the Revolution in France, Strelbytskyy Multimedia Publishing.
4. Godwin, W. (1790) [1985]. Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Modern Morals and Happiness, Harmondsworth, Penguin.

5. Gordon, L. (2005). Vindication: A Life of Mary Wollstonecraft. Harper Collins. New York.
6. Graham, C. M. (1790). Letters on Education with Observations on Religious and Metaphysical Subjects, in 3 parts, London.
7. Hunt, L. (1992). The Family Romance of the French Revolution, Routledge, London.
8. Locke, J. (1689) [1975]. An Essay Concerning Human Understanding, Oxford: Clarendon Press.
9. Pateman, C. (1988). The Sexual Contract, Stanford: Pandora Press.
10. Rousseau, J.J. (1763) [1974]. Emile, tr. by Barbara Foxley. London: Dent.
11. Schreiner, O. (1889) [1994]. "Introduction to the Life of Mary Wollstonecraft and the Rights of Woman," History Workshop 37 (Spring).
12. Todd, J. (1989). The Sign of Angellica: Women, Writing and Fiction, 1660-1800, Virago, London.
13. Wollstonecraft, M. (1787) [2014]. Thoughts on the Education of Daughters, Cambridge University Press, UK.
14. Wollstonecraft, M. (1792) [1995]. Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects, ed. by Ashley Tauchert, Dent, London.
15. Wollstonecraft, M. (1999). A Vindication of the Rights of Men; A Vindication of the Rights of Woman; An Historical and Moral View of the French Revolution, Oxford University Press, London.
16. Wollstonecraft, M. (1798) [2009]. Maria or the Wrongs of Woman, Oxford University Press, UK.
17. Wollstonecraft, M. (1788)[2017]. Mary: A Fiction, Jazzybee Verlag, UK.

THE PRISM
Vol. 14 October, 2022

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

THE PRISM
2229- 7537